বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

চুয়াডাঙ্গা

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

চুয়াডাঙ্গা

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মো. আবদুল মোহিত

সমন্বয়কারী

দীপু মাহমুদ

সংগ্রাহক

মো. আব্দুল মতিন

মো. জাকির হোসেন

মো. আশরাফুল হক উলুম

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
চুয়াডাঙ্গা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩৩৫

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRANTHAMALA CHUADANGA : (Present state of Folklore in Barguna District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 300.00 only. US$: 5

ISBN-984-07-5344-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা

www.pathagar.com

আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্‌ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী

www.pathagar.com

মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।
২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

www.pathagar.com

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific,

www.pathagar.com

functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের

www.pathagar.com

আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর॥ মৃত্তিকার ধরন॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)॥ নারী-পুরুষের হার॥ তরুণ ও প্রবীণের হার॥ শিক্ষার হার॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)॥ শিল্প-কারখানা॥ ব্যবসা-বাণিজ্য॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)॥ খাদ্যাভ্যাস॥ পোশাক-পরিচ্ছদ॥ পেশাগত পরিচয়॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি

www.pathagar.com

(পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

www.pathagar.com

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

www.pathagar.com

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম :বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)
ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে চুয়াডাঙ্গার সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭৮

ক. নামকরণ, সীমানা ও প্রতিষ্ঠা, খ. ভৌগোলিক বিবরণ, গ. নদ-নদী ও খালবিল, ঘ. জনসংখ্যার হার, শিক্ষা ও জনবসতির পরিচয়, ঙ. আদিবাসীদের পরিচয়, চ. ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াত, ছ. হাটবাজার, জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ট. বিশিষ্ট ব্যক্তি, ঠ. মুক্তিযুদ্ধ, ড. বিখ্যাত সাধক ও লোকশিল্পী

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৭৯-১০৮

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা, খ. কিংবদন্তি, গ. ভাট/চারণ কবিতা, ঘ. লোকছড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১০৯-১২৪

লোকশিল্প

ক. তাঁত শিল্প, খ. মৃৎশিল্প, গ. লৌহজাত শিল্প, ঘ. বাঁশ-বেতশিল্প, ঙ. পাখাশিল্প, চ. কাঁথাশিল্প ও নকশিকাঁথা, ছ. ফুলকারি / সলমাজরির কাজ, জ. আমসত্ত্ব, ঝ. বড়ি

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১২৫-১২৬

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১২৭-১২৯

লোকসংগীত (folk song) ১৩০-২৩৭

ক. বাউল গান, খ. মারফতি গান, গ. জারি গান, ঘ. ধুয়োগান, ঙ. বিচার গান, চ. মেয়েলি গীত, ছ. বারেঙ্গে গান, জ. হৈল্-বৈল্ গান, ঝ. ঝাঁপান গান, ঞ. কবিগান, ট. অষ্টক গান বা অষ্টগান, ঠ. বালাকি গান, ঢ. গাজীর গীত, ঢ. নামকীর্তন, ণ. খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৩৮-২৪১

১. ঢোল, ২. খোল, ৩. বাঁয়া, ৪. একতারা, ৫. দোতারা, ৬. সারিন্দা, ৭. খমক, ৮. খঞ্জরি, ৯. কাঁসি, ১০. বাঁশি, ১১. ডুগডুগি

www.pathagar.com

লোকউৎসব (folk festival) ২৪২-২৪৭

ক. নবান্ন উৎসব, খ. বৃষ্টি নামানোর গান/উৎসব, গ. গাস্বি উৎসব, ঘ. বিয়ে, ঙ. ওরস, চ. আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎসব

লোকমেলা (folk fair) ২৪৮-২৫৩

ক. গড়াইটুপির মেলা, খ. ঘোষবিলার বারুণী মেলা, গ. বৈশাখী মেলা, ঘ. হালখাতা

লোকাচার (ritual) ২৫৪-২৬১

লোকখাদ্য (folk food) ২৬২-২৬৭

ক. সাধারণ লোকখাদ্য, খ. মিষ্টান্ন

লোকক্রীড়া (folk games) ২৬৮-২৮৭

১. কাঠি খেলা, ২. থৈয়া থৈয়ী খেলা, ৩. গাছ ঝাঁপ খেলা, ৪. কোটবন্দি খেলা, ৫. বুড়িছুট/বৌচি খেলা, ৬. এক্কাদোক্কা খেলা, ৭. গাদি খেলা, ৮. লাঙল খেলা/খয়ে লাঙল খেলা, ৯. বল্লা বল্লা খেলা, ১০. কপাল টোকাটুকি/গোলাপ টগর খেলা/ নাম পাতাপাতি খেলা, ১১. চোর পুলিশ খেলা, ১২. গদ গুটি খেলা, ১৩. ডাংগুলি খেলা, ১৪. গোল্লাছুট খেলা, ১৫. পলাপলি বা লুকোচুরি খেলা, ১৬. কুমির কুমির খেলা, ১৭. চিকা খেলা/চিতে খেলা, ১৮. রুমাল চুরি, ১৯. কানামাছি খেলা, ২০. দড়ি লাফানো খেলা (ইস্কিপিং খেলা), ২১. হৈলডুগ খেলা, ২২. কাঁদা মাটি ঝাঁপ খেলা/সড়সড়ি খেলা, ২৩. ষোলগুটি খেলা, ২৪. জোড়-বেজোড় খেলা, ২৫. বাঘবন্দী খেলা, ২৬. লাঠি সারা খেলা, ২৭. গুলতি খেলা, ২৮. মুচি মুচি খেলা, ২৯. ঢেঁকি খেলা, ৩০. ওপেনটি বায়োস্কোপ, ৩১. জামাই চুরি খেলা, ৩২. লাঠি খেলা, ৩৩. হা ডু-ডু, ৩৪. ঘুড়ি ওড়ানো, ৩৫. গাছ ছোঁয়া খেলা, ৩৬. ব্যাঙ লাফানো খেলা, ৩৭. ইকড়ি মিকড়ি খেলা, ৩৮. গাদন খেলা, ৩৯. লাটিম খেলা, ৪০. দোলনা খেলা, ৪১. এক্কাদোক্কা

লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance) ২৮৮-৩১৬

ক. লোকনাট্য

১. ভাসান যাত্রা পালা/বেহুলা লাখিন্দার পালা, ২. গাজির পালা বা গাজির গান ৩. নসিমন পালা

খ. লোকনৃত্য

হিজড়া নাচ

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩১৭-৩২২

১. সুতার/কাঠমিস্ত্রি, ২. ধুনুরি, ৩. গাছি, ৪. ঘরামি, ৪. ঢুলি-বাদ্যকর-বাজুন্দার, ৫. শানওয়ালা, ৬. সাপুড়ে, ৭. ঘটক, ৮. পাখি-পালক

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৩২৩-৩৩৪

ক. লোকচিকিৎসা

১। বসন্ত রোগের কারণ, ২। পেটের অসুখের কারণ, ৩। চোখে অসুখ হওয়ার লক্ষণ, ৪। চর্ম রোগের কারণ, ৫। বাত রোগের কারণ, ৬। আমাশয় রোগের কারণ, ৭। কৃমি রোগের কারণ, ৮। যক্ষা রোগের কারণ, ৯। মৃগী রোগের কারণ

খ. তন্ত্রমন্ত্র

ঘা-পাঁচড়া ও বিষ ব্যথার মন্ত্র, পোড়া, ফোড়া, ঘা ঝাঁড়ার মন্ত্র, ঘাড়ে ফিক ঝাঁড়ার মন্ত্র, শাকের পোকা ঝাঁড়ার মন্ত্র, পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র, চোখ ঝাঁড়ানোর মন্ত্র, শিং মাছের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র, মাছ ধরার মন্ত্র, হাত চালানোর মন্ত্র, গবাদি পশুর লোকচিকিৎসায় তন্ত্রমন্ত্র, গরুর কললাগা বা কল ঝাড়া, গরুর কল ঝাড়ার মন্ত্র, গরু মহিষের ফলা লাগা ঝাড়ফুঁক, ফল ঝাড়ার মন্ত্র, সুন্নতে খৎনা বা মুসলমানীর লোক চিকিৎসা

ধাঁধা (riddle) ৩৩৫-৩৪৪

প্রবাদ প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৪৫-৩৫৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩৫৭-৩৫৮

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩৫৯-৩৮১

১. কৃষিকাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

লাঙল, জোয়াল, বিদা, মই, মুগুর, মাথাল, নিড়ানি, কাস্তে, শস্য মাড়াই প্রযুক্তি, কান্দালি, কুলা, হারপাট, ঠুসি, গোলা, বিচুলির গাদা/পোয়ালের পালা,

২. গৃহকাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

কুড়াল, মেঠে, আলপনা, খোলা, ঢেঁকি, ধানভানা, চুলা, চালুনি, আগরদানি, জাঁতা, জালা, ঝাঁঝরি, নান্দা, খাঁচা, দেলকো, পাটি, শিকা, নারকেল কুরানি, পানের বাটা, শিলনোড়া, হামানদিস্তা, ঘুঁটে

৩. মাছধরার কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

খেপলা জাল বা তড়ো জাল, টানা জাল, পাইত জাল, চাক জাল / ধর্ম জাল, টেপি, রাবানি, বিত্তি, চারু, ভাসাল, কোঁচ ও ঝুপি, জুঁতি, ছিপ, দাঁওন বড়শি, পলো

৪. নৌকা সংক্রান্ত

নৌকা, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা, ভেলা

www.pathagar.com

৫. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

কুমোরের চাক, ভাঁটি, গুড় প্রস্তুত প্রণালী, সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ঘোড়ার গাড়ি, হিষের গাড়ি ও গরুর গাড়ি, তীর-ধনুক, পাতকুয়া /ইঁদারা, পালকি, পুকুর/দিঘি, ইঁদুর ধরা কল, মোড়া, খড়ম, ঘন্টা, রিক্সা ভ্যান, হুঁকো, গরুর গাড়ি, চাকা

লোকভাষা (folk language) ৩৮২-৩৮৮

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ, সীমানা ও প্রতিষ্ঠা

নবাব আলিবর্দি খানের (১৭৪০-১৭৫৬) সময়ে চুয়াডাঙ্গায় জনবসতির সূচনা হয়। ১৭৪০ থেকে ৫০ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী ইটেবাড়ি-মহারাজপুর গ্রামাঞ্চল থেকে চুঙো মল্লিক নামে এক ব্যক্তি সপরিবারে ভৈরব নদী পথে মাথাভাঙা নদী হয়ে নদীর ধারে নির্জন উঁচু জায়গা দেখে সেখানে বসতি গড়ে তোলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে। এভাবেই চুয়াডাঙ্গা গ্রামের পত্তন হয়। চুয়াডাঙ্গার পুব দিক দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা নদী। মধ্যবর্তী স্বল্প জায়গাটুকুই চুয়াডাঙ্গার মূলভূখণ্ড। ১৭৯৭ সালের ফারসি রেকর্ডপত্রে জনপদটি 'চুঙ্গোডাঙ্গা' নামে নথিভুক্ত হতে দেখা যায়। ফারসি থেকে ইংরেজিতে লেখার সময়ে 'চুঙ্গোডাঙ্গা' চুয়াডাঙ্গা হয়ে গেছে।

১৮৫৬ সালে সমগ্র ভারতে রেল যোগাযোগের পরিকল্পনা গৃহীত হলে বাংলা অঞ্চলে রেলপথ তৈরির কর্মকান্ড শুরু হয়ে যায়। প্রথম ধাপে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া রেলপথে ১৮৬২ সালের ২৭শে নভেম্বর ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়। সেই সুবাদে ৩০ কি. মি. পশ্চিমে মেহেরপুর এবং ৩৭ কি.মি. পুবে ঝিনাইদহ মহকুমার সাথে সংযোগের জন্য চুয়াডাঙ্গা গ্রামের পুবপ্রান্তে রেলস্টেশন স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে অজ পাড়াগাঁ চুয়াডাঙ্গার রাতারাতি চেহারা বদল হয়ে যায়। কালুপোল থেকে থানা এবং দামুড়হুদা থেকে মহকুমা সদর দপ্তর স্থানারিত হয় চুয়াডাঙ্গায়। হাট-বাজার ছিল নিকটবর্তী সুমিরদিয়ায়। অচিরেই হাট-বাজারসহ পোস্টাফিসও উঠে আসে চুয়াডাঙ্গায়। চুয়াডাঙ্গা গ্রামটিতে অতি দ্রুত অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট গড়ে উঠে শহর হিসেবে নবরূপে সজ্জিত হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা মহকুমা ছিল নদীয়া জেলার অধীন। নদীয়া জেলা কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, চুয়ডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া—এই ৫টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে বাংলা ভেঙে পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। তখন নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমার দুটি থানা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নবগঠিত কুষ্টিয়া জেলার জন্ম হয়।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ১০ই এপ্রিল মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গা শহরকে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে উন্নীত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার মোট আয়তন ১১৭৪.১০ বর্গকিলোমিটার।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

আয়তনের দিক থেকে চুয়াডাঙ্গা বাংলাদেশের ৫৪তম জেলা। দেশের ভৌগোলিক পরিসীমায় ২৩.২২ ডিগ্রি থেকে ২৩.৩৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩৭ ডিগ্রি থেকে ৮৯.০৩ ডিগ্রি পূর্বদ্রাঘিমাংশের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা অবস্থিত। খুলনা বিভাগের অন্তর্গত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গা। এ জেলার উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা, উত্তর-পশ্চিমে মেহেরপুর জেলা, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ঝিনাইদহ জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা অবস্থিত।

খ. ভৌগোলিক বিবরণ

হিমালয়ের চূড়ায় সারা বছর জমে থাকা রাশি রাশি বরফ গরমকালে আড়াই হাজার কি.মি. দীর্ঘ এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড আকারে গলতে শুরু করে। আর সেই সঙ্গে হিমালয় পর্বতমালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয় তুমুল বৃষ্টিপাত। হিমালয়ের গা বেয়ে আসা প্রায় ৫ হাজার ছড়া এবং ঝর্ণা ছোট-বড় শত শত নদনদীর রূপ ধারণ করেছে। আর এই সব নদনদী যেমন– যমুনা, গঙ্গা, অলকনন্দা, গোমতী, সারদা, রাপ্তি, গণ্ডক, বুড়িগণ্ডক, কোশী প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বহু পথ পাড়ি দিয়ে শুরু থেকেই পুর্বগামী গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশে প্রধান ধারাটি আড়াই হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ পেরিয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে তার আগমন।

সুদীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালা এবং ভারতভূমির সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে এই শত-সহস্র নদনদী বয়ে আসার সময়ে পাথর, পাথেরর কণা, বালু রাশি, মাটি, আর বিভিন্ন খনিজ উপাদানের অণুকণা বাংলার সমতল অঞ্চলে পলির আকারে ৫ লক্ষ বছর ধরে জমে জমে বাংলাদেশে গাঙ্গেয় অববাহিকার এই প্লাবনভূমির জন্ম।

গাঙ্গেয় অববাহিকায় পদ্মানদীর দক্ষিণাংশে চুয়াডাঙ্গা জেলার অবস্থান। এর ভূমি রূপ প্রায় সমতল থেকে সামান্য উঁচু-নিচু গঙ্গার চুনযুক্ত পলিবাহিত প্লাবনভূমিতে গড়ে উঠেছে। পলিগঠিত সমভূমি বলে এলাকাটি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে পদ্মানদী গতিপথ পরিবর্তন করায় চুয়াডাঙ্গা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, মাহেশ্বরী প্রভৃতি পদ্মার শাখা-প্রশাখা নদ-নদীগুলোরও বড় ধরনের পরিবর্তন, ভাঙন অথবা উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ জেলার ভূপ্রকৃতিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে চুয়াডাঙ্গাকে বিশাল পদ্মানদীর বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলের অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১.৫ মিটার বা ৩৮ ফুট উপরে অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বাংশের চেয়ে উত্তর-পশ্চিমাংশে এ উচ্চতা সামান্য বেশি। উচ্চতার এই তারতম্যের কারণে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আবহাওয়ার কিছু হেরফের লক্ষ্য করা যায়। চুয়াডাঙ্গা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ জেলার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বাতাসে আদ্রতার পরিমান জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বেশি- গড়ে ৯১% এবং নভেম্বর থেকে মার্চ গড়ে সবচেয়ে কম ৭১%। গড় তাপমাত্রা- গরমকালে ২৪° থেকে ৪০° সেলসিয়াসের মধ্যে এবং শীতকালে ২৭° থেকে ৭° সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠা-নামা করে। খুব কমক্ষেত্রেই তাপমাত্রা ৪১°/৪২° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায় বা কমে প্রায় ৪° সেলসিয়াসের নিচে নামে।

www.pathagar.com

গ. নদ-নদী ও খালবিল

চুয়াডাঙ্গার নদ-নদী, খাল-বিল-দহ-দিঘি, ডোবা-নালা, পুকুর-জলাশয়ের আবর্তন-বিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে এ জেলার ভূ-প্রকৃতি। এই জনপদ এক সময়ে অসংখ্য বেগবতী নদী-নালায় আকীর্ণ ছিল। নদ-নদীগুলো প্রবাহের কারণে বারবার দুরন্ত খাতবদলের ভাঙাগড়ায় এই জেলার গড়ে ওঠা ভূপ্রকৃতি ও নদীগুলোরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এসেছে।

পানি ব্যবহারের সহজ লভ্যতার সুযোগ নিয়ে নদীনালা, খালবিল, হাওড়বাওড়, পুকুর-দিঘি-জলাশয়ের ধারে ধারে গড়ে উঠেছে আমাদের দেশের গ্রাম-জনপদ ও হাট-বাজার আর ব্যবসাকেন্দ্রগুলো। যুগ যুগ ধরেই দেশে-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান, প্রচার-প্রসার ঘটেছে এই নদী পথেই। হাজার হাজার বছর ধরে কৃষিকাজের বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে এই পানির সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করেই। আমাদের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসও সেই প্রকৃতিরই অবদান। আমাদের শারীরিক বিকাশ ও বিবর্তন, মানসিক চেতনার বিশিষ্টতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তারই পরিণতি।

আদিকাল থেকে নানা রকম খাদ্য শস্য, ডাল, তৈলবীজ, পাট, কার্পাস তুলা, গুড়, নানা রকম মশলা ইত্যাদি দেশের মানুষের চাহিদা পুরণ করে বিদেশী বণিকদের কাছেও বাংলাদেশের পণ্যের সুনাম ছড়িয়েছে বহুকাল থেকে।

অঞ্চলের ওপর দিয়ে এই শত-সহস্র নদনদী বয়ে আসার সময়ে পাথর, পাথর কণা, বালু রাশি, মাটি, আর বিভিন্ন খনিজ উপাদানের অণুকণা বাংলার সমতল অঞ্চলে পলির আকারে ৫ লক্ষ বছর ধরে জমে জমে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বরা এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জন্ম।

যমুনা নদীর বর্তমান ধারাটি সৃষ্টি হওয়ার ফলশ্রুতিতে গড়াই নদী আজকের গতিপথ লাভ করেছে – যাতে গঙ্গার পানি সহজে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতে পারে। গঙ্গা এবং এর শাখা ও উপনদীসমূহের পরিবর্তিত গতিপথসমূহ বঙ্গীয় বদ্বীপের গঠন ও বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশ কয়েকটি নদ-নদী উলেখযোগ্য হলেও বর্তমানে প্রায় সব নদীই ক্ষীণ অবস্থায় প্রবহমান। ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনের ফলে নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে বর্তমানে কালের সাক্ষী হয়ে কোন রকমে টিকে আছে ইতিহাসের পাতায়। এ জেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নদী হল :

মাথাভাঙ্গা

মাথাভাঙ্গা পদ্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। পদ্মার শাখা জলাঙ্গীর উৎস মুখ থেকে প্রায় ১৭ কি.মি. ভাটিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা বরাবর পদ্মা নদী থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপন্ন হয়ে সীমান্ত চিহ্নিত করে বেশ কিছু দূর দক্ষিণে চলার পরে কুষ্টিয়া জেলার ইনসাফ নগর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর পর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে এটি চুয়াডাঙ্গা জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বাংলাদেশের মধ্যে এই নদীর দৈর্ঘ্য ১৩০ কি.মি.।

www.pathagar.com

মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে চুয়াডাঙ্গা শহর

মাথাভাঙ্গা নদীর দুই তীরে অসংখ্য বাজার বা হাভেলি (হাভেলি > হাউলি) গড়ে উঠেছিল বলে নদীটি হাউলি নদী নামেও পরিচিত। মাথাভাঙ্গা নদী এক সময় দামুড়হুদা ও হাউলি মৌজার মাঝখান থেকে জয়রামপুর, ডুগডুগি, কাদিপুর, গোবিন্দপুর পর্যন্ত একটা বিশাল আকারের বাঁক ঘুরে প্রবাহিত হতো। কিন্তু দামুড়হুদা থেকে জয়রামপুর পর্যন্ত নদীগর্ভে পলি পড়ে অস্বাভাবিকভাবে নদীর নাব্যতা কমে যায়। বর্ষাকালে অত্যাধিক পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে মাথাভাঙ্গার দুই তীরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রায় প্রতি বছর ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ দেখা দিত। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে বড় নৌকা চলাচলেও বিঘ্ন ঘটতে থাকে। এইসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৮৯৫ সালে মাথাভাঙ্গা নদী জরিপ শেষে এই নদীর সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সেই লক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে চুয়াডাঙ্গার বন্দরভিটা গ্রাম থেকে সুবলপুর পর্যন্ত নৌ-বাণিজ্যের উপযোগী নদীর গতিপথ সোজা করে খাল খনন করা হয়। দামুড়হুদা থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত ক্ষীণ ধারায় মরা গাঙ নামে সেই অস্তিত্ব এখনও বজায় রেখেছে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ নদীতে পানি প্রবাহের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ১২৯০০ কিউসেক। বর্তমানে নদীটি ক্ষীণ অবস্থায় টিকে আছে। নদিয়া জেলার সীমান্ত গোবিন্দপুর থেকে মাজদিয়া পর্যন্ত ১৯ কিমি মাথাভাঙ্গা নামে এবং মাজদিয়ার কারমবেড়িয়া থেকে মাথাভাঙ্গার শাখা ইছামতির উৎপত্তি হয়েছে। এর পরে মাজদিয়ার এই অংশ থেকে পায়রাডাঙ্গার কাছে ভাগীরথী নদীতে মেশা পর্যন্ত ৫৩ কিমি চূর্ণী নামে পরিচিত। চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার ইত্যাদি মাথাভাঙ্গার শাখানদী রয়েছে। মাথাভাঙ্গা এক সময় প্রবল খরস্রোতা এবং ভাঙন-প্রবণ ছিল বলে বহু জনপদ গ্রাস করায়, বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় এই নদীর নাম হয়েছিল মাথাভাঙ্গা।

www.pathagar.com

ভৈরব

ভৈরব চুয়াডাঙ্গা জেলার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ নদী। শুধু তাই নয়, ভৈরব চুয়াডাঙ্গা যশোর খুলনা অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রাচীনতম এবং দীর্ঘতম নদ। এর মোট দৈর্ঘ্য ২৫০ কি.মি.। নদীটি পশ্চিমবঙ্গে মালদহের পূর্বতীরে আখেরগঞ্জ নামক জায়গায় পদ্মা নদী থেকে ১৬ কি.মি. পশ্চিমে উৎপন্ন হয়ে কিছু দূর এসে পদ্মার শাখা নদী জলাঙ্গীর সাথে মিশেছে। এই মিলিত ধারা কিছু পথ চলার পরে জলাঙ্গী নদী থেকে বের হয়ে বাংলাদেশের সীমানা ধরে বেশকিছু এসে মেহেরপুর জেলার ফতেপুর, কামদেবপুর, গোবীপুর, মেহেরপুর জেলা শহর, যাদবপুর, রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, বিদ্যাধরপুর, দারিয়াপুর, মোনাখালি, গোপীনাথপুর, বিশ্বনাথপুর, গৌরীনগর, বল্লভপুর, বাগোয়ান, রতনপুর, মহাজনপুর আশরাফপুর, কোমরপুর, জতারপুর, গোপালপুর গ্রাম-জনপদ পেরিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রবেশ করেছে।

ভৈরব নদী

ভৈরব নদী চুয়াডাঙ্গার নাটুদহ, বেড়বাড়ি, চারুলিয়া, হাতিভাঙ্গা, মোক্তারপুর, উত্তর-চাঁদপুর, কার্পাসডাঙ্গা, নিশ্চিন্তপুর, সুবলপুর গ্রামের পাশ দিয়ে এসে মাথাভাঙ্গা নদীতে পতিত হয়েছে। এরপরে এই মিলিত ধারা দর্শনা রেলস্টেশনের পূর্ব কোণে এসে মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকন্দবাড়িয়া, সন্তোষপুর, মনোহরপুর, কালা, জীবননগর হয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিক্রম করেছে। এর পর বৃহত্তর যশোর জেলার কোটচাঁদপুর, বারোবাজার, বারীনগর, চূড়ামনকাটি, যশোর শহর, বসুন্দিয়া, মহাকাল, শেখহাটি, জগন্নাথপুর নওয়াপাড়া, ফুলতলা, খুলনা হয়ে বাগেরহাট পর্যন্ত চলে গেছে। ভৈরবের তীরে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের প্রাচীন জনপদ বাগোয়ান, চারুলিয়া, কার্পাসডাঙ্গা, জীবননগর -- এ সব জায়গায় বহু শতাব্দী ধরে বাণিজ্যকেন্দ্রিক হাট-বাজার বা গঞ্জ গড়ে ওঠে।

কোটচাঁদপুরের কাছে ভৈরবের শাখা কপোতাক্ষ নদের উৎপত্তি হয়েছে। চলার পথে ভৈরব অন্য একাধিক নদীর সাথে মিলিত হয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনামে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে এই নদীতে পদ্মার পানি প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু শুকনো মওসুমে নদীটির বেহাল অবস্থা। স্থানীয় বৃষ্টিপাতের পানি এবং নদীখাতের চোয়ানো পানি নদীর একমাত্র উৎস।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে একই নামে একাধিক নদ-নদী থাকলেও ভৈরব নামে দ্বিতীয় কোন নদী নেই। এক সময় ভৈরব গভীর এবং প্রচণ্ড খরস্রোতা ছিল। ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এই বিস্তীর্ণ জনপদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভৈরব নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

কুমার

কুমার মাথাভাঙ্গার একটি শাখা নদী। আলমডাঙ্গা থানার হাটবোয়ালিয়ার কাছে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে কুমার নদীর উৎপত্তি। এ নদী দিয়ে বহুবার গঙ্গা বা পদ্মার প্রধান স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪ কি.মি.। কুমার নদী প্রাগপুর, হারদি, গোবিন্দপুর, দুর্গাপুর, বাদেমাজু ও জামজামির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমানা রচনা করে কুষ্টিয়া জেলায় প্রবেশ করেছে। এক সময় নদীটিতে পর্যাপ্ত পাঙাস মাছ থাকার কারণে স্থানীয়ভাবে কুমার পাংসী নদী নামেও পরিচিত ছিল।

বর্ষা মৌসুমে বর্তমানে পানিতে পূর্ণ থাকলেও শুকনা মৌসুমে নদীতে পানি থাকে না। কেবল গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি এবং স্থানীয় বৃষ্টিপাতই এখন এই নদীর জলপ্রবাহের প্রধান উৎস। আশপাশের বহু বিল থেকে পানি বয়ে আনত বলে এই নদীর পানির রঙ ছিল অনেকটা কাল।

বর্তমানে নদীটি ক্ষীণকায় মজা অবস্থায় জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ একটি জীবন্মৃত নদ হিসেবে রয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়ায় কুমার নদের উৎপত্তি। উৎসমুখ থেকে ২৫ কি.মি. পথ অতিক্রম করে ঝিনাইদহ জেলার সীমানা বরাবর এসে পড়েছে।

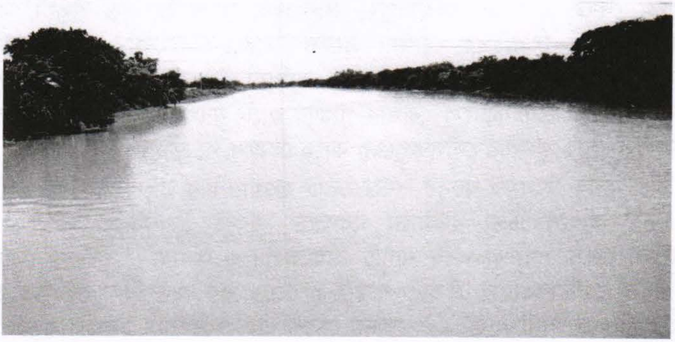

কুমার নদী [৩১. ০৭. ২০১১ তারিখে আলমডাঙ্গায় তোলা ছবি]

নবগঙ্গা

আলমডাঙ্গার বোয়ালমারী গ্রামের উত্তরে মাথাভাঙ্গার নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে কমলাপুর পি টি আই এলাকা থেকে নবগঙ্গা উৎপন্ন হয়ে সরষেডাঙ্গা গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত

www.pathagar.com

হয়ে গ্রামের পুব দিকে মোড় নিয়ে সোজা দক্ষিণ-মুখী হয়ে ট্যাংরামারি, আমিরপুর, কুলচারা, সাতগাড়ি, জাফরপুর, শৈলগাড়ি, নিমতলা, ডিঙ্গেদহ প্রবাহিত হতো।

১৮৬০ সালে রেলপথ নির্মাণের সময় আমিরপুর ও খেজুরতলায় নবগঙ্গা নদীতে বাঁধ দিলে মাথাভাঙ্গার সাথে নবগঙ্গার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বাঁধের কারণে তারপর থেকে তার স্বাভাবিক গতি ও প্রবাহ হারিয়ে ফেলে। তার প্রাণ-প্রবাহও স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। যে বছর বৃষ্টি বেশি হয়, সে বছর মাথাভাঙ্গা নদীতে পানির প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় মাথাভাঙ্গা নদীর খাত সেই বিপুল জলরাশি ধারণ করতে না পারায় ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়, শত শত গ্রাম জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য ১৯৩৬ সালে চুয়াডাঙ্গা শহরের উত্তর সীমানা ঘেঁসে মাথাভাঙ্গা থেকে একটি সংযোগ খাল কেটে নবগঙ্গার সাথে যুক্ত করা হয়। এ উদ্যোগ সফল হলেও নবগঙ্গা তার প্রাণপ্রবাহ আর কোন দিনই ফিরে পায়নি। দক্ষিণ দিকে ঘুরে ঝিনাইদহের উপর দিয়ে গিয়ে কুমারের সাথে মিশেছে।

নবগঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৩০ কিলোমিটার। প্রমত্তা এই নদীটি পলিবাহিত ছিল এবং এর দুই তীরের জনপদ ছিল সমৃদ্ধ। সে কারণে নদীটি গঙ্গার অনুরূপ নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে ছিল বলে এর নাম হয় নবগঙ্গা। নবগঙ্গা থেকে এক সময় প্রচুর মুক্তা সম্বলিত ঝিনুক মিলত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যশোর ও নদীয়ার সাথে বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান নৌপথ ছিল নবগঙ্গা।

চিত্রা

চিত্রা নদী লোকনাথপুরের পশ্চিমে গোবিন্দপুর-রুদ্রনগরের মাঝামাঝি মাথাভাঙ্গা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে পুব-উত্তর দিকে এঁকেঁবেকে ছোট দুধপাতিলা, বড় দুধপাতিলা, কুন্দিপুর, দোস্ত, উকতো, নেহালপুর, জালশুকা, ফুলবাড়ি, বড় শলুয়া, কালুপোল, খাড়াগোদা হয়ে ঝিনাইদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। উৎসমুখ থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, মাগুরার শালিখা, ও যশোরের কালিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ১৭০ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে নড়াইল জেলার গাজীর হাটে নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। এই মিলিত স্রোত খুলনার দৌলতপুরের কাছে ভৈরবে পড়েছে।

চিত্রা নদীর উৎসমুখ বহুদূর পর্যন্ত ভরাট হওয়ায় এর উৎস আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই কারণে চিত্রা বর্তমানে নবগঙ্গার একটি উপনদীতে পরিণত হয়েছে। উৎপত্তস্থল থেকে শালিখা পর্যন্ত নদীটি প্রায় ভরাট ও অনাব্য। শালিখা থেকে গাজীর হাট পর্যন্ত জোয়ারভাঁটার প্রভাব রয়েছে। জোয়ারের স্বাভাবিক পরিসর প্রায় এক মিটার। এখানে নদী নাব্য এবং খুলনা থেকে এই পথে লঞ্চ চলাচল করে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় রথডাঙ্গা থেকে গাজীর হাট পর্যন্ত নদীর বাম তীর বরাবর বেড়িবাঁধ দেওয়া হয়েছে। নদীতে ভাঙন বা বন্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। শালিখা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত অংশে কিছু বাঁক দেখা গেলেও বাদ-বাকি অংশ মোটামুটি সরল। কালীগঞ্জ, শালিখা, নড়াইল, গাজীরহাট উল্লেখযোগ্য হাট-বাজার ও শহর গড়ে উঠেছে। চিত্রা নদীর তীরে কালুপোলে ১৫শ শতাব্দীর প্রাচীন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

চিত্রা নদী

ভাইমারা

ভাইমারা নদী মাথাভাঙ্গার একটি শাখা। নদীটি চুয়াডাঙ্গা হাঁটুভাঙ্গা গ্রামের কাছে মাথাভাঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়ে হেমায়েতপুর শালদহ, শালিখা, মোচাইনগর, নান্দবার, আইন্দিপুর, কয়রাডাঙ্গা, সুবলখালি, গোকুলখালি প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়ে প্রায় ৩০ কি.মি. পরে মাথাভাঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

ঘ. জনসংখ্যার হার, শিক্ষা ও জনবসতির পরিচয়

চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের বসবাস। উচ্চবিত্ত যাঁদের মনে করা হয়, তাঁরা আসলে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির। একসময় এখানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা ছিল ব্যাপক। চাকুরী ও দারিদ্রের কারণে এখন যৌথ পরিবারের আনুপাতিক হার খুবই কম। আনুমানিক যৌথ পরিবার ও একক পরিবারের হার ৪% ও ৯৬%। সনাতন ধর্মের বেশকিছু পরিবার পুরনো ঐতিহ্য হিসেবে কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছে যৌথ পরিবার প্রথাকে।

২০১১ সালের আদম শুমারী অনুসারে মোট জনসংখ্যা ১১,২৯,০১৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫,৬৪,৮১৯ এবং মহিলা ৫,৬৪,১৯৬। চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রতি বর্গ কি.মি.তে গড়ে ৯৬২ জন বসবাস করে। মোট মৌজার সংখ্যা ৩৪৫ এবং গ্রামের সংখ্যা ৫২১টি। জেলার মোট পরিবারের সংখা ২,৭৭,৪৬৪। শিক্ষার হার : পুরুষ ৪৬.৯ এবং নারী ৪৪.৯ এবং উভয় মিলিয়ে গড়ে ৪৫.৯। গড়ে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১৩জন। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ২৭.১২ হারে নগরায়ণ বেড়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ঙ. আদিবাসীদের পরিচয়

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায় বুনো বা বাগদী বা সর্দার নামে কথিত হয়ে থাকে। দামুড়হুদা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর সংলগ্ন আদিবাসী পাড়া, দর্শনা পৌর এলাকার মেমনগর কুঠিপাড়া, পুড়োপাড়া, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর, শিয়ালমারী, আন্দুলবাড়িয়া, সড়াবাড়িয়া, গয়েশপুর, সুবলপুর, রায়পুর, পীরগাছা, সুটিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর, ডিহি মিশনপাড়া, ফুলবাড়ি, আলমডাঙ্গা উপজেলার রেলস্টেশন পাড়া, ঘোলদাড়ী, আইলহাস, দুর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে সব মিলিয়ে বর্তমানে ৫ হাজারের কাছাকাছি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। ১৮০০ সালের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশকের দিকে ইংরেজ নীলকরদের সময়ে অবিভক্ত বাংলার বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ধানবাদ, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা এবং বিশেষত বর্তমান ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে সস্তা এবং অনুগত শ্রমিক হিসেবে এদের পূর্বপুরুষদের এ অঞ্চলের নীলকুঠিতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিয়ে আসে। এদের বসবাসের অঞ্চল ছোট-বড় পাহাড়ী এলাকার পাথুরে ও কাঁকুরে মাটি হওয়ায় চাষাবাদের একান্ত অনুপযোগী। তাদের জীবন ধারণ অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ হওয়ায় দারিদ্র্য-পীড়িত এদের পূর্ব-পুরুষেরা ভাল কাজের আশায় নীলকুঠিগুলোতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা শুরু করে এবং এই এলাকায় বসবাস করতে থাকে। পরে নীলচাষ উচ্ছেদ হলে এই বিপুল পরিমাণ আদিবাসী লোকজন কর্মহীন হয়ে নিজ নিজ এলাকায় থেকে যায়।

নীলচাষ বিস্তারের সাথে সাথে বাংলার জমিদারদের জমির পরিমান কমে গেলে বন-জঙ্গল কাটা, খাল-বিল এবং অনাবাদী জমি চাষ বা বসবাসের উপযোগী করার কাজে অনেক জমিদার একই অঞ্চল থেকে উনিশ শতকে আদিবাসীদের বাংলায় নিয়ে আসে। তারাও একইভাবে পুরুষানুক্রমে এ দেশেই থেকে যায়। নীলকুঠির আদিবাসীদের সাথে শেষ পর্যন্ত তাদের আর কোন ভেদাভেদ থাকেনা। জমিদারি প্রথা বিলীন হওয়ার শেষ পর্যায়ে ক্রমেই তাদের কাজকর্ম এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে দুর্দশা নেমে আসে।

১৮৫৬ সালে সমগ্র ভারতে রেল যোগাযোগের পরিকল্পনা গৃহীত হলে বাংলা অঞ্চলে রেলপথ তৈরির বিপুল এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে তাদের নিয়োজিত করা হয়। ১৮৬২ সালে সালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত প্রথম রেলপথে ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়ে গেলেও সেই সুবাদে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত এই সব আদিবাসীদের কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এক সময় তাদের কাজকর্ম ফুরিয়ে গেলেও কর্মসংস্থান, সহজলভ্য খাদ্যদ্রব্য এবং বসবাসের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে তারা অধিকাংশই আর স্বভূমিতে ফিরে যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা বাগদী, দুলে, কোল, বাঁশফোড়, সাঁওতাল, লোহার, কুর্মি, নিষাদ ইত্যাদি অনার্য জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষদের বংশধর। সময়ের ব্যবধানে তাদের আর আলাদা করে সনাক্ত করা যায় না বটে, তবে নানা টানাপোড়েনে তারা হিন্দু সমাজের সাথে মিশে গেলেও হিন্দুধর্মের বর্ণবিভাজনের

www.pathagar.com

নিরিখে এই আদিবাসীরা সামাজিকভাবে নিচু স্তরেই তাদের অবস্থান। হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বশেষ বিভাজনটির পরবর্তী স্তরে মুসলিম সমাজের পরে তাদের স্থান হিসাবে গণ্য করা হয়।

বাংলা অঞ্চলে এসে তারা প্রথম বনেজঙ্গলে বসতি স্থাপন করে এং বনজঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হয়। তারা বনের প্রায় সব ধরনের পাখি, ফল-মূল ও বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বনমুরগী, শূকর, সজারু, বেজি, কচ্ছপ, কুঁচে, কাঁকড়া, ইঁদুর, শামুক, ঝিনুক, বাদুড়, খরগোশ, খাটাশ ইত্যাদি নানা ধরনের জীবজন্তুর মাংশ খায়। জনজঙ্গলের বুনো ওল, কচু, আলু তরিতরকারি হিসাবে তারা নির্বিবাদে খায়। তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার-সংস্কারে, খাদ্য-খাবারে – মোটকথা তাদের সার্বিক জীবনযাপনে আদিমভাব থাকায় বাঙালি সমাজের কাছে তারা বুনো নামে পরিচিতি লাভ করে। অধিকাংশ আদিবাসীরাই কালের ব্যবধানে তাদের পূর্বপুরুষের জাতিসত্তা ভুলে যাওয়ায় 'বুনো' নামটি তারা নিজেরাও স্বীকার করে নিয়েছে।

এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক রীতি-নীতির প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর বিয়ের রীতি প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প বয়সেও বিয়ে হয়ে থাকে। আদিবাসীরা বর্তমানে হিন্দু ধর্মীয় আচার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু তাদের ধর্মানুষ্ঠানে কোনো ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করেন না, বিধায় তাদের ধর্মাচরণ অনেকটা নিজেদের মতামত অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিয়েছে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে অনেক আবহমান রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। বৈবাহিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আলাদা আলাদা জাতি-গোষ্ঠীর বিলীয়মান ধারার অবশেষ এখনও কিছু কিছু তাদের জীবনধারায় মিশে আছে।

বর্তমানে এই আদিবাসী সমাজে মাছধরা, কৃষিভিত্তিক জীবনযাপন ছাড়াও নানান পেশা অবলম্বন করছে। তাদের মধ্যে অনাবৃষ্টি, গো-মড়ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের যাদু-বিশ্বাস জাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসরণ করে থাকে। কোনো কোনো অঞ্চলে শেওড়াগাছকে কেন্দ্র করে দুধকলা উপাচার নিবেদন করে সারা রাত ধরে তার চারপাশে নাচ গান করে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে। শুধু আদিবাসীরা নয়, এতদঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে– যার উৎসপ্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে লব্ধ।

আদিবাসী সমাজকে যাদু বিশ্বাস তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মকাণ্ডকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নানা ধরনের টোটকা চিকিৎসাও এই সমাজে প্রচলিত। ভূত-প্রেত সম্পর্কে নানা বিশ্বাস আছে তাদের মধ্যে। তারা মনে করে নিজেদের কোনো পাপের কারণে ভূত-প্রেত তাদের ওপর ভর করে। কখনও কখনও অস্বাভাবিক বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও এইসব অশুভ প্রেতাত্মাদের কারণে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

আদিবাসী সমাজে 'বাণ' মারার প্রচলন আছে। সাধারণত শত্রুর ক্ষেত্রে এই 'বাণ' প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ভূত-প্রেত, বাণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদিসমাজে 'ওঝা' নামে এক ধরনের সন্ন্যাসী আছে। পুরো আদিবাসী সমাজে 'ওঝা' জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি তারা গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং অনুগত।

www.pathagar.com

বর্তমানে বনবাদাড় লুপ্ত হওয়ায় বিপন্ন পরিবেশে এদের জীবন-জীবিকার ধরন পাল্টে যাচ্ছে। অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায় বাড়িতে শুকর পালন করে। এদের পুরুষেরা মৎস্য শিকারে বেশি আগ্রহী। বাড়িতে বাঁশের জিনিসপত্রও এরা তৈরি করে থাকে। এরা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। ইদানিং সামান্য লেখাপড়া করে এরা অফিস-আদালতে পিয়ন এবং কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করছে। চরম দারিদ্র সামাজিক অবহেলার পাত্র হলেও এদের বাড়িঘর বেশ গোছানো এবং পরিপাটি। আদিবাসী পুরুষ অপেক্ষা নারীরা বেশি কর্মঠ। এদের চলাফেরা ও কাজকর্ম বিশেষ কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আদিবাসীরা বেঁচে থাকার তাগিদে মাছ ধরা, পশুপাখি শিকার, মাঠে ধান কুড়ানোসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে নদীনালা খালবিল, হাওর-বাঁওড়গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং একই সঙ্গে বন-বাদাড় উজাড় হওয়ায় তারা কৃষি শ্রমিক, ভ্যান-রিক্সা চালানো, ছোট-খাট দোকানদারি, জিনিসপত্র ফেরি করে বেচাকেনা, মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও কোনো পরিবর্তন হয়নি আদিবাসীদের জীবনযাত্রার। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও জনসাধারণের তাদের প্রতি যে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য–তার কোনো হেরফের ঘটেনি। দারিদ্র্য-পীড়িত আদিবাসীদের জীবনে নেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা, আদিকালে তাদের জন্য যে বাসস্থানের জায়গা দেওয়া হয়েছিল, শতাব্দীর পরে শতাব্দী পেরিয়ে জনসংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গেলেও তাদের আবাসভূমির জায়গা বাড়েনি মোটেও। আদিবাসীরা সহজ-সরল এবং নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাদের বসবাস বা চাষাবাদের জায়গা-জমির দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে শেখেনি। ফলে ধীরে ধীরে এক সময় তাদের ভূসম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যায়। তারপরেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা সহজেই ভূমিগ্রাসীদের দখলে চলে যাচ্ছে। এভাবে নিরূপায় হয়ে এদের একটা বড় অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে।

এদের শিশুরা কখনো স্কুলের দোরগোড়ায় পৌঁছায় না। সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠী হওয়ায় অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা বা তাদের সন্তানরাও মেলামেশা করতে পারেনা। এক সময়ের কর্ম-কোলাহল এবং আনন্দ-উল্লাসে ভরা জীবন যেন আজ তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা, কর্মহীনতা, হতাশা, দারিদ্র্য — তাদের জীবনকে কেবল নিরুপায় ভবিতব্যের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। অনগ্রসর আদিবাসীদের জীবনে মানবাধিকার নামে প্রত্যয়টির নেই কোনো বাস্তব কার্যকারিতা।

তথ্যদাতা : দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা আদিবাসীপাড়ার সনাতন সর্দার [জন্ম : ১৯৫৭], হাজারি সর্দার [জন্ম : ১৯৫৪], নারায়ণ সর্দার [জন্ম : ১৯৪৯], অনিমা সর্দার [জন্ম : ১৯৬৪], কল্যাণী সর্দার [জন্ম : ১৯৭৮], পুষ্পরাণী সর্দার [জন্ম : ১৯৭২], বিশু সর্দার [জন্ম : ১৯৭০] ; আলমডাঙ্গা উপজেলার আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন আদিবাসীপাড়ার ঘুঘু ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪২], বাবলুকুমার ব্যাধ [জন্ম : ১৯৭৮], গৌরাঙ্গ ব্যাধ [জন্ম : ১৯৫৯], অধীর ব্যাধ [জন্ম : ১৯৫৪], নরেণ ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪৪], ললিতারাণী ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪৩], শৈলরাণী ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪৪], দুলুরাণী ব্যাধ [জন্ম : ১৯৫৪]।

www.pathagar.com

চ. ব্যবসা বাণিজ্য ও যাতায়াত

প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য, শিল্প পণ্য

চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রধান কৃষিপণ্য ধানপাট, গম, ভুট্টা, তামাক, তুলা, আখ, পান, ইত্যাদি। বিল অঞ্চলের নিম্নভূমি এক ফসলী হলেও অধিকাংশ জমিই দোফসলী তিন ফসলী। বর্তমানে জেলার যে কাঁচা তরকারী উৎপন্ন হচ্ছে তা জেলার চাহিদা মিটিয়েও সমস্ত দেশের চাহিদা পূরণ করছে। একসময়ে ব্যাপক হারে পাট চাষ হলেও বর্তমানে বাজার পড়তির কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। গত শতকের ৯০ - এর দশক পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা ছিল শীর্ষ ডাল উৎপন্ন কেন্দ্র। বর্তমানে সে জায়গা দখল করেছে ভুট্টা চাষ। জেলার তাঁতের শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, ধূতি দেশের উল্লেখযোগ্য বাজার দখলকারী শিল্পপণ্য। এছাড়াও আছে বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই কাজ, বিড়ি, বিস্কুট, সুতা ইত্যাদি শিল্প কারখানা। দেশের অন্যতম চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানী এ জেলাতেই অবস্থিত। এখানে দেশীয় মদ, স্পিরিট ও নানান জাতীয় ঔষধ তৈরি হয়। এখানে বঙ্গজ বিস্কুট ফ্যাক্টরী, জ্যোতি বিস্কুট ফ্যাক্টরী, তাল্লু স্পিনিং মিল, আজাদ ফার্মাসিউটিক্যাল ইত্যাদি বড় ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেই জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম। বেকার যুবকরা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ব্যক্তি উদ্যোগেই গড়ে তুলেছে এসব ফার্ম। জেলাওয়ারি যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় জেলার গৃহস্থ কৃষি ৪৫.৩৬%, কৃষি শ্রমিক ২৬.৪৫%, অকৃষি শ্রমিক ৩.২৯%, তাঁত ১.৬১%, ব্যবসা ১২.০৩%, চাকুরী ৩.৫৭%, শিল্প ১.৩৭%, পরিবহণ ১.২৫% ও অন্যান্য ৩.৮৯%।

কেরু এন্ড কোম্পানি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ভারী শিল্প বলতে কেরু এন্ড কোম্পানির শিল্প কমপেক্সকেই বোঝায়, যার অধীনে রয়েছে চারটি প্রতিষ্ঠান- চিনিকল, চোলাই (ডিস্ট্রিলারি), ঔষধ কারখানা ও একটি কৃষি খামার। এর ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৮০৫ সালে জন ম্যাকসওয়েল নামে এক ইংরেজ ভারতের কানপুরের জাগমুতে তখনকার একমাত্র মদ তৈরির কারখানা চালু করেন।

১৮১০-১১ সালে কারখানাটি শাহজাহানপুর জেলার রামগঙ্গা নদীর তীরবর্তী কোলাঘাটে, ১৮২৬ সালে কোলাঘাট থেকে গুণারায় এবং ১৮৩৭ সালে উত্তর ভারতের আখ চাষ সমৃদ্ধ রোজাতে স্থানান্তরিত করা হয়। রোজাতে ডিস্টিলেশনসহ ১৮৩৯-৪০ সালে প্রথম পরিশুদ্ধ চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জন ম্যাকসওয়েল এবং তার ছেলে জন আদম ম্যাকসওয়েলের সঙ্গে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যেমন ১৮২৬ সালে পিটার ব্যারন, ১৮৩২ সালে ফেয়ারলি ফারগুসনস এন্ড কোম্পানি, ১৮৩৪ সালে লায়াল মেথিসন এন্ড কোম্পানি এবং ১৮৪৪ সালে ক্যাপ্টেন ব্যাকেট সংশিষ্ট হন। এই কোম্পনি জন ব্যারন সানডারস কোম্পানি, সান্ডারস ব্যারন, ব্যারন এন্ড ব্যাকেট এবং ব্যারন এন্ড কোম্পানি নামে পরিচিত ছিল।

www.pathagar.com

১৮৪৭ সালের ১১ মার্চ রবার্ট রাসেল কেরু রোজা নামক স্থানে ব্যারন এন্ড কোম্পানির ব্যবসায় যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পরপরই পুনর্বিন্যাসের কর্মসূচি হাতে নেন। এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগেই ব্যারন মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানির এজেন্ট লায়াল ম্যাথিসন এন্ড কোম্পানি, যারা জন ব্যারন স্যান্ডারস কোম্পনিকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছিল, তারা কোম্পানির মূল্য পরিশোধ স্থগিত রাখায় উক্ত কোম্পানি বিক্রয় করে দেওয়ার কথা ওঠে।

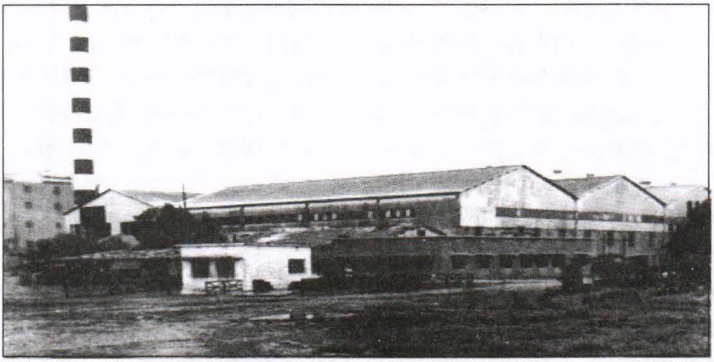

কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকল

রবার্ট রাসেল কেরু এই সুযোগ গ্রহণ করে জন লায়াল ও জন রনির সঙ্গে অংশীদারিত্বের শর্তে এই প্রতিষ্ঠান কিনে নেন। তখন থেকে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে কারখানাটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করে কেরু এন্ড কোম্পানি লিমিটেড নামকরণ করা হয়। এর ম্যানেজিং এজেন্ট হিসেবে কলকাতার মেসার্স লায়াল রনি এন্ড কোম্পানি, মেসার্স গ্রে এন্ড কোম্পানি, মেসার্স গ্রে লয়াল এন্ড কোম্পানি ও মেসার্স লায়াল মার্শাল এন্ড কোম্পানি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্যবসা পরিচালনা করে। তারপর মেসার্স গাডস্টোন উয়ালি এন্ড কোম্পানি লিমিটেড পরিচালনার কর্তত্ব গ্রহণ করে।

ইতোমধ্যে রোজাতে ব্যবসা উন্নতি লাভ করলে আসানসোল ও কাটনীতেও শাখা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে পূর্ব-বাংলার আখ সমৃদ্ধ এলাকা দর্শনায় দৈনিক ১০০০ টন আখ মাড়াই ও ৪০০০ এল.পি.জি. স্পিরিট তৈরির ক্ষমতা সম্বলিত আরেকটি চিনিকল ও ডিস্টিলারি স্থাপন করা হয়। তখন শুধু যন্ত্রপাতি কিনতেই ৩৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। ইংল্যান্ডের গাসগো ও মেসার্স বেয়ারস লিমিটেড এই কারখানায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছিল।

কলকাতার মেসার্স গাডস্টোন উয়ালি এন্ড কোং লিমিটেড দর্শনার কেরু এন্ড কোং লিঃ-এর সচিব ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কাজ করে। কোম্পানির পরিসম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্ত ১৯৬২ সালে করাচিতে কেরু এন্ড কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

প্রাক্তন পরিচালক জে. এম. ব্যাবারম্যান ও অন্য তিনজন কোম্পানির চেয়ারম্যান ও পরিচালক নিযুক্ত হন। কোম্পানির অফিস করাচি থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মেসার্স কেরু এন্ড কোম্পানি লিমিটেড- এর সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে এটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ই.পি.আই.ডি.সি এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এটি কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামে অভিহিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ ও ৫১ এর মাধ্যমে সেক্টর কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এখানে দেশের সেরা ও মানসম্পন্ন চিনি উৎপাদিত হয়। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির অধীনে অসংখ্য আবাসিক ভবন, স্কুল, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, হাসপাতাল এবং কৃষি খামার রয়েছে। দর্শনার অর্থনীতিতে কেরু এন্ড কোং এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।

ছ. হাটবাজার

জেলায় ছোট-বড় মোট হাট বাজারের সংখ্যা ৮৭টি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে নিত্য বাজার বসে। জেলা সদরে ও উপজেলাগুলোতে সদরে যে বাজার বসে তা প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ হাট বসে। জেলার উল্লেখযোগ্য হাট হল আলমডাঙ্গা, জামজামি, ঘোলদাড়ি, খাসকররা, হাটবোয়ালিয়া, জেহালা [মুন্সীগঞ্জ], আসমানখালি, গোকুলখালি, ভালাইপুর, সরোজগঞ্জ, ডিঙ্গেদহ, বদরগঞ্জ, হিজলগাড়ি, দামুড়হুদা, কার্পাসডাঙ্গা, দর্শনা জীবননগর, হাসাদহ ইত্যাদি।

জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

চুয়াডাঙ্গা জেলার বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি সবচেয়ে পুরনো। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী জমিদার মরহুম আবুল হোসেন জোয়ার্দার সাহেবের অক্লান্ত শ্রম ও প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়। তিনিই এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। শুরুতে কারা আবুল হোসেন সাহেবের সহকর্মী ছিলেন, কতজন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় চালু হয়েছিল, সে ইতিহাস কালের অতলে হারিয়ে গেছে। আবুল হোসেনের পর মন্মথনাথ গুঁই এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন এবং বিদ্যালয়ের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রথমে টিনের ঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হয়। ১৯২৮ সালে টিনের চালের পরিবর্তে পাকা দালান ওঠে। এর আগে ১৮৮৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মহারানী ভিক্টোরিয়ার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এই বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া জুবিলি (সংক্ষেপে ভি. জে.) হাইস্কুল। একই উপলক্ষে ভারতের বোম্বাই শহরেও একটি ভি. জে. হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ভবন

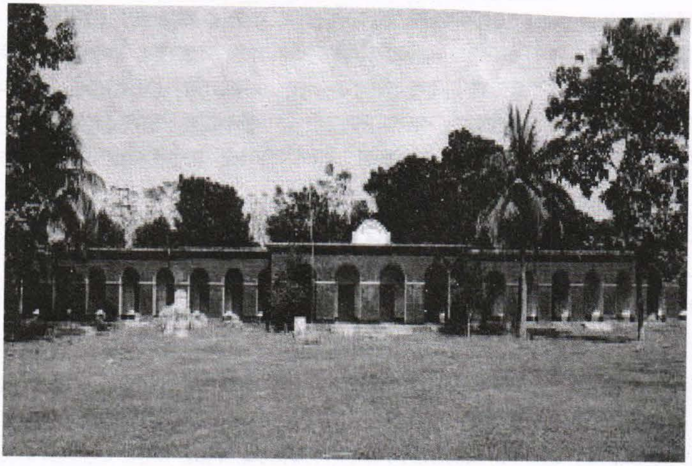

দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী হাজার দুয়ারী স্কুল ভবন

নাটুদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়টি স্থানীয়ভাবে হাজার দুয়ারি বিদ্যালয় নামেই পরিচিত। হাজারটি দুয়ার নেই, তবু এর নাম হয়েছে হাজার দুয়ারি বিদ্যালয়। কাগজ-কলমে দেওয়া নাম ঢাকা পড়ে আছে জনগণের দেওয়া নামের আড়ালে।

১৯০৬ সালে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহের জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী তাঁর পত্নী রাধারানীর স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম ছিল নাটুদহ রাধারানী ইনস্টিটিউশন। পশ্চিমবাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, স্বদেশী নেতা

www.pathagar.com

উপেনচন্দ্র ও বাংলাদেশের শিল্প উপসচিব হাফিজুর রহমান বিভিন্ন সময়ে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এই বিদ্যালয়ের এক তলা ভবনের ১৫টি কক্ষে মোট দরজা রয়েছে ৯৮টি। সেই হিসেবে দশতলা পর্যন্ত নির্মাণ করে ১১তম তলায় আরও ২০টি দুয়ার বানালে তবেই 'হাজার দুয়ারি' নামে যুক্তিসঙ্গত হতো। সম্ভবত সে রকম কিছু করতে চেয়েছিলেন বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিপতি নফরচন্দ্র পালচৌধুরী।

শোনা যায়, ভারতের মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি ভবনের অনুরূপ ভবন বানানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। আর সে খবর রটে যায় এলাকাবাসীর মধ্যে, ফলে নির্মাণ কাজ শুরু হতে না হতেই 'হাজার দুয়ারি' নামটি প্রচলন হয়ে যায়। বর্তমান ভবনের প্রশস্ত ও মাটির বহু নিচ থেকে গেঁথে আনা ভিত দেখেও এ ধারনার যৌক্তিকতা মেলে।

জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কোনো এক মামলার রায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারক তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করে মাত্র এক পয়সা জরিমানা করেন। জমিদারি মেজাজে ঘা লাগে নফরচন্দ্রের। তিনি তিন গাড়ি টাকা নিয়ে হাজির হন জরিমানা দেওয়ার জন্যে। ইংরেজদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তাঁকে 'রাজা' উপাধীও খোয়াতে হয়।

প্রথমে জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী তাঁর বাড়ির পাশে ছাপড়া ঘরে বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। চলতি শতাব্দীর তিনের দশকের শেষে তা জগন্নাথপুরে স্থানান্তর করা হয়। আর এখানেই নির্মিত হয় বর্তমান ভবন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছাদ নির্মাণ করা হয়নি।

হাজার দুয়ারি বিদ্যালয় চুয়াডাঙ্গার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। এ ভবনের চমৎকারিত্ব হচ্ছে, যেদিক থেকেই তাকানো হোক না কেন, বিদ্যালয় ভবনটিকে ইংরেজি 'E' অক্ষরের মতো মনে হয়। এ ভবনটি শুধু এক ক্ষ্যাপাটে জমিদারের অসমাপ্ত অভিলাষই নয়, এটি বহন করছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি।

এখনো হাজার দুয়ারির ইট-কাঠ থেকে মুছে যায়নি বাঙালির রক্তের দাগ। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী এখানে আস্তানা গড়ে। প্রতিদিন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী মানুষকে এখানে ধরে এনে নির্যাতন চালানো হতো। আজো তাঁদের আর্তচিৎকার ভেসে বেড়ায় হাজার দুয়ারির প্রতিটি কক্ষে। বিদ্যালয় ভবনের পেছনে গণকবরে শুয়ে আছেন দুশোরও বেশি নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ। আজো তাঁদের নির্মম মৃত্যু চারিদিকের বাতাসকে ভারী করে রেখেছে।

কেরু উচ্চ বিদ্যালয়

কেরু এন্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠার পরে কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য ১৯৪৭ সালে কেরু উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রথমে এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। স্বাধীনতার পরে এটি উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা অবস্থায় বড় দিদিমনি এবং ছোট দিদিমনি প্র্যাথমিক স্কুলের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্বে ছিলেন। এ বিদ্যালয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১৯৬৯ সালে অংশগ্রহণ করে এবং

www.pathagar.com

প্রথম বৃত্তি পায় মোঃ আলতাফ হোসেন যিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সময় জনাব কবির হেড মাস্টার ছিলেন। এছাড়া বর্তমানে একাডেমির সচিবের পিতা মোঃ মোশারফ হোসেন দীর্ঘদিন এ স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৯৮৯ সালে অবসরে যান। তিনি যতদিন এ স্কুলে দায়িত্ব পালন করেছেন ততদিন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে নাট্যচর্চা করতেন এবং স্কুলে প্রায় শতাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। দর্শনার সাংস্কৃতিক অংগনে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

কেরু উচ্চ বিদ্যালয়

দামুড়হুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯১৩ সালে এ বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ সালের দিকে এ বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। তখন এর নাম হয় দামুড়হুদা কে. ডি. হাই ইংলিশ স্কুল। দামুড়হুদার বিশিষ্ট সমাজসেবী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কালিদাস কুণ্ড-র নামে এ বিদ্যালয়ের নামে 'কে.ডি.' যোগ করা হয়। কালিদাস কুন্ডু'র ছেলেরা বাবার স্মৃতি রক্ষার্থে ২৫শ টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের পাঁচটি ঘর লোহার কাঠামো দিয়ে নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে শুধু অফিস ঘরটি অক্ষত রয়েছে। বাকিগুলো ভেঙে নতুন ভবন গড়া হয়েছে।

এখন যেখানে চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় সেখানে এক সময় ইংরেজদের বিশ্রামাগার ছিল। আমঝুপি (মেহেরপুর) নীলকুঠির ইংরেজরা ঘোড়ায় চড়ে আবার আমঝুপি রওনা হতেন। ১৯১৪ সালে বিদ্বোৎসাহী হায়দার আলী জোয়ার্দার এখানে একটি ঘরে মেয়েদের প্রাইভেট পড়াতেন। সে সময় মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে তা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার; তবু দুচারজন পড়তে আসত। তাঁর পরে নূরনগরের জবেদ আলী মেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব নেন।

সেই সময় চুয়াডাঙ্গার মুন্সেফ (সহকারি জজ) মনীন্দ্রনাথ যোগী স্ব উদ্যোগে একটি ঘর নির্মাণ করে দেন। সেই ঘরটি ভেঙে ফেলে সেখানে বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকা,

www.pathagar.com

সহকারি প্রধানশিক্ষিকা ও অফিস সহকারির অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আবু তাহের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। এরপর নিজামুদৌলা জোয়ার্দার দীর্ঘ নয় বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

বিদ্যালয়ের বর্তমান জায়গাটির মালিক ছিলেন জনৈক টগর মিয়া। তাঁকে অন্য একটি জমি ও ১০ হাজার টাকা দিয়ে এই জায়গাটি বিদ্যালয়ের জন্যে নেওয়া হয়। তখন স্থানীয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীগণ আর্থিক অনুদান দিয়ে সহায়তা করেন। এছাড়াও মোহাম্মদ আলী, মো. ইব্রাহিম, সানোয়ার হোসেন, হুদা মিয়া, আজিজ মিয়া প্রমুখ নানাভাবে সহায়তা করেন। ১৯৬৭ সালের ১ আগস্ট বিদ্যালয়টি সরকারি হয়। বর্তমানে ২৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। ছাত্রী রয়েছে প্রায় সাড়ে ৮শ।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৯১৪ সালে আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন এস. কে. সরকার। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণবিহারী সাহা, গঙ্গাধর জালান, যতীন্দ্রনাথ সাহা, আশরাফ আলী মোল্লা প্রমুখ অনুদান দিয়ে এই বিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালুর আগে আরেকটি বিদ্যালয় চালু ছিল। সেটা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন করুণাকৃষ্ণ সরকার। তিনি বার্মায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই কক্ষে বাস করতেন। সুতাইলের দানশীল ব্যক্তি হাজী শেখ সখাতুল্লাহ বিদ্যালয়ের পানীয় জলের জন্যে একটি কুয়া করে দেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বিদ্যালয়টি ছাত্র সংকটে পড়ে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন আগের সহকারি প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয়কে নবজীবন দেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পান। এই বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ সরকার ও দীন্দ্রেনাথ সরকারকে একবার পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিন মাস পর তাঁরা ছাড়া পান।

হাট বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯২৫ সালে হাট বোয়ালিয়া বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন ঘটে। উচ্চ-বিদ্যালয় হিসেবে এর উত্তরণ ঘটে ১৯৪০ সালে। প্রথমাবস্থায় এই বিদ্যালয়টি পরিচালনার সঙ্গে কৃষ্ণপাল, ড. রাধাবিনোদ পাল, বিশ্বনাথ রংটা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল, রাধাচরণ সাহা, ব্রজলাল আগরওয়ালা, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রমনি মোহন ঘোষ, বিষ্ণুপদ পাল, ডা. ভূপেন্দ্রনাথ পাল, মুন্সী নুরুদ্দীন আহমেদ, ফকির মুহাম্মদ বিশ্বাস, মোবারক হোসেন, হেদায়েত উল্লাহ, গোলাম রহমান প্রমুখ জড়িত ছিলেন।

১৯২৭ সালের কোনো এক রাতে কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ প্রভাবশালী ব্যক্তির নেপথ্য মদদে বিদ্যালয়টি ভস্মীভূত হয়। বিশ্বনাথবাবু ঠাকুর ঘর নির্মাণের জন্যে জমানো ৯শ টাকা বিদ্যালয়কে দান করে পুনর্গঠনে বিশেষ অবদান রাখেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ডা. রিয়াজউদ্দিন আহমদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪০ সালে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। প্রথম ব্যাচে মোট ১৭ জন ছাত্র ভর্তি হয়।

www.pathagar.com

হাট বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৪৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সভায় উচ্চ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিম্ন বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়। সেই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র বলরাম স্বর্ণকার ও প্রথম ছাত্রী ফিরোজা বেগম কোহিনুর।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা: চুয়াডাঙ্গা একাডেমি, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রাহেলা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ডিঙ্গেদহ সোহরাওয়ার্দী স্মরণী বিদ্যাপীঠ সরোজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিয়ারপুর আজিজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নীলমণিগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম. এ. বারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিজলগারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলোকদিয়া রোমেনা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কুতুবপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাখালডাঙ্গা দীননাথপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সারাবাড়িয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ঝিনুক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

জীবননগর উপজেলা: জীবননগর পাইলট, জীবননগর পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, উথলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উথলি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাসাদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আন্দুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গয়েসপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি.সি.কে.এম.পি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও করতোয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা: আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এরশাদপুর একাডেমি, খাসকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ

www.pathagar.com

একাডেমি, মুন্সীগঞ্জ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঘোলদড়ি বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাট বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আইলহাস লক্ষ্মীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোষবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বটিয়াপাড়া শিয়ালমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাদে-মাজু বাদল স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাটাভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ওসমানপুর প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আসমানখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কায়েতপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভোদুয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হারদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড় গাংনি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়ুকান্দি বলেশ্বরপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাঁচলিয়া জামান উদ্দীন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাট বোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বেলগাছি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিওরবিলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সি.এইচ.আর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

দামুড়হুদা উপজেলাঃ দামুড়হুদা পাইলট হাই স্কুল, দামুড়হুদা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, কেরু উচ্চ বিদ্যালয়, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মেমনগর বি. ডি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলাবাড়ি-রামনগর, নাটুদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুড়লগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দলিয়ারপুর নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লোকনাথ নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলদিয়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মহাবিদ্যালয়

চুয়াডাঙ্গায় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস খুব বেশি পুরনো হয়, তবে মহাবিদ্যালয়ের প্রসার ঘটেছে খুব দ্রুত। চুয়াডাঙ্গা জেলায় এখন দশটি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৬২ সালে চুয়াডাঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬৫ সালে আলমডাঙ্গা কলেজে, ১৯৬৯ সালে দর্শনা কলেজ, ১৯৮৩ সালে চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজ, ১৯৮৪ সালে জীবননগর ও চুয়াডাঙ্গা মহিলা কলেজ, ১৯৯৩ সালে হারদিতে এস. এম. জোহা কলেজ, ১৯৯৪ সালে দামুড়হুদায় আবদুল ওদুদ শাহ্ কলেজ এবং বদরগঞ্জ (দশমাইল) বাজারে একটি কলেজ ও মুন্সীগঞ্জে নিগার সিদ্দিক কলেজ চালু হয়েছে।

১৯৪৮ সালে চুয়াডাঙ্গাতে প্রথম শ্রীমন্ত টাউন হলে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি দুর্ভাগ্যেরও। চুয়াডাঙ্গার জোয়ার্দার বংশের সন্তান আবদুর রহিম জোয়ার্দার এই মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। মহাবিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল কায়দে আজম কলেজ। কিন্তু স্থানীয় একটি উচ্চ শিক্ষিত প্রভাবশালী গোষ্ঠী এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধারণা জন্মে যে, এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সবাই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। ফলে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। তারা তাদের যোগ্য সমাদর পাবেন না। সে কারণে ষড়যন্ত্র ও অসহযোগিতা করতে থাকে। একবার মহাবিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

সব কাগজপত্র-খাতা ইত্যাদি চুরি হয়ে যায়। সর্বোপরি জায়গা ও শিক্ষার্থী সংকটের কারণে কায়দে আজম কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ ঘটনারও আগে নাটুদহের উচ্চাভিলাষী জমিদার নফরচান্দ্র পালচৌধুরী চুয়াডাঙ্গায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতে রাজি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরবাসীর কাছে শুধু জমিটুকু চেয়েছিলেন। সে সহযোগিতাও তিনি পাননি। এরপর তিনি নিজ গ্রাম নাটুদহে মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তব কারণেই সে স্বপ্ন সফল হয়নি। চুয়াডাঙ্গায় মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৭৪ সালে। ডা. আসহাব উল হকের চেষ্টায় 'চুয়াডাঙ্গা নারী শিক্ষাঙ্গন' নামে এই মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কলা ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। মোট ৪ জন শিক্ষিকা ও ৩ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। দিলরুবা জোয়ার্দার কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। মোট ছাত্রী ছিল ৪২ জন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে চুয়াডাঙ্গায় নারী শিক্ষাঙ্গনের গভর্নিং বোর্ডের সভায় পৌর চেয়ারম্যান আবদুল মালেক মুন্সীকে আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্থান নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। একই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় শহিদ আলাউল হলে (অ্যাসেসিয়েশন হল) 'নারী শিক্ষাঙ্গন' স্থানান্তরিত হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন সাংসদ ডা. আসহাব-উল হক। এর আগে প্রতিষ্ঠানটি চুয়াডাঙ্গায় কলেজের একটি অংশে চালু ছিল। যশোর বোর্ডের মহাবিদ্যালয় পরিদর্শকও 'নারী শিক্ষাঙ্গন' পরিদর্শন করে যান। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থ,ছাত্রী ও জমি সংকটের কারণে এই মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে চুয়াডাঙ্গার কয়েকটি কলেজের বিবরণ দেওয়া হলো।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজঃ ১৯৬২ সারের ১ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম অবস্থায় স্থানীয় ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষে মাত্র ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলা ও বাণিজ্য শাখার ক্লাশ শুরু হয় ১৯৬৩ সারে জানুয়ারি মাসে। বর্তমান স্থানে একটি টিনের ছাউনির কক্ষে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। একই বছরের এপ্রিল মাসে বর্তমান মূল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এজন্যে সরকারি অনুদান ছাড়াও স্থানীয় জনগণ প্রায় দুই লাখ টাকা অনুদান দেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রেজাউর রহমান। প্রতিষ্ঠাকালে মহকুমা প্রশাসক এস. এইচ. খান মজলিশ, সিরাজুল ইসলাম মালিক, নেহাল মাহমুদ, সাইদুর রহমান জোয়ার্দার, এমাজউদ্দিন আহমদ, শাহাবুদ্দিন মালিক, আজমল হক মালিক প্রমুখের অবদান স্মরণীয়। প্রতিষ্ঠালগ্নের ছাত্রদের মধ্যে আবদুল রাজ্জাক মালিখ ও জগলুল হক জোয়ার্দারের অবদান স্মরণীয়। বর্তমান প্রশাসনিক ও বিজ্ঞান ভবন তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তানভীর আহমদ উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সময়ে চুয়াডাঙ্গা কলেজের শিক্ষার মান এবং পরিবেশের প্রভূত উন্নতি হয়। কলেজের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় স্থান লাভের গৌরব অর্জন করে।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ভবন

চুয়াডাঙ্গায় কলেজের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি এমাজউদ্দীন আহমদের আমলে ঘটে। প্রতিষ্ঠার বছরে উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক শাখায় বাংলা, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, পৌরনীতি, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য শাখায় বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভূগোল, কারবার পদ্ধতি ও বুক কিপিং শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯৬৪ সালে স্নাতক, কলা ও বাণিজ্য, ১৯৬৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক বিজ্ঞান এবং ১৯৬৮ সালে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান চালু হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে এ মহাবিদ্যালয়ে ৬৭৭ জন শিক্ষার্থী ছিল। বর্তমানে এখানে ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ও পাঠাগার আছে।

আলমডাঙ্গা কলেজঃ চুয়াডাঙ্গা জেলার দ্বিতীয় মহাবিদ্যালয় হিসেবে ১৯৬৫ সালে আলমডাঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে প্রথম আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সভা হয়। পরবর্তীকালে তৎকালীন সার্কেল অফিসার একরামুল হক, স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ইউসুফ আলী মিয়া, জেহের আলী বিশ্বাস, হুজুর আলী মোল্লা প্রমুখের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা কলেজ চালু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন আবু তাহের।

মাত্র ৪/৫ জন শিক্ষক এবং ১৫/২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আলমডাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পরে গঙ্গাধর জালানের ৪ তলা ভবনে (বর্তমানে ভেঙে ফেলা হয়েছে) ক্লাস হতো। প্রথমে কলা, তারপর ক্রমান্বয়ে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকালে সার্কেল অফিসার একরামুল হক নিজেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মহাবিদ্যালয় ভবনে আলমডাঙ্গার মুক্তিযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়। ১৯৯০ সালে কলেজটি স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

দর্শনা সরকারি কলেজঃ ১৯৬৯ সালের ১৫ জুলাই এলাকার বিদ্যোৎসাহী, সমাজসেবী ও আখচাষীদের চেষ্টায় ট্রানজিট ক্যাম্পে দর্শনা কলেজ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মহকুমা প্রশাসক তানভির আহমেদ। কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার নেন আনসার আলী। ৪ জন শিক্ষক, ১ জন সহকারি ও ১ জন দপ্তরি নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলেজের জন্যে সকলেই সাধ্যমতো অনুদান দেন।

আখ চাষীরা কেরু কোম্পানির চিনিকলে তাদের সরবরাহকৃত গাড়ি প্রতি আখের দাম থেকে পঞ্চাশ পয়সা দিতেন। ১৯৬৯-৭০ সালে আখ চাষীদের কাছ থেকে কমপক্ষে ৩৬ হাজার টাকা চাঁদা তুলে ট্রানজিট ক্যাম্পকে দোতলা করা হয়। কেরু কোম্পানির শ্রমিকরাও মাসিক বেতন থেকে দুদিনের বেতন কলেজে অনুদান দেন। দর্শনা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান এবং শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন জান মোহাম্মদ, আব্দুল হাই, আবদুল মজিদ, আবদুল হামিদ, নাসিরউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম ও রোকেয়া বেগম। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে কলেজটি যশোর বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭০ সালে প্রথমবারের মতো ২০০ শিক্ষার্থী কলা ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট লাইব্রেরি গড়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে লতাফত হোসেন জোয়ার্দার যোগদান করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে নতুনভাবে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলেজের তৃতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন মোতাহার রহমান। ১৯৭২-৭৩ সালে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক শ্রেণি খোলা হয় এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৪ সাল থেকে আখচাষীরা গাড়ি প্রতি এক টাকা করে কলেজের জন্যে অনুদান দিতেন। ওই বছরই প্রথম কৃষি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৮৩ সালের ১ মে দর্শনা কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজঃ ১৯৮৩ সালের ৯ মে চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মোঃ ফিরোজ-এর উদ্যোগে এ উপলক্ষে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় সভায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মীর মনিরুজ্জামানকে নব প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। চার মাস পর এ্যাড. আবুল কাশেমকে ৭৫০ টাকা মাসিক সম্মানীর বিনিময়ে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়।

প্রথমাবস্থায় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা দানকৃত জমিতে রিলিফের টিন দিয়ে ছাপড়া ঘর তুলে কলেজ চালু করা হয়। তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক কে. এম ফজলুল হক মিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজটি উদ্বোধন করেন। পরে কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরি হলে টিনের ছাপড়া নিয়ে গিয়ে মহিলা কলেজ চালু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা আদর্শ মহিলা কলেজঃ চুয়াডাঙ্গার একমাত্র মহিলা কলেজটি স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৮৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। ওই দিন চুয়াডাঙ্গার আদর্শ বালিকা

www.pathagar.com

বিদ্যালয় স্থানান্তর বিষয়ক এক সভায় এ্যাডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ, এস. এম. ওসমান গনি প্রমুখ মহিলা কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বর্তমানে ২.০৪ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে একটি দোতলা পাকা ভবন ও একটি আধ-পাকা ভবন আছে। কলেজে মোট ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা (অধ্যক্ষ, প্রদর্শক ও ক্রীড়া শিক্ষিকাসহ) কর্মরত আছেন। ছাত্রী রয়েছে মোট ৩৬৯ জন। এখানে ১৯ বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে গভর্নিং বোর্ডির সভাপতি এবং অধ্যক্ষ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জীবননগর কলেজ: ১৯৮৪ সালে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে জীবননগর কলেজের যাত্রা শুরু হয় এবং ওই বছরই যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এই কলেজে ১৭টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১১শ। শিক্ষক রয়েছেন ৩৩ জন। জীবননগর কলেজ ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্যে ১৯৬৫ সালে চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়াড়ে ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। এখানে মডেল তৈরি, ওয়েল্ডিং ফার্ম যন্ত্রাংশ মেরামত, বৈদ্যুতিক কাজ প্রভৃতি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আগে এখানে কাঠের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

একজন সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে চারজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এছাড়া আলমডাঙ্গার কুমারী গ্রামে একটি পশু চিকিৎসক (Vaterner) মহাবিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একটি সেবিকা বিদ্যালয় ও একটি হোমিওপ্যাথি কলেজ আছে।

ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

মসজিদ

মুসলমানদের জীবনে মসজিদ অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগে মসজিদেই সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম পালিত হতো। মসজিদ দেখে যে কোনো এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সম্পর্কে আঁচ করা যায়। চুয়াডাঙ্গা জেলায় কবে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ নেই। তবে বর্তমানে টিকে আছে, এ রকম মসজিদের মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি গ্রামের মসজিদটিই সবচেয়ে পুরনো।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুরাতন মসজিদগুলোর কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। অনেকগুলো বারবার সংস্কারের ফলে প্রাচীনত্ব হারিয়েছে। কতগুলো আবার ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। তাই মসজিদের গঠন শৈলী, এলাকাবাসীর বক্তব্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছে।

www.pathagar.com

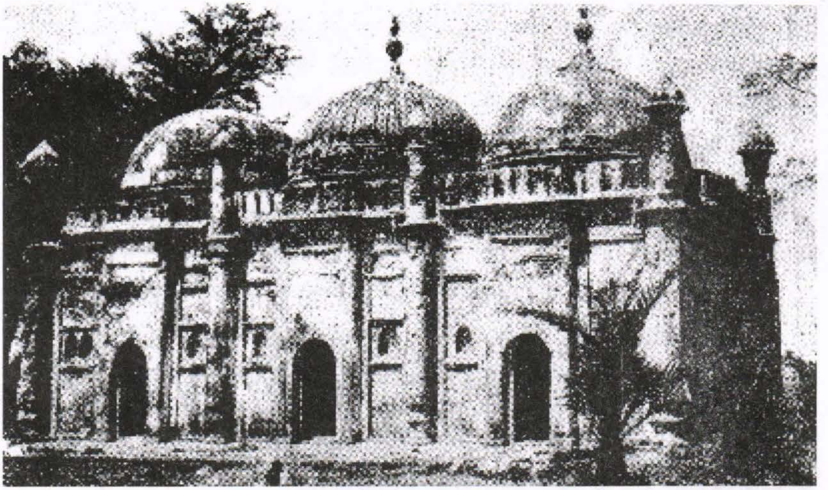

ঘোলদাড়ি মসজিদে প্রাচীন রূপ

চুয়াডাঙ্গা জেলায় গত কয়েক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার মসজিদের সংখ্যা ৩৫২টি। কয়েকটি প্রাচীন মসজিদের বিবরণ দেওয়া হলো :

ঘোলদাড়ি মসজিদ: আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি গ্রামের মসজিদটি চুয়াডাঙ্গা তথা বৃহত্তর কুষ্টিয়ার প্রথম মসজিদ। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি স্থাপত্য শিল্পের এক মূল্যবান নিদর্শন। ৪০´ × ১০´ আয়তনের এই মসজিদের চার কোণে থামের ওপর ৪টি ছোট মিনার আছে। এর দেয়ালের বেধ মাত্র ৫´´-৬´´। দুপাশে দুটি দরজা ও দক্ষিণ পাশে একটি জানালা আছে। ক্ষুদ্র ঢালি ইট, চুন-সুরকির গাঁথুনি ও মেহরাবে ছয়টি ক্ষুদ্র কুঠুরি আছে। ভেতরের দেয়ালে আঁকা নানা ফুল, লতা-পাতা সংস্কারের অভাবে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। মসজিদটি গাঁথার সময়ে অজ্ঞাত কারণে চুন-সুরকির সঙ্গে মুসুরি ডালের দানা মেশানো হয়েছিল।

ঘোলদাড়ি মসজিদের শিলালিপি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এ সম্পর্কে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। শোনা যায়, বাংলা ৪১৩ সালে (১০০৬ খ্রিস্টাব্দ) হযরত খায়রুল বাশার ওমজ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর ঘোরী বংশীয় সুলতানদের শাসনামলে হযরত শাহ সুফী আলাউদ্দিন ঘোরী মসজিদটি সংস্কার করেন এবং পাশেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, মসজিদের নামে ৫শ একর লাখেরাজ ভূমি ছিল। বর্তমানে তার হদিস নেই।

মসজিদের নির্মাণকাল নিয়ে প্রচলিত এই তথ্যের সত্যতা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমত বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমলে নির্মিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত মুসলিম বিদ্বেষী সেন বংশীয় শেষ রাজা লক্ষণ সেন তুর্কী আক্রমণের ভয়ে বিদেশি মুসলমান দেখলেই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই লক্ষণ

www.pathagar.com

সেনের আমলে বা তার আগে মসজিদ তৈরি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয়ের পরে ঘোলদাড়ি মসজিদ নির্মিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম' বইয়ের লেখক-গবেষক শ. ম. শওকত আলী ঘোলদাড়ি মসজিদের নির্মাণ শৈলী বিবেচনা করে হযরত খানজাহান আলীর সমসাময়িক বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রায় একশ বছর আগে মসজিদ সংলগ্ন লোকালয়ে আগুন লাগলে সমস্ত গ্রাম পুড়ে যায়। লোকজন অন্যত্র সরে গেলে মসজিদটি গভীর জঙ্গলে ঢেকে যায়। উনিক শতকের পাঁচ-এর দশকে মুন্সীগঞ্জের মকবুলার রহমান নিজ উদ্যোগে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে মসজিদটি নামাজযোগ্য করে তোলেন। ছয়-এর দশকে সরকারি অনুদানে মসজিদটি সংস্কার করা হয়। ঘোলদাড়ি গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী ৮৫ শতক জমি মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেন।

বর্তমানে এখানে জুম্মার নামাজ আদায় করা হয়। মসজিদের ভেতরে দুই কাতার এবং বাইরে তিন কাতারে নামাজ আদায় করা যায়। মসজিদের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে বারান্দা ঘিরে ফেলায় এর প্রাচীন রূপ বুঝতে অসুবিধা হয়। তাছাড়া গাছপালা বড়ো হয়ে যাওয়ায় এক নজরে পুরো মসজিদটি দৃষ্টিগোচর হয় না। মসজিদটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে মসজিদের বাইরের দেয়ালের আবরণ খসে গেছে। ইটগুলোও ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে সংস্কার করা না হলে একদিকে যেমন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা আছে, অন্যদিকে হারিয়ে যেতে পারে চুয়াডাঙ্গা তথা বৃহত্তর কুষ্টিয়ার প্রথম মসজিদের চিহ্ন।

চুয়াডাঙ্গার বড় মসজিদঃ স্থাপত্যশিল্প ও মুসলিম কীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই বড় মসজিদ। চুয়াডাঙ্গার মল্লিক বংশের মেয়ে কুসুম বিবির একক প্রচেষ্টায় এই মসজিদটি নির্মিত হয়। শোনা যায়, নতুন বাড়ি তৈরির সময় ধর্মপরায়ন নিঃসন্তান কুসুম বিবি একটি মাটির পাত্রে ৫ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পান। আবার কেউ বলেন, এমনিতেই তাঁর অঢেল সম্পত্তি ছিল। তাই ব্যয় করে মসজিদটি তৈরি করেন।

চুয়াডাঙ্গার বড় মসজিদ

www.pathagar.com

সাত লাখ ইট দিয়ে তৈরি এই মসজিদের উত্তর, দক্ষিণে একটি করে দরজা আছে। মসজিদে ঢোকার পথে পূর্বদিকের বাঁ পাশে কুসুম বিবির কবর আছে। মসজিদের সংস্কার ও অন্যান্য খরচাদি বাবদ তিনি কিছু সম্পদ ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেসব কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ায় কুসুম বিবির উত্তরসুরী আনোয়ার মোক্তার পুনরায় তাঁর স্বীয় সম্পত্তির অংশ ওয়াকফ করে দেন।

এই মসজিদের তিনটি গম্বুজ ডিমের কুসুম আর সুরকির মিশ্রণে তৈরি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে গাড়ি গাড়ি ডিম এনে মসজিদের গম্বুজ তৈরি করা হয়। মসজিদের সুদৃশ্য মিনারাটি পাকিস্তান আমলে তৈরি হয়, এটি ৪১ ফুট চওড়া ও ৭১ ফুট উঁচু।

ঠাকুরপুর মসজিদঃ চুয়াডাঙ্গা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে একটি পুরোনো মসজিদ আছে। ১৬৯৮ সালে শাহ্ আর মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন চিশতী ওরফে শাহ আফু পশ্চিম থেকে নবগদা পেরিয়ে এসে ঠাকুরপুর গ্রামে আস্তানা গাড়েন। তিনি একজন নির্জন সাধক ছিলেন। সবসময় ধ্যানমগ্ন থাকতেন, নামাজের সময় হলে কদাচ তিনি বাইরে আসতেন।

একবার জমিদারের খাজনা আদায়কারীরা একে খাজনা বকেয়ার কথা জানায়। তারা হযরত শাহ্ আফুকে জমিদারের দরবারে নিয়ে যাবার জন্যে নৌকা নিয়ে এসেছে বলে জানায়। শাহ্ আফু তাদেরকে রওনা হতে বলেন এবং তিনি নদীর পানির ওপর দিয়ে হেঁটে নৌকার আগেই জমিদারের দরবারে পৌঁছে যান।

এই অলৌকিক বিবরণ শুনে জমিদার শাহ্ আফুকে ঠাকুরপুর আস্তানার জমি লাখেরাজ করে দেন এবং মসজিদ তৈরি করে দেন। যেদিন মসজিদ তৈরি শেষ হয়, সেদিনই শাহ্ আফু কবরে লুপ্ত হয়ে যান। মসজিদের পাশেই তাঁর কবর আছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট ১৬ × ১৬ আয়তনের এই মসজিদটির দেয়ালের বেধ ৩০´´। জোড়বাংলার আকৃতির মিম্বরটির আয়তন ৫০´´ × ৫০´´। মসজিদটি তৈরির জন্যে হাতে তৈরি বিভিন্ন আকৃতির ইট ব্যবহৃত হয়েছে। গড়ে ইটগুলো ২´´-৩´´ পুরু, ৬´´-১৫´´ লম্বা এবং ৫´´-৯´´ চওড়া। মসজিদের ভেতরে দুই কাতারে নামাজ পড়া যায়।

১৯২৫ সালের দিকে মসজিদটি বড় ধরনের সংস্কার করা হয়। ওই সময়ে ফতে আলী, আব্দুল ওদুদ, মেহের আলি প্রমুখের উদ্যোগে স্থানীয় ডাকঘরে একটি হিসাব খোলা হয়। মসজিদের জন্যে বিভিন্নজনের দেওয়া অনুদান ওই হিসাব নম্বরে জমা হতো। মসজিদ কমিটি ওই একাউন্টের সুদ নিতেন না। পরে মোটা অংকের টাকা জমা হলে পুরোনো মসজিদটি ভেঙে নতুনভাবে বড় করে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাদের স্বপ্নে মসজিদ না ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জনশ্রুতি আছে।

বর্তমানে মূল মসজিদ অক্ষুণ্ন রেখে আয়তন বাড়ানো হয়েছে। ঠাকুরপুর মসজিদে যে কোন বৃহস্পতিবারে মাগরিবের সময় থেকে সারারাত নামাজ ও দোয়া-দরূদ পড়ে প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস।

শিবনগর মসজিদঃ চতুর্দশ শতকে দামুড়হুদা উপজেলার শিবনগর গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই ছোট্ট মসজিদটি ছোট ইট এবং চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি করা হয়। নবাব আলীবর্দী খান শিবনগর এলাকায় শিকার করতে এসে

www.pathagar.com

মসজিদটির ভগ্নদশা দেখে সংস্কার করেন। পাকিস্তান আমলে মসজিদটি নতুনভাবে তৈরি করায় এর প্রাচীনত্ব লুপ্ত হয়েছে।

ধোপাখালী মসজিদ: জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট নক্শা আঁকা ৩৬´´ × ২৪´´ আয়তনের একটি মসজিদ আছে। সংস্কারের সময় এর কিছু নক্শা নষ্ট হয়ে গেছে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের সুলেমানপুর গ্রামের হাজী মিরজান শ্বশুর বাড়িতে বাংলা ১২৯৩ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি খরচাদির জন্য ৪৫ বিঘা জমি ওয়াকফ করে দেন।

জামজামি মসজিদ: আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গ্রামের কাজী গোলাম বাংলা ১৩০৭ সালে কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া শাহী মসজিদের অনুরূপ একটি বর্গাকার মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৬ ফুট। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের বারান্দার দেয়ালে সুন্দর নকশা আঁকা আছে। মসজিদের ভেতরটা সংস্কার করায় প্রাচীনত্ব লুপ্ত হয়েছে। কাজী গোলাম যশোরের বাওটিয়া গ্রামের কাদম্বিনী ঘোষের জমিদারি কিনে নেন। কিন্তু খাজনা দিতে না পারায় জমিদারি নিলাম হবার উপক্রম হলে বাংলা ১২৯৮ সালে তিনি সমুদয় জমিদারি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দেন। তারপর মনের মতো করে মসজিদ তৈরি করেন।

তিওরবিলা মসজিদ: নবাব আলীবর্দ্দীখানের আমলে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিওরবিলা গ্রামে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বাংলা ১১৬৮ সালের ৯ কার্তিক তারিখে একখণ্ড সদনমূলে রানী ভবানী এই মসজিদ তৈরি, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্যে ২৫ একর ৩৫ শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন। জনৈক বক্তার চৌধুরীকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়। পরে এই সম্পত্তি ইংরেজি ১৯৪১ সালে বৃটিশ সরকারের ৮০২৭ নং ওয়াক্ফ এস্টেট হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু মসজিদের সম্পত্তি আত্মসাত করা হয়। আদি কাগজপত্রেরও কোনো হদিস নেই। অপরদিকে তদারকি ও সংস্কারের অভাবে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মিত হয়।

উজিরপুর মসজিদ: দিল্লীর খলজী সুলতানদের শাসনামলে দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুরের খলিখাপাড়ায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বারবার সংস্কারের ফলে সেটি এখন নবরূপ লাভ করেছে। এটি গোরস্থান মসজিদ বলে পরিচিত।

কড়চাডাঙ্গা মসজিদ: জীবননগর উপজেলার কড়চাডাঙ্গা গ্রামে টেরাকোটা ইটের একটি পোড়া মাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মসজিদ ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী খানের আমলে এটি তৈরি করা হয়। সংস্কারের অভাবে নকশা আঁকা এই সুন্দর মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেলে সেখানে নতুন মসজিদ তৈরি হয়েছে।

গাইদঘাট মসজিদ: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাইদঘাট গ্রামের সিতাবউদ্দীন জোয়ার্দ্দার নামক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রায় একশ বছর আগে এই পাকা মসজিদটি নির্মাণ করে। মসজিদের খরচাদির জন্যে তিনি আরো দশ বিঘা জমি ওয়াক্ফ করে দেন। এই মসজিদ ৬০ জন মুসল্লী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন।

www.pathagar.com

বাদে-মাজু মসজিদঃ বাংলা ১২৭৮ সালে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। তার আগে এ গ্রামে কোন মসজিদ ছিল না। তখন এ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ঘোলদাড়ি গ্রামের এক ছেলের বিয়ের কথা পাকা হয়। ছেলে পক্ষ বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে বাদে-মাজু গ্রামে আসেন।

নামাজের সময় তাঁরা মসজিদের খোঁজ করে জানতে পারেন যে, এ গ্রামে কোনো মসজিদ নেই। শুধু এই কারণেই তাঁরা বাদে-মাজু গ্রামে ছেলের বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্য মসজিদ বিহীন বাদে-মাজু গ্রামে ছেলে বিয়ে দেব না। এ কথা শুনে পাত্রীপক্ষ তথা বাদে-মাজু গ্রামবাসী কিছুদিন সময় চেয়ে নেন। তারপর ঘোলদাড়ি গ্রামে মিস্ত্রী পাঠিয়ে ওই মসজিদের অনুরূপ মসজিদ নিজ গ্রামে তৈরি করেন। পরে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বাদে-মাজু গ্রামের মসজিদ তাই ঘোলদাড়ি মসজিদের অনুরূপ। বাদে-মাজুর মসজিদ দেখে ঘোলগাড়ি মসজিদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আঁচ করা যায়।

বোয়ালমারি মসজিদঃ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বোয়ালমারি গ্রামের হাজী সুনাউল্লাহ বিশ্বাস বাংলা ১৩০১ সালে তাঁর নিজ বাড়ির সামনে একটি পাকা মসজিদ তৈরি করেন এবং যাবতীয় সম্পত্তি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দেন। মসজিদের পাশে তাঁর কবর।

দলিয়ারপুর মসজিদঃ দিল্লীর খলজী সুলতানদের শাসনামলে দামুড়হুদা উপজেলার দলিয়ারপুর গ্রামে একটি ছোট্ট মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কারের অভাবে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে এ গ্রামে নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

বড়-শলুয়া মসজিদঃ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়-শলুয়া গ্রামে মাটির ঢিবি থেকে ১৯৯২ সালে এটি প্রাচীন মসজিদ পুনরুদ্ধার হয়েছে। এ গ্রামের মহিষতলা নামক জায়গায় মসজিদ তৈরির জন্য একটি মাটির ঢিবি কাটলে তার ভেতরে প্রায় ছাদ পর্যন্ত তৈরি একটি ছোট্ট মসজিদ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, মসজিদটির আগে ছাদও ছিল, গ্রামবাসীরা মসজিদটি সংস্কার করে নিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মসজিদঃ চলতি শতাব্দীর শুরুতে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টপাড়া এলাকায় একটি ছোট্ট মসজিদ তৈরি করা হয়। মসজিদটি প্রতিষ্ঠার তারিখ ও প্রতিষ্ঠাতাদের বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে পুরোনো দলিলপত্রে দেখা যায়, ১৮৯৭ সালে জনৈক আনিসুজ্জামান খান (বাবা আগর আলী শাহ্ টেংরা রোড, কলকাতা) মসজিদ তৈরির জন্যে জমি কেনেন।

২০´´ ভিতের উপর ১০´´ চওড়া করে চুন-সুরকিতে গাঁথা মসজিদটিতে চার কোণে চারটি ছোট্ট মিনার ছিল। মসজিদে তিন সারিতে ১৫ জন করে নামাজ আদায় করতে পারতেন। ১৯৯৩ সালে আদি মসজিদটি ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করা হয়। ৬০´ x ৬০´ আয়তনের বর্গাকৃতি নবনির্মিত মসজিদে ২৬টি জানালা, ৫টি দরজা আছে।

মন্দির

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনে মন্দির অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে তাঁরা ধর্মীয়

www.pathagar.com

রীতিনীতি পালন করেন। অতীতে চুয়াডাঙ্গা ছিল বন-জঙ্গলে আকীর্ণ, অবহেলিত দুর্গম এলাকা। অধিকাংশ বাসিন্দা ছিনে নিম্নশ্রেণির। অভিজাত হিন্দুরা খুব একটা আসেননি। এ অনগ্রসর এলাকায় তাই মন্দিরও নেই বললে চলে। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৮টি মন্দির আছে। এর মধ্যে কয়েকটি পরিত্যক্ত আছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার মন্দিরগুলো প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাতারা কেউ আদি বঙ্গবাসী নয়। কেউ জমিদারের নিমন্ত্রণে (যেমন সোনাতনপুরের ব্রাহ্মণ পরিবার), কেউ নিজস্ব কৃষ্টি অনুযায়ী (যেমন চুয়াডাঙ্গার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা) এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশই দেব মন্দির। তবে এখানে শুধু তন্ত্র সাধনা নয়, সব সাধনাই প্রচলিত ছিল। তাই কিছু কালী মন্দিরের নিদর্শনও পাওয়া যায়। জেলার আদি মন্দিরগুলোতে বিগ্রহ রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি পুজিত হতো। চুয়াডাঙ্গা জেলার কয়েকটি মন্দিরের বিবরণ দেওয়া হলো :

আলমডাঙ্গা শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ মন্দির: বাংলা ১৩৪৭ সালে আলমডাঙ্গা শহরে মন্দিরটি নির্মিত হয়। আলমডাঙ্গা সংলগ্ন কুমারী গ্রামের সাহা বংশীয় কুসুম কুমারী তাঁর স্বামী যোগেন্দ্রনাথ সাহার স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দিরের জন্যে অনুদান দেন। তার সঙ্গে আলমডাঙ্গার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তায় বণিকদের উপাস্য দেবতা শ্রী সত্যনারায়ণের নামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জগন্নাথপুর মন্দির: নাটুদহের জমিদার নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নফর বাবু মন্দির তৈরি করে জায়গাটি জগন্নাথ দেবের নামে উৎসর্গ করেন। দামুড়হুদা উপজেলার ১নং মৌজা হিসেবে চিহ্নিত ও দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত এ গ্রাম থেকে নফর বাবুর আমলে যা আয় হতো, তার সবই মন্দির ও বিদ্যালয়ের পেছনে ব্যয় করা হতো। ৩০´ × ২৭´ আয়তনের মন্দিরের সামনে ছিল বারোয়ারী মণ্ডপ। ১২ মাস কীর্তন করার জন্য ভক্তরা নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনী জগন্নাথপুর মন্দিরের ক্ষতিসাধন করে।

চুয়াডাঙ্গা শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ মন্দির: ১৯১৭ সালে চুয়াডাঙ্গার ফেরিঘাট রোডে বৈদ্যনাথ আগরওয়ালা, মোহনলাল আগরওয়ালা ও শনি নারায়ণ আগরওয়ালার উদ্যোগে শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। উল্লেখিত তিনজন ভারতের রাজস্থান থেকে এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রতিপত্তি অর্জন করে বণিকদের উপাস্য দেবতা শ্রী সত্যনারায়ণের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একই মন্দিরে পৃথক পৃথকভাবে বালাজি ও শিব ঠাকুরের পূজা করা হয়। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা মাড়োয়ারী এ্যাসোসিয়েশন এই মন্দির পরিচালনার ভার নেন এবং পূজা কর্ম নির্বাহের জন্য স্থায়ীভাবে পুরোহিত নিয়োগ করেন। এখানে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ৫ দিনের ঝুলন উৎসব হয়। এছাড়া জন্মাষ্টমী, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসবে মন্দির মুখরিত থাকে।

www.pathagar.com

আলমডাঙ্গার শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ মন্দির

কড়চাডাঙ্গা মন্দির: জীবননগর উপজেলার কড়াচাডাঙ্গা গ্রামে অতীতে বহু সিদ্ধ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও গ্রহ-বিগ্রহগণের বাস ছিল। রামব্রহ্ম রায় এখানকার জমিদার ছিলেন। তিনি এ গ্রামে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত চারচালা সুদৃশ্য শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন গ্রামটির আগের সমৃদ্ধি নেই, শুধু পরিত্যক্ত মন্দিরটি ভগ্নাবস্থায় গ্রামটির পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। অতীতে মন্দির ছাড়া এর ত্রি-সীমানায় আর কোনো ইটের তৈরি ভবন ছিল না।

সোনাতনপুর মন্দির: আলমডাঙ্গা উপজেলার সোনাতনপুর একটি মন্দির আছে। এ গ্রামের বিজয় চন্দ্র দোবে বাংলা ১২শ শতাব্দীর শেষদিকে মন্দিরটি তৈরি করেন। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

চুয়াডাঙ্গা ইন্দিরা অন্নপূর্ণা মন্দির: ১৯৩৫ সালে রাধিকা প্রসাধ নাথ চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টপাড়ায় ইন্দিরা অন্নপূর্ণা মন্দির তৈরি করেন। রাধিকাপ্রসাধ নাথের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রনেন্দ্রকুমার নাথ এই শিব মন্দিরের ভার নেন। এটি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

গীর্জা

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫টি গীর্জা ও কয়েকটি মিশনারি আছে। এগুলো হচ্ছে কার্পাসডাঙ্গার চার্চ অব বাংলাদেশ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চ, খেজুরায় চার্চ অব বাংলাদেশ, ডিঙ্গেদহে এস.ডি.এ এবং বাঘাডাঙ্গায় রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ১৮৫০ সালে কার্পাসডাঙ্গায় গীর্জা তৈরি করা হয়। ১৯৫০ সালে এটাকে মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়। মিশনের মাদার ব্রাডবানের স্মৃতি রক্ষার্থে এই পরিবর্তন। এখানে ১৫টি শয্যার ব্যবস্থা ছিল।

www.pathagar.com

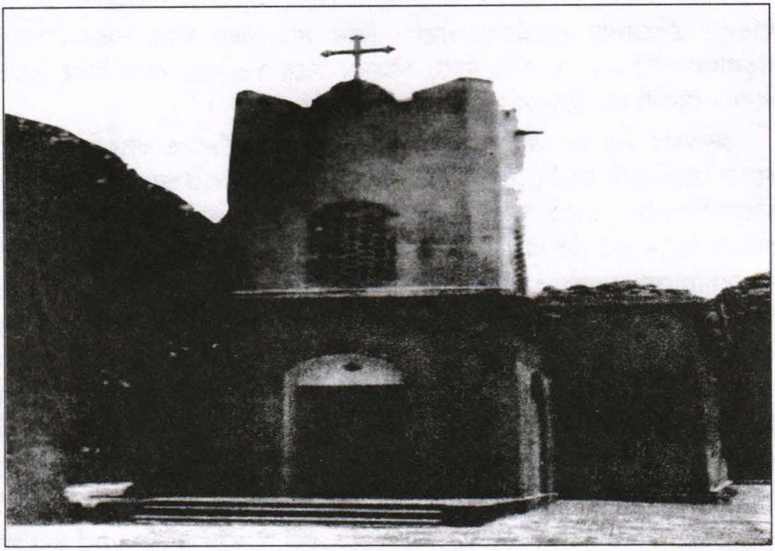

ডিঙ্গেদহের প্রটেস্ট্যান্ট গীর্জা

১৮৬৪ সালে কার্পাসডাঙ্গায় একটি খ্রিস্টান স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। খেজুরার চার্চ অব বাংলাদেশ গীর্জাটি Greas cottage নামে পরিচিত। ১৯০৪ সালে বিদেশি মিশনারি রেভারেন্ড চালটন ও বিধুভূষণ চৌধুরী যৌথভাবে নীলকরদের জমি কিনে খ্রিস্টান মিশন স্থাপন করেন। মিশন কেন্দ্রে বিধবা ও নিরাশ্রয়ীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

ডিঙ্গেদহের প্রটেস্ট্যান্ট গীর্জাটিও গত শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার গীর্জাগুলোতে নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ট. বিশিষ্ট ব্যক্তি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী বা বসবাসকারী যেসব ব্যক্তিত্ব তাঁদের কাজ ও সৃষ্টি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজ-জীবনে অবদান রেখে গেছেন বা এখনো রেখে চলেছেন, তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো। আভিধানিক বর্ণানুক্রমে নাম সাজানো হয়েছে।

অতুলকৃষ্ণ সাহা: ১৯২১ সালে চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাখালচন্দ্র সাহা। অতুলকৃষ্ণ সাহা ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনা ও জজ আদালতে পতাকা উত্তোলন করার কারণে গ্রেপ্তার হন। কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। কৃষ্ণনগর কারাগারে দণ্ড ভোগ করেন।

অনন্তহরি মিত্র: ১৩১১ বঙ্গাব্দের (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) ২৪ পৌষ চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মা পঞ্চাননী দেবী, বাবা রামলাল মিত্র। পৈতৃক বাড়ি

www.pathagar.com

শান্তিপুর উপজেলার বাগআঁচড়া গ্রামে। তিনি সাত বছর বয়স পর্যন্ত বেগমপুরে মাতুলালয়ে ছিলেন। নয় বছর বয়সে চট্টগ্রামে গিয়ে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন।

অনন্তহরি মিত্র ১৪ বছর বয়সে ময়মনসিংহ থেকে ম্যাট্রিক ও কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করেন। স্বামী বিবেকানন্দের উপর অগাধ ভক্তি ছিল। কবিতা লিখতেন। ১৯২১ সালে ওয়েলিংটন স্কয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় ছিল– যার এক অংশে জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ চলত এবং সুভাষচন্দ্র ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সেই সময় অনন্তহরি ওই কার্যালয়ে আসেন। তখন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষায়তনকে 'গোলামখানা' অভিহিত করে স্কুল-কলেজ বর্জন ও জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কাজ চলছে, যা ছিল অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচীর অন্যতম। এখানে কবি বিজয়লাল তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং দুজনে কৃষ্ণনগর গরবিনী কটেজে আসেন। সেই সময় গরবিনী কটেজ (বর্তমান বঙ্গরত্ন প্রেস) জাতীয় বিদ্যালয় হিসেবেই গণ্য হতো। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে যাঁরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করেন, তাঁরা এখানে এসে পড়াশুনা ও আন্দোলনে শরীক হতেন।

অনন্তহরি মিত্র গরবিনী কটেজের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে আন্দোলনের জন্য খদ্দর ফেরি করে, বিক্রয় করা থেকে শুরু করে চরকা কাটা, তাঁত বোনা সবরকম কাজই করতেন। পড়াশোনা ত্যাগ করে স্বরাজের কল্পনা নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। গরবিনী কটেজের পর কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উত্তরে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশনে থাকতেন।

এই বাড়িতে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মীরা আসতেন। এখানে তাঁত বোনার ব্যবস্থা ছিল এবং অনন্তহরি মিত্র নিজে তাঁত বুনতেন। ১৯২৪ সালে কৃষ্ণনগরে থাকার অসুবিধা হওয়ায় অনন্তহরি মিত্র দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতি পাড়ায় একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

১৯২৫ সালে ১০ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বরের ওই কেন্দ্রটি তল্লাশী করে পুলিশ প্রচুর তাজা বোমা, রিভলবার ও বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করে ও দশ-বারোজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। এই সূত্রেই পুলিশ কলকাতার শোভাবাজার কেন্দ্র তল্লাশী করে ও চট্টগ্রামের প্রমোদ চৌধুরীসহ আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে দক্ষিণেশ্বর মামলার রায় বের হয়। অনন্তহরি মিত্রসহ দু-জনের দশ বৎসর করে কারাদন্ড হয়। বাকি কয়েকজনের পাঁচ বৎসর ও দু-বৎসর করে কারাদণ্ড হয়।

দক্ষিণেশ্বর মামলার রায় বের হওয়ার পর পুলিশের ডেপুটি সুপারনিটেনডেন্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই জেলের ভেতর যেতেন ও রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। নতুন কোনো খবর সংগ্রহ করা কিংবা কোনো নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের আশায় তিনি বন্দিদের সঙ্গে কথা বলতেন। বিপ্লবীদের চোখে এটা সন্দেহজনক ও দৃষ্টিকটু মনে হওয়ায় তাঁরা ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তারই ফলে ১৯২৬ সালের ২৮ মে ভূপেন চট্টোপাধ্যায় নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের দায়ে একজন বাদে দক্ষিণেশ্বর মামলার সকল আসামি অভিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

এই মামলায় আলিপুর ট্রাইব্যুনালের বিচারে অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী ও বীরেন ব্যানার্জির ফাঁসির হুকুম হয়। আপীলে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসির রায় বহাল থাকে। অন্যদের মধ্যে পাঁচজনকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয় এবং বাকি কজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯২৬ সালের ৯ আগস্ট মামলার রায় বের হয় এবং ২৮ সেপ্টেম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

অমিয়কুমার রায়ঃ ১৯০৪ সালে চুয়াডাঙ্গার হাসনহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ভূষণচন্দ্র রায়। তিনি ১৯২৪ সালে মাঝদিয়া রেলবাজার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯২৮ সালে বি.এ. পাস করে এম.এ. পরীক্ষার প্রস্তুতিলগ্নে গ্রেপ্তার হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়ার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে অমিয়কুমার অন্যতম। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলন ও কংগ্রেস আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কৃষ্ণনগরের বিপ্লবী কেন্দ্র সাধনা লাইব্রেরীর তিনি প্রাণপুরুষ।

তখনকার ছাত্র-যুবক ও কংগ্রেস সংগঠনের, বিশেষত রাজনৈতিক শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুটের পর অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অমিয়কুমারও ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৪১ সালে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। দেশ ভাগের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় অবদান রাখেন। ১৯৬৪ সালে দলভাগ হয়ে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সঙ্গে যুক্ত হন।

অমূল্যকুমার মৈত্রঃ ১৮৮৬ সালে কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা অক্ষয়কুমার মৈত্র (কৃষ্ণনগর জজকোর্টের পিপি) জন্মসূত্রে চুয়াডাঙ্গার সন্তান। পিতামহ সম্ভ্রান্ত জমিদার নীলমনি মৈত্রের প্রদত্ত জমিতে তাঁরই নামানুসারে নীলমনিগঞ্জ (বর্তমানে মোমিনপুর) রেল স্টেশনের নামকরণ করা হয়। অমূল্যকুমার মৈত্র বাল্যবয়স থেকেই মার্গ সঙ্গীতে আকৃষ্ট ছিলেন। নিজে অনেক গান রচনা ও সুর করেন। তিনি আন্দোলনের সময় কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানের দল তৈরি করে পথে পথে প্রচার চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে দুইদিন চুয়াডাঙ্গা হাজতে আটক ছিলেন।

অমূল্যকুমার মৈত্র কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় পাস করার পর আবগারী বিভাগে চাকরি নেন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে ১৯৩০ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর থেকে 'উষার আলো' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখা কয়েকটি বিপ্লবী নাটকও মঞ্চস্থ হয়। একাধিকবার নীলমনিগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার (ভোজন মোক্তার): ১৯১০ সালে চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। মা আশাফুল নেওয়া মল্লিক, বাবা নওয়াজেশ হোসেন জোয়ার্দ্দার। তিনি চল্লিশ-এর দশকে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন। এরপর রাজশাহীতে ব্যবসা করেন; রাজশাহী চেম্বার্স এন্ড কমার্স-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে চুয়াডাঙ্গায় এসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তিনি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতায় অবস্থান করে শ্রমিক আন্দোলনের ধারায় স্বাধীন বাংলার প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ে অবদান রাখেন। তিনি প্রথমে মোক্তার, পরে এল.এল.বি. পাস করেন। খণ্ডকালীন সাংবাদিকতা করতেন। সরোজগঞ্জ হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

আকরাম আহমেদ, বীরউত্তম: ১৯৪৬ সালের ৯ জানুয়ারি যশোর জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহেরর কবরী রোডে। বাবা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, মা মাফিয়া খাতুন। ১৯৬১ সালে সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৬৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা ফ্লাইং ক্লাব-এ যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে কমার্শিয়াল পাইলট হিসেবে লাইসেন্স পেয়ে পি.আই.এ.তে যোগ দেন। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে শারীরিক পরীক্ষায় অযোগ্য ঘোষণা করায় চাকরিচ্যুত হন। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় পাকিস্তান ফ্লাইং প্রটেকশন বিভাগে যোগ দেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আকরাম আহমেদ মে মাসে আগরতলায় পৌঁছান। সেখানে আগস্ট মাস পর্যন্ত সি.টি.টি.আই ক্যাম্পে থাকেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া বাঙালি পাইলটদের একত্রিত করে নাগাল্যান্ডের দিমাপুর নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কমার্শিয়াল পাইলটদের যুদ্ধ বিমান চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাইলট আকরাম আহমেদ, শরফুদ্দিন ও শামসুল আলম অর্টার চালনার প্রশিক্ষণ নেন। সাধারণত রাতে প্রশিক্ষণ চলত। বিমান থেকে বোমা বর্ষণ ও রকেট নিক্ষেপের কলাকৌশল শেখানো হতো। আকরাম আহমেদসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা পুরো উত্তর ভারতের আকাশ জুড়ে উড়ে বেরিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ শেষে ৩ ডিসেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রামে লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলার দিনক্ষণ ধার্য করা হয়। নির্ধারিত দিনে আকরাম আহমেদ ও সামসুল আলম মর্টার নিয়ে চট্টগ্রামে পতেঙ্গা ফিল্ড ডাম্প (তেল সংরক্ষণাগার) ধ্বংস করে দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর তেল প্রাপ্তি অনিশ্চিত করে দেন। পরবর্তীকালে সিলেট অঞ্চলে একাধিক স্থল বিমান হামলা পরিচালনা করে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। ১৬ ডিসেম্বর তিনি এয়ারক্রাফট নিয়ে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান।

আকরাম আহমেদ আরো তিন মাস বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম ব্যাচে বাংলাদেশ বিমান-এর পাইলট হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানের বয়োজ্যেষ্ঠ পাইলট হিসেবে চিফ অব ট্রেনিং-এর দায়িত্ব পালন করছেন।

আবদুর রহমান জোয়ার্দার লাল্টু: ১৯৫১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার রেলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মা আলফাতুন্নেছা, বাবা গোলাম মোস্তফা জোয়ার্দার। ভি. জে. স্কুল থেকে এস.এস.সি. পাস করেন। চুয়াডাঙ্গা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাস করেন।

www.pathagar.com

বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭৪ সালের ১৩ জুন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লিডার (অফিসার) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

এক বছর ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হন। বিভিন্ন পদাতিক ব্যাটালিয়ন, ব্রিগেড ও ডিভিশনে দায়িত্ব পালন ও দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মেজর হিসেবে অবসর গ্রহণের পর সেনা কল্যাণ সংস্থায় ডিজিএম পদে কর্মরত ছিলেন।

আবদুর রাজ্জাক: ১৯২৭ সালের ১ মার্চ আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাগপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ফকির মহাম্মদ। যুবকালে সমাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হারদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেলা কাউন্সিলের সদস্য এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রাগপুর চাষী ক্লাব প্রতিষ্ঠাসহ উসমানপুর-প্রাগপুর হাইস্কুল, আলমডাঙ্গা কলেজ, আসমানখালী ও হাট বোয়ালিয়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আবদুল হান্নান: ১৯৪৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার রাইতকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোফাজ্জল হোসেন, মা ফুলজান খাতুন। তিনি আলমডাঙ্গা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। মুক্তিযুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানা কমাণ্ডার হিসেবে রণাঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তরুণ বয়সে কৃতি ক্রীড়াবিদ ছিলেন। ফুটবল, কুস্তি, বক্সিং-এ পদকপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মহাব্যবস্তাপক (কল্যাণ) পদে কর্মরত আছেন। স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা (দুই খণ্ড)। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে লিখে থাকেন।

আসহাব-উল হক, ডা.: ১৯২১ সালের ৪ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মা হাজেরা খাতুন, বাবা আহমেদ আলী জোয়ার্দার। চুয়াডাঙ্গা শহরের মাস্টারপাড়ার কালিপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়ার হাতে-খড়ি। এরপর চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে কলকাতা খিদিরপুর একাডেমিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে মেট্রিক পাস করে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, এরপর কলকাতার অ্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে পড়াশুনা করে সবশেষে ঢাকা মিটফোর্ড থেকে এল.এম.এফ. পাস করেন।

তেজস্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডা. আসহাব-উল হক ছাত্রজীবনেই প্রতিবাদমুখর ছিলেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে সহপাঠীদের নিয়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হরতাল প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর বিভিন্ন সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ছাত্র সংঠনের নেতৃত্ব দেন। এ কারণে দুবার তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যায় এবং দুবারই কর্তৃপক্ষ ছাত্রত্ব বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

১৯৪০ সালে তিনি সর্বপ্রথম র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসা পেশায় যুক্ত থাকেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয়ভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হন। এই সময় তিনি ২১ দফার সমর্থনে প্রচারণায় নামেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব-পাস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার যে গৌরবময় ভূমিকা, তার নেপথ্যে প্রধান অবদান ডা. আসহাব-উল হকের। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে চুয়াডাঙ্গায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা, কুষ্টিয়া দখলকারী পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা চালানো, পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রথমবারের মতো পরাজিত করা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা, বিদেশি সাংবাদিক এনে খবরের উপাদান যোগাড় করে দেওয়া সবকিছুই ডা. আসহবা-উল করেছেন।

তাঁর উদ্যোগেই সর্বপ্রথম ভারতের হৃদয়পুরে যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প গড়ে ওঠে। অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করলে ডা. আসহাব-উল কলকাতায় চলে যান। সেখানে তাঁকে রেডক্রসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে বহির্বিশ্বে জনসমর্থন আদায়ের জন্য জাতিসংঘে পাঠানো প্রতিনিধি দলের সদস্য মনোনীত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

ইউনুস আলী, অ্যাডভোকেট: ১৯২৪ সালের ২১ অক্টোবর দামুড়হুদা উপজেলার মুনশীবপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার চাপড়া উপজেলার হাটখোলা গ্রামে। মা মোসাম্মাৎ আমীর উন-নিছা, বাবা মো. নাসিরউদ্দিন আহাম্মদ। হাটখোলা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়। সেখানেই ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন ও বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৪৪ সালে কৃষ্ণনগর মুসলিম হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাস করে ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করেন। ছাত্রজীবনেই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ খেদাও ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে বি.এস.সি. পরীক্ষা দিতে না পেরে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানি চলে আসেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ও এল.এল.বি উত্তীর্ণ হন।

১৯৬২ সালে তিনি প্রথম ঢাকা বারে এবং পরে চুয়াডাঙ্গা বারে যোগ দেন। কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

২৬ মার্চ বিকেলে স্থানীয় এসোসিয়েশন হলে দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ড গঠিত হলে ইউনুস আলী উপ-প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হন। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের

www.pathagar.com

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ইউনুস আলী মুজিবনগরের কাছাকাছি হৃদয়পুর যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প ও চাপড়ার শ্রীনগরে শরণার্থী শিবির গড়ে তোলেন।

যুদ্ধের নয় মাসে ইউনুস আলী ১৫/২০ বার দেশের ভেতরে এসে সভা করেছেন, সাধারণ মানুষের মনে সাহস সঞ্চার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশক হিসেবে তাঁর অবদান আছে। তিনি কৃষ্ণনগরের থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অভিযানের খবর পরিবেশন করেন।

স্বাধীনতার পরে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালে সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দীর্ঘদিন নীরব ছিলেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে সুপরিচিত।

এস. এম. ইস্রাফিল: ১৯৪৫ সালের ১৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মা হালিমা খাতুন বাবা শেখ কায়েমুদ্দিন। ১৯৬০ সালে চুয়াডাঙ্গা ভি. জে. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৬২ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচ.এস.সি, ১৯৬৪ সালে বি.এস.সি ও ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৮ সালে তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ২৬ বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর মাদারীপুর সরকারি নাজিমুদ্দিন কলেজ ও খুলনা সরকারি মহিলা কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন।

২০০১ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে মুন্সীগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হন। সর্বশেষ চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ কামরুল হুদা, প্রফেসর: প্রফেসর মোহাম্মদ কামরুল হুদা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন নগর বোয়ালিয়া গ্রামে ১৯৩৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাবেক প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য, প্রথিতযশা চিকিৎসক, প্রখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাবিদ, মননশীল চিন্তাবিদ, নির্ভীক সমাজ সংস্কারক, বরেণ্য রাজনীতিক মরহুম ডাক্তার রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও মা মরহুমা খোদেজা বেগম। তিনি হাট বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (তৎকালীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করেনে এবং রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) পদে দায়িত্ব পালন করেন। কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত বই 'বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ', 'বাংলা ব্যাকরণ কোষ', 'মূল ভাষা সমূহের উপক্রমণিকা', 'নামাজ ও জাকাত সম্পর্কে কোরানে উল্লিখিত আল্লাহর নির্দেশ'।

www.pathagar.com

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: ১৮৬৪ সালে দামুড়হুদার লোকনাথপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। মাসিকপত্র 'পরিণাম' (ফাল্গুন ১২৯১)-এর সম্পাদক হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু করেন। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার জয়রামপুর থেকে প্রকাশিত হতো। পরবর্তীকালে কলকাতার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিত 'বসুমতি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১০ ভাদ্র ১৩০৩) পদে যোগ দেন। আপন কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার বলে ৪ মাস পরে ওই পত্রিকার সম্পাদক হন।

কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের এক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দুএকটি বইয়ের সামান্য উল্লেখ ছাড়া কোনো জীবনী পাওয়া যায় না। সময়ের ব্যবধানে তাঁর নাম বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তিনি বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুবাদ কর্মে দক্ষ ছিলেন। তাঁর কয়েকটি রস-সমৃদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি ৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকা থেকে ৪০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস পর্যন্ত রচনা করেছেন।

দ্রুত লিখতে পারতেন। ১০ পর্বে বিভক্ত 'রানী কৃষ্ণকামিনী' নামক বিশাল গ্রন্থটি মাত্র এক মাসে অনুবাদ করেন। তাঁর বহু গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ রয়েছে; বহু গ্রন্থের হয়েছে চোরাই সংস্করণ। ডক্টর সুকুমার সেন ১৯৮৯ সালে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' ডিডেক্টিভ গল্প গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

খন্দকার আশরাফ আলী আশু: ১৯৪৯ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা আবেদা খাতুন, বাবা খন্দকার শামসুল হক। ভারতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বিভিন্ন সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা হামলায় সাহসিতার পরিচয় দেন। ১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বর আলমডাঙ্গা শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন।

খন্দকার জামশেদ নূরী টগর: ১৯৪৯ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা জোবেদা খাতুন, বাবা খন্দকার নুরউদ্দিন। ১৯৭১ সালে খুলনা সিটি ল কলেজের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার খোকসা-বাজিতপুর ক্যানেলের পাশে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন।

নজরুল ইসলাম: ১৯৫৪ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার কয়রাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা সৈয়দাতুন নেছা, বাবা মো. ফতে আলী। ১৯৭১ সালে দর্শনা কলেজের ছাত্র ছিলেন। ২০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। ২৫ অক্টোবর নিজ গ্রাম কয়রাডাঙ্গায় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে শহিদ হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে সাহসী ভূমিকার জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধীতে ভূষিত হন।

নজরুল ইসলাম: ১৯৪৯ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দুখী জোয়ার্দার। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল আলমডাঙ্গা উপজেলার হাট-বোয়ালিয়া গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী আবেদ ডাক্তারকে হত্যার জন্য হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়েন। সেটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় ধরা পড়ে যান। পরে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হলে শহিদ হন।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম: ১৯৪৮ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বানাত আলী। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেতরে অপারেশনে আসার সময় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুর গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে শহিদ হন।

নীহাররঞ্জন সিংহ: ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩ পৌষ রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলার বোয়ালমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ফলহরি সিংহ, মা শরৎকুমারী নাবালক শিশুপুত্র নীহাররঞ্জনকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেন। আট বৎসর বয়সে পিতৃহারা এবং ১৫ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতেন। ১১ বৎসর বয়সে প্রথম লেখা কবিতা-

দিনের কাজ করি সমাপন
অস্তে গেলেন রবি,
এমনকালে গিয়ে দেখি মাঠে
সে কি অপূর্ব ছবি।

১৮ বৎসর বয়সে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রেণুকা' এবং পরের বছর 'পছন্দ' নামক পঞ্চমাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়। ২০ বছর বয়সে কলকাতা থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'বাঁশরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২১ বছর বয়সে উমাশশীকে বিয়ে করেন। ১৯৪২ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রূপায়ন' প্রশংসিত হয়। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সাহিত্যিক ছাড়াও সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ, দরদী লেখক ছিলেন। সদাহাস্যময়, সুন্দরের পূজারী কাব্যপ্রাণ নীহাররঞ্জন ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ কৃষ্ণনগর বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

বাদল রশীদ, ব্যারিস্টার: ১৯২৯ সালর ২৮ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গা উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা মেহেরুন নেছা, বাবা রুস্তম আলী জোয়ার্দার। তিনি ১৯৪৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ সালে কুষ্টিয়া সিটি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আলমডাঙ্গা হাইস্কুলে কিছুদিন বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন।

১৯৫২ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান এবং ১৯৬৩ সালে লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। লন্ডনে ১৯৫৩ সালে ইস্ট-পাকিস্তান এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং দেশে ফেরার আগে পর্যন্ত ওই সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফিরে এসে ঢাকা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন করেন। কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে বেশি দিন আইন ব্যবসা চালাতে পারেনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বাদল রশীদ প্রাদেশিক পরিষদের চুয়াডাঙ্গা আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থীতার জন্যে আবেদন করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জাতীয় পরিষদের চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা- দামুড়হুদা-জীবননগর আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেন। নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ পর্বে চুয়াডাঙ্গায় গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের উপদেষ্টা বাদল রশীদ পরবর্তীকালে কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সমন্বয়কারী পদে রাজনৈতিক লিয়াজো কর্মকর্তা ছিলেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীর কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের প্রদান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। আজীবন কৃষকদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন। এক সময় 'কৃষক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালের ২৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

বেবী ইসলাম: ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৯ আশ্বিন ভারতের মুর্শিদাবাদে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মা মোতাহারুন্নেছা, বাবা আবুল হোসেন বিশ্বাস। ১৯৪৫ সালে ক্যাথিড্রাল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৭ সালে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করেন। প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক অজয় কর-এর সান্নিধ্যে নয় বছর কলকাতা ও মাদ্রাজে কর্মরত ছিলেন। 'ভূমি নাই', 'যে নদী মরুপথে', 'রাঙ্গামাটি'সহ মোট ৯টি চলচ্চিত্রের সহকারি চিত্রগ্রাহক। ১৯৫৬ সালে 'হারানো সুর' ও 'বড়দিদি' চলচ্চিত্রে সহযোগী চিত্রগ্রাহকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৯ সালে 'তানহা'র চিত্রপরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র ক্যামেরাম্যান হিসেবে যোগদান করলেও পরের বছর স্বেচ্ছায় সরে আসেন। ১৯৬২ সালে ইটালি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইটালি যান। ১৯৬৪ সালে এফডিসি-র মহাব্যবস্থাপক হন। নয় মাস পর পদত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র সংখ্যা ১৮টি। 'চরিত্রহীন' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পান। 'নয়নের আলো' (১৯৮৪), 'তিতাষ একটি নদীর নাম', 'প্রেমিক' (১৯৮৫), 'দিনকাল' (১৯৯২) প্রভৃতি চলচ্চিত্রের জন্যে পুরস্কৃত হন।

মকবুলার রহমান: ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের (১৯২৬ খ্রি.) ১ আষাঢ় আলমডাঙ্গায় নাগদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ডা. মকছেদ আলী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতন থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মুন্সীগঞ্জ একাডেমির দায়িত্ব নেন। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সাহিত্য অনুরাগী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত।

মীর্জা সুলতান রাজা: ১৯৩৭ সালে ৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার গোয়ালহুদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে। মা সামচে আরা বেগম, বাবা মীর্জা ময়েজউদ্দিন আহমেদ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে অবদান রাখেন।

১৯৫৫ সালে জগন্নাথ কলেজে আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। একই বছরে ৯২-ক ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২১

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী শহিদ দিবস পালন করেন। মীর্জা সুলতান রাজা ১৯৬৫ সালে পটুয়াখালীর আমতলী থানায় ঘূর্ণিঝড়ের পর রিলিফ অফিসার হিসেবে পুনর্বাসন কাজ করার সময় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফিরে এসে ব্যবসা শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার পর তিনি আওয়ামী লীগের যোগ দিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হন। ক্রমে আওয়ামী লীগের চুয়াডাঙ্গা শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক, মহকুমা কমিটির প্রচার সম্পাদক ও বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার কমিটির সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মীর্জা সুলতান রাজা সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংগ্রাম কমিটির সক্রিয় যুব নেতা হিসেবে প্রতিরোধ পর্বে চুয়াডাঙ্গাবাসীকে উদ্দীপ্ত রাখা ছাড়াও শ্রীমন্ত টাউন হলে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীকালে চুয়াডাঙ্গার পতন হলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যান এবং চাপড়া-বাঙ্গালঝি ক্যাম্পে রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া যুব-তরুণদের ক্যাম্পে ভর্তি করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা সবকিছুই নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

স্বাধীনতার পর মীর্জা সুলতান রাজা শ্রমিক লীগের চুয়াডাঙ্গা শাখা গড়ে তোলেন ও কেন্দ্রীয় সদস্য হন। ১৯৭২ সালে জাসদে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি হন। ১৯৭৫ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন।

ছয় মাস পর নভেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করে জাসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দৈনিক গণকণ্ঠের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে রাশিয়া সফর করেন।

১৯৮৬ সালে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯৮৬ সালে জোটের পক্ষ থেকে দামুড়হুদা-জীবননগর আসনে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাসদ ভেঙে গেলে তিনি ১৯৯০ সালে জনতা মুক্তি পার্টি সংগঠিত করে সভাপতি হন। ১৯৯২ সালে আওয়ামী লীগে একত্রীভূত হন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রিয়াজউদ্দিন আহমদ, ডা.: ডাক্তার রিয়াজউদ্দিন আহমদ ১৯০৫ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নগর বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ইজ্জতুল্লাহ বিশ্বাস ও মাতা জয়তুননেছা বিবি। তাঁর নানা মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার ষোলটাকা গ্রামের মিছু বিশ্বাস ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা। ডাক্তার রিয়াজউদ্দিন আহমদ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সদরউদ্দিন বিশ্বাসের কন্যা খোদেজা বেগমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

www.pathagar.com

ডাক্তার রিয়াজউদ্দিন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মোড়ভাঙ্গা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁশবাড়ীয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা ভি.জে. উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, কলকাতা ইসলামীয়া কলেজ, কলকাতা নীলরতন সরকারী মেডিক্যাল কলেজের কৃতি ছাত্র (প্রথম গ্রেডে মহসিন বৃত্তিপ্রাপ্ত), স্বনামধন্য চিকিৎসক, বরেণ্য চিন্তাবিদ, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ, প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্য (এম.এল.এ. যুক্তফ্রন্ট-১৯৫৪), মেডিক্যাল অফিসার কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড হাসপাতাল, গাংনী, প্রেসিডেন্ট ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ, হাট বোয়ালিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাট বোয়ালিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় (বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপকেন্দ্র), হাট বোয়ালিয়া জামে মসজিদ, হাট বোয়ালিয়া কালাজ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র (অধুনালুপ্ত) এবং বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। হাট বোয়ালিয়া কলেজ ও বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা, আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের রূপকার।

তিনি ছিলেন শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তিনি শুধু একজন চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী, মানবব্রতী, জনদরদী সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিত নন, তিনি নিজ অঞ্চল ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত এলাকার এক অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মাঝে বেঁচে আছেন।

তিনি ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি সকালে হাট বোয়ালিয়ায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাইদুর রহমান: ১৯৪৯ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোষবিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা সাজেদা খাতুন, বাবা খন্দকার আবদুল মজিদ। ১৯৭১ সালে যশোরে ই.পি.আর. বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমে ৮নং সেক্টর ও পরে জেড ফোর্সে যোগ দিয়ে যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১ আগস্ট জামালপুরের কামালপুরের যুদ্ধে আহত হন। ১৫ ডিসেম্বর সিলেটের কানাইঘাটের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্যে তাঁকে 'বীরপ্রতীক' উপাধীতে ভূষিত করা হয়। পরে পদোন্নতি পেয়ে নায়েক সুবেদার হন।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: ১৮৯৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। প্রচার বিশেষরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটির প্রচার সচিব ছিলেন। বিভিন্ন সময় বিজলী, উপাসনা, অভ্যুদয় প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন ও অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন উর্ধ্বতন পদে দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতা জাতীয় বিদ্যাপীঠ-এ শিক্ষকতা করেছেন। আমৃত্যু কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বহুবার কারাবরণ করেন।

www.pathagar.com

সাবিত্রীপ্রসন্ন মূলত রবীন্দ্র বলয়ের স্বদেশ প্রেমিক কবি। প্রথম কবিতার বই পল্লীব্যথা (১৯২০)। রক্তরেখা (১৯২৪) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। অন্যান্য বইঃ মডার্ণ কবিতা (১৯৪১), অনুরাধা (১৯৪৪), অতসী (১৯৪৬), জলন্ত তলোয়ার (১৯৫০), কাব্যসঞ্চয় (১৯৫৪), মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র (জীবনী), নেতাজী সুভাষচন্দ্র (জীবনী), আহিতাগ্নি, মধুমালতী, চিত্তরঞ্জন, রক্তরেখা, মনোমুকুর, বন্দনা, নিদ্রবতী রাজকন্যা, কাব্য সাহিত্যের ধারা (২ খণ্ড) প্রভৃতি। শেষ জীবনে কলকাতা কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের ২৩ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সোলায়মান হক জোয়ার্দার সেলুনঃ ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। মা আছিয়া খাতুন, বাবা সিরাজুল ইসলাম জোয়ার্দার। চুয়াডাঙ্গা কলেজের ছাত্র থাকাকালে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনের প্রধান নেতা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের চাকুলিয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতের ব্যারাকপুরে চলে আসেন। পরে মুজিববাহিনীর হয়ে ভারতের চাপড়া-হাটখোলায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক। জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রেড ক্রিসেন্টসহ বহু সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

সোহরাব হোসেনঃ ১৩৩০ সালে চৈত্র মাসের ভরা পূর্ণিমা রাতে নজরুল গীতির এই মহান শিল্পী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার আয়েশতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর সপরিবারে বর্তমান দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার লোকনাথপুর গ্রামে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

বাবা তহিরউদ্দিন মিঞা, মা গুলনাহার বেগমের তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সোহরাব হোসেন। তের বৎসর বয়সেই পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট মহকুমা শহরের জয়নাল আবেদীনের কাছে তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি। কিরণ দে চৌধুরীর কাছেও সঙ্গীতের তালিম নেন তিনি। পরবর্তীতে পল্লীসঙ্গীত-সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের কাছে পল্লী ও নজরুল সঙ্গীতের তালিম নেন। ওস্তাদ মাহমুদ হোসেন খসরুর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে নজরুল সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাবু সুধীরলাল চক্রবর্তীর কাছে আধুনিক গানেরও তালিম নেন। এক পর্যায়ে ইন্দুবালা ও আঙ্গুরবালার কণ্ঠে গান শুনে তিনি নজরুল সঙ্গীতের গায়কী গ্রহণ করেন।

সোহরাব হোসেন বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছেন। নজরুল সঙ্গীত ছাড়াও আধুনিক, গীত, গজল, কাওয়ালী, ভজন, হামদ, নাত এবং লঘু ক্লাসিক্যালসহ বিভিন্ন ধরণের গান তিনি গেয়েছেন।

www.pathagar.com

দেশে-বিদেশে তিনি সঙ্গীতের অনেক একক অনুষ্ঠান করেছেন। সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুর যান।

১৯৬৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে লন্ডন সফর করেন। ১৯৬৮ সালে লন্ডনের বিখ্যাত আর্ট সোসাইটির আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার লন্ডন যান। ১৯৭৪ সালে একবার ভারতের মুম্বাই এবং ১৯৭৫ সালে দিল্লী ও মুম্বাই সফর করেন। ১৯৭৫ সালে আফগানিস্তান এবং ১৯৮৬ সালে পরপর দুইবার আমেরিকা সফর করেন। তিনি ১৯৯১ সালে কানাডা ও ১৯৯৮ সালে লন্ডন সফর করেন।

শিল্পী সোহরাব হোসেনের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে এইচ.এম.ভি রেকর্ডিং সংস্থা থেকে। এছাড়াও তাঁর গান নিয়ে এ পর্যন্ত একটি এল.পি. একটি সিডি এবং দুটি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী গান ও আধুনিক গানের সঙ্গীত শিল্পী ছাড়াও তিনি ছিলেন টেলিভিশনের একজন অভিনেতা। তিনি সঙ্গীতের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন।

সুদীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে ১৯৭৭ সালে নজরুল একাডেমী স্বর্ণপদক, ১৯৭৯ সালে বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে স্বর্ণপদক, ১৯৮০ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার, ১৯৮১ সালে ভারতের চুরুলিয়াস্থ নজরুল একাডেমী হতে নজরুল একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮২ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ১৯৮৪ সালে জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদ, ১৯৯৮ সালে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সম্মাননা, সাংবাদিক আসাফ উদ-দৌলা পুরস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ তিনি দৈনিক প্রথম আলো কর্তৃক আজন্ম সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত প্রশিক্ষক এবং সঙ্গীত বিষয়ক পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশিক্ষক হিসেবে নজরুল ইনস্টিটিউটসহ ঢাকার বেশকিছু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে জড়িত ছিলেন। সরকার কর্তৃক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত নজরুল সঙ্গীত প্রমাণীকরণ পরিষদের অন্যতম সদস্য। নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বি.এ. অনার্স, এম.মিউজ.) ব্যবহারিক সঙ্গীত বিষয়ের বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন। বাংলাদেশ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ব্যবহারিক সঙ্গীত বিষয়ের বহিরাগত পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

হরিদাস ভট্টাচার্য : ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আন্দোলনে তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামী, কংগ্রেস নেতা ও জননেতা বলতে হরিদাস ভট্টাচার্যকেই বুলোত। অক্লান্ত কর্মী, আদর্শবাদী, ত্যাগী ও নির্যাতিত এই কংগ্রেসসেবী বহুবার গ্রেপ্তার এবং ১৯৩০ ও ১০৩২-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ডিত হন।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যখন রানাঘাট পালচৌধুরী হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন ভারত রক্ষা আইনে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে আদেশ জারি হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কংগ্রেস ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে মুসলিম লীগে ঘাঁটি বলে পরিচিত চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে তিনি ছিলেন অগ্রণী। দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে হরিদাস ভট্টাচার্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দেশভাগের পর নৈহাটিতে চলে যান। তাঁর ভাতুস্পুত্র প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হন। হরিদাস ভট্টাচার্য শেষ জীবনে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

ঠ. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে রায়েছে চুয়াডাঙ্গার এক গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস। ২৬ মার্চ সকালে ঢাকার গণহত্যার খবর চুয়াডাঙ্গায় ছড়িয়ে পড়া মাত্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। নানামুখী আলোচনা চলে সর্বত্র। চুয়াডাঙ্গার তৎকালীন যুবনেতা সোলায়মান হক জোয়ারদার সেলুন রেলপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মোকাররম হোসেন জোয়ারদারকে ঢাকার ঘটনা জানিয়ে স্থানীয়ভাবে করণীয় জানতে চান। মোকাররম হোসেন জোয়ারদার বললেন, এক্ষুনি গাছ বা গাছের ডাল কেটে মহাসড়কগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। মোকাররম হোসেন জোয়ারদারের পরামর্শমতো চুয়াডাঙ্গার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরবর্তী পদক্ষেপ নেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

২৫ মার্চ রাতেই যশোর সেনানিবাস থেকে ২৭তম বেলুচ রেজিমেন্টের অফিসারসহ ১৫০ জনের বেশি সৈন্য এসে জেলা-সদর কুষ্টিয়া শহরকে বিনা বাধায় দখল করে সেখানে ৩০ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারি করে। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন মেজর শোয়েব এবং বাকি অফিসারগণ হলেন– ক্যাপ্টেন সামাদ, ক্যাপ্টেন শাকিল ও লেফটেনেন্ট আতাউল্লাহ শাহ। এই বাহিনীর ছিল জিপারোহিত ১০৬ মি.মি. ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান, চাইনিজ ভারী, মাঝারি ও হালকা মেশিনগান, সাব-মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় চাইনিজ রাইফেল, প্রচুর গোলাবারুদ, যানবাহন ও শক্তিশালী বেতারযন্ত্র ।

২৬ মার্চ দুপুরে ই.পি.আর ৪র্থ উইং-এর অধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরী সপরিবারে কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গায় ফিরে আসেন। এদিকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গঠনে ব্যাপৃত। ঐদিন বিকেলেই স্থানীয় এসোসিয়েশন হলে (পরবর্তীকালে শহিদ আলাউল হল) স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অফিসারদের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে অধিনায়ক, ডা. আসহাব-উল হককে প্রধান উপদেষ্টা এবং ব্যারিস্টার বাদল রশীদ ও অ্যাডভোকেট ইউনুস আলীকে উপদেষ্টা করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ড গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা স্তম্ভ '৭১ আলমডাঙ্গা

২৭ মার্চ সকাল ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার ই.পি.আর. হেডকোয়ার্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় চুয়াডাঙ্গার কয়েকজন কর্মকর্তাসহ ৩০/৪০ জন লোকের উপস্থিতিতে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে হলুদ মানচিত্রখচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। কুষ্টিয়া জেলাশহর যখন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে পুরোপুরি অবরুদ্ধ, চুয়াডাঙ্গায় তখন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়াকে পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে রেখে চুয়াডাঙ্গা থেকে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা এর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। একারণে কুষ্টিয়াকে শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরী তাঁদের উইংয়ের বিভিন্ন কোম্পানির বাঙালি ই.পি.আর. সদস্যদের নিয়ে কুষ্টিয়া

www.pathagar.com

শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন। এ লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার আনসার, মুজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের পর অস্ত্র দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বসে ডা. আসহাব-উল হক ও মেজর আবু ওসমান চৌধুরী পরিকল্পনা করলেন, কুষ্টিয়া শহরে একসঙ্গে চতুর্দিক দিয়ে আক্রমণ করা হবে। আক্রমণকারী প্রত্যেকটি বাহিনীর পেছনে যথাসম্ভব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে জমায়েত করা হবে। তাদের দায়িত্ব হল জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে দিশেহারা করে ফেলা, যাতে তারা আক্রমণকারীদের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নিরূপণ করতে না পারে। আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আসহাব-উল হক, অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী, দোস্ত মোহম্মদ আনসারী, মীর্জা সুলতান রাজা, ওবায়দুল হক জোয়ারদার কবু, আল্লা হাফেজ প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করেন।

সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ৩০ মার্চ ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে অপারেশন শুরু হয়। অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন ফার্স্ট লেগ। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনদিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ শুরু হয়। সুবেদার মোজাফফর তাঁর বাহিনী নিয়ে পুলিশ লাইনের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী তাঁর বাহিনী নিয়ে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ সার্কিটহাউজের দিক থেকে জেলাস্কুলের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করেন। আর নায়েব-সুবেদার মনিরুজ্জামান তাঁর বাহিনী নিয়ে পূর্বদিক থেকে অয়্যারলেস স্টেশনের উপর হামলা চালান। প্রতিটি আক্রমণকারী বাহিনীর পেছনে কমপক্ষে ৫ হাজার লোকের সমাবেশ এবং জয়বাংলা ধ্বনি পাকিস্তানি বাহিনীকে দিশেহারা করে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কুষ্টিয়া দখল করে নেন।

১৬ এপ্রিল প্রথম পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গার পতন ঘটে। পাকিস্তানি বাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে ১৫ এপ্রিল ঝিনাইদহ দখল করে নেয়। ১৬ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা দখলের উদ্দেশ্যে আসার পথে সরোজগঞ্জ বাজারে ও মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ারত অবস্থায় এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে বহুসংখ্যক মুসল্লি ও জনগণকে হতাহত করে। তারা সরোজগঞ্জ বাজারে হাটের নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৭০/৮০ জনকে হত্যা করে। আরেকটু অগ্রসর হয়ে ডিঙ্গেদহ বাজারে গুলি করে ২৫/৩০ জনকে হতাহত করে। পথের ধারে প্রায় সকল বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় ও নারী নির্যাতন চালায়। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ বিনা বাধায় চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। এইদিন চুয়াডাঙ্গা মুক্ত হয়। ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর থেকে পিছু হটে পাকিস্তানি বাহিনী চুয়াডাঙ্গার পথে রওনা দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গায় আসে। তাদের আশংকা ছিল পথে মাইন পোঁতা আছে। তাই তারা গাড়ি নিয়ে আসেনি। সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী মাথাভাঙ্গার ওপরের ব্রিজ ভেঙে দেয়। যেন মুক্তিবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করতে না পারে।

মুক্তিযোদ্ধারা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাঁরা চুয়াডাঙ্গা শহরে ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। মতিয়ার রহমান মন্টু, আজম

www.pathagar.com

আক্তার জোয়ারদার পিন্টু, আবদার হোসেন জোয়ারদার, মেজবাহ-উল হকসহ মুক্তিযোদ্ধার একটি দল চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সড়ক ধরে এগুতে থাকে।

উত্তরদিকে খাদিমপুর হয়ে অগ্রসর হয় আবদুর রহমান বিলা ও শফিউদ্দিন মংলার মুক্তিবাহিনী। দক্ষিণদিকে বেলগাছি রেল স্টেশনের পথে রওনা হয় হাফিজুর রহমান হাফিজ ও এহতেশাম হোসেন জোয়ারদার বাবলুসহ মুক্তিবাহিনীর একটি দল।

৬ ডিসেম্বর রাতেই মুক্তিবাহিনী ঘিরে ফেলে পুরো চুয়াডাঙ্গা শহর। অসমসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু মাথাভাঙ্গা নদীর ব্রিজে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অবস্থান দেখে আসেন। শুরু হয় শেষ সময়ের যুদ্ধ। রাতের অন্ধকার চিরে চলে আক্রমণ। চলে গুলি আর পাল্টা গুলি। মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রচণ্ড গুলিবিনিময় হয়। প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে পারে না পাকিস্তানি সৈন্যরা। তারা পরাজয় মেনে নেয়।

৬ ডিসেম্বর রাতে ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী গেরিলা কমান্ডার আবদুল হান্নান আর কাজী কামালকে নিয়ে হালসা থেকে নীলমনিগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন তুলে ফেলেন। তাঁদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল একটি দল। রেল লাইন তুলে ফেলার ফলে পাকিস্তানি সৈন্যরা অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে রেল পথে যোগাযোগ আর সম্ভব হয় না। পাকিস্তানি সৈন্যরা পরদিন ভোররাতে চুয়াডাঙ্গা শহর ছেড়ে চলে যায়। তারা সড়ক পথে আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়ায় রওনা হয়। ৭ ডিসেম্বর ভোরবেলা মুক্ত চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনী।

ড. বিখ্যাত সাধক ও লোকশিল্পী

অমূল্য সাঁই : ১৮৭৯ সালে ঝিনাইদহ জেলার মণ্ড্রেমপুর উপজেলার নওগা-গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মা রাহাতন নেছা, বাবা খোশতন আলী। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে সঙ্গীত শিক্ষায় ব্রত হন। মহেশপুরের নামজাদা সঙ্গীত শিক্ষক হরিদাষ বৈরাগীর কাছে তালিম নিয়ে অল্পদিনেই রাগসঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সেতার, এসরাজ, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতেও দক্ষতা জন্মে। এরপর কলকাতায় গিয়ে নামকরা ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন। দেশজ সঙ্গীতের প্রবল আকর্ষণ তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। মরমী ভাবসাধনায় অসাধারণ ও কণ্ঠসঙ্গীতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করায় দীক্ষা গুরু জহুর সাঁই তাঁর পৈতৃক প্রদত্ত আমির আলী নাম পাল্টে অমূল্য সাঁই নামে ভূষিত করেন। লালন প্রশিষ্য হরিয়ারঘাটার খোদা বকশ সাঁইয়ের কাছ থেকে লালন সঙ্গীত সংগ্রহ ও সুর আয়ত্ব করেন। তিনি লালনগীতির শ্রোতা সৃষ্টি ও আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসরে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। ডান হাতে একতারা, বাম হাতে বাঁয়া বাজিয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের নতুন ধারা তাঁরই সৃষ্টি। প্রশ্নোত্তরে গান পরিবেশনের কথা প্রবর্তন করে গানে আনেন এক নতুন ব্যঞ্জনা। তাঁর কারণেই লালনগীতি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে। শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিল অতি উত্তম। স্ত্রী আলমডাঙ্গা উপজেলার বন্ডবিল গ্রামের জরিতন নেছা। একমাত্র ছেলে দুলাল। অন্যতম শিষ্য বেহাল সাঁই ও খোদা বকস সাঁই। ১৯৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রামে শিষ্যবাড়িতে সমাধি আছে।

www.pathagar.com

আবুল হোসেন জোয়ার্দার খোকন: ১৯৩৩ সালের ৩ মে চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আলী হোসেন জোয়ার্দার। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। চুয়াডাঙ্গার বহু সঙ্গীত শিল্পীর শিক্ষাগুরু। ১৯৯৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

কুবির গোঁসাই: ১৭৮৭ আলমডাঙ্গা উপজেলার মধুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ও বাল্যজীবন পুরোটাই মিথ-এ ভরপুর। কিছু অলৌকিক কাহিনীও শোনা যায়। সুরের ভুবনের ঐন্দ্রজালিক কুবিরের গান জনমানসে যে প্রভাব ফেলেছিল, প্রচলিত জনশ্রুতিগুলোই তার প্রমাণ। মরমী সাধনা ও লোকসঙ্গীত ঐতিহ্যের এই উর্বর ভূমিতে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

জীবিকার প্রয়োজনে মাতৃ-পেশাকে আত্মস্থ করেন। যুগীতাঁতি হিসেবে কর্মজীবনের সূচনা। প্রথম জীবনে গ্রামে গ্রামে পালা গানে অংশ নিতেন। ক্রমে নাম ছড়িয়ে পড়লে কবিরাজি শুরু করেন। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে আস্তানা গড়েন। সেখানে 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের নেতা চরণ পালকে গুরুবরণ করে ওই সম্প্রদায়ের গান লিখতে থাকেন। গুরুর মৃত্যুর পর ভেক নিয়ে বোষ্টম হন। স্ত্রী ভগবতী, সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণমোহিনী। একজন পোষ্যপুত্র ছিল। প্রধান শিষ্য যাদুবিন্দু ও রামলাল ঘোষ। ১৮৯৭ সালে জীবনাবসান ঘটে। বৃত্তিহুদা গ্রামে সমাধি বর্তমান।

কেয়ামত আলী বিশ্বাস: ১৯৫৪ সালের ১২ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। মা করিমন নেছা, বাবা বিশারত আলী বিশ্বাস। ১৯৬৫ সালে স্কুল জীবনেই সঙ্গীত অঙ্গনে প্রবেশ। মূলত আধুনিক ও গণসঙ্গীত শিল্পী। ১৯৬৮ সালে নাট্যঙ্গনে পদচারণা। এ যাবত অর্ধ শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন সময় শিল্পী নিকেতন, সঙ্গীত বিদ্যালয়, ডালিয়া নাট্য নিকেতন, পাইন ক্লাব, সুরালয় প্রভৃতি সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। জেলা শিল্পকলা একাডেমী ও চুয়াডাঙ্গা থিয়েটারের অন্যতম সংগঠক।

খোদা বক্স সাঁই : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আলমডাঙ্গা উপজেলার জাঁহাপুর, গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা ব্যাশোরণ নিচা, বাবা কফিলউদ্দিন বিশ্বাস। বাল্যবয়স থেকেই সঙ্গীতের প্রতি সহজাত আসক্তি ছিল। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কৃষ্ণযাত্রার দলে যোগ দেন। একদিন গ্রামের আসরে বাউল গান শুনে চমকে উঠলেন। সেদিনই শুকচাঁদ সাঁইয়ের কাছে মুরিদান গ্রহণ করেন। পরে অমূল্য সাঁইয়ের কাছে সঙ্গীতে তালিম নেন। অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠের গুণে অচিরেই ভাবসঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অনুশীলনের প্রধানক্ষেত্র লালনগীতি হলেও ১০৪ জন মহতের গান জানতেন। প্রায় ১৭০০ গান কণ্ঠস্থ ছিল। নিজেও একজন গীতিকার বাউল, রচিত গান সংখ্যা প্রায় ৯০০। ১৯৭৬ সালে ফকিরি পোশাক (খিরকা-খেলাফত) ধারণ করেন। ১৯৮২ সালে 'হারামনি' খ্যাত অধ্যাপক মুহম্মদ মুনসুর উদ্দিনের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। লালন কেন্দ্রীয় সংসদ সঙ্গীত সাগর উপাধীতে ভূষিত করে।

১৯৮৩ সালে শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষণ বিভাগে লালনগীতির প্রভাষক পদে যোগ দেন। তাঁর কণ্ঠে ধারণকৃত লালনগীতির সুর থেকে প্রখ্যাত শিল্পী সুধীন দাশ স্বরলিপি প্রস্তুত করেন। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ (সংখ্যা ১৫৮)

www.pathagar.com

প্রদান করে। লালনগীতির প্রশিক্ষণ, পরিবেশন ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালে শিল্পকলা একাডেমীর চাকরি ছেড়ে দেন। বাকি জীবন নিজ গ্রামে কাটে। ১৯৯০ সালে ১৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ওই বছরেই তাঁকে মরণোত্তর 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়। স্ত্রী রাহেলা খাতুন, ছেলে আবদুল লতিফ সাঁই, মেয়ে মালঞ্চ। নিজ বাড়িতে সমাধি আছে।

খোরশেদ সাঁই : ১৯০৭ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভুলটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা নেকজান বিবি, বাবা আহাম্মদ বিশ্বাস। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বাউল সঙ্গীত আকৃষ্ট হন। গুরু হাড়ুকান্দির হাজারী সাঁই। বেশকিছু গান লিখেছেন, তবে গায়ক হিসেবেই খ্যাতিমান ছিলেন। দুই স্ত্রী কদবানু ও গোলাপী নেছা। তিন ছেলের মধ্যে তাইজেল সাঁই এখন খ্যাতিমান গায়ক। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

গোলাম ঝড়ু সাঁই : ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা বাতসা দেবী, বাবা মাখনচন্দ্র ব্যাধ (মহিন সাঁই)। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে যাত্রা দলে যোগ দেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ শুনলে পথিক থমকে দাঁড়াত। বাবা গান-বাজনায় বাধা দিলেও চাচা অনুকূলচন্দ্র ব্যাধ ভাতিজাকে নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। চাচার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা নেন, তার বয়স তখন ১৯ বছর। এরপর দীর্ঘ ৫০ বছর দাপটের সঙ্গে গান গেয়েছেন।

দোতারা ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তিন সহস্রাধিক গান কণ্ঠস্থ ছিল। নিজেও অসংখ্য উচ্চভাবপূর্ণ গান রচনা করেন। ১৯৭০ সালে গুরু জোনাব আলী সাঁইয়ের কাছে খিরকা-খেলাফত ধারণ করেন। ১৯৮২ সালে শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্ত্রী যথাক্রমে পাতাসী, আগমনী, রঞ্জিতা ও মূলাজান। শেষ জীবন কাটে মেহেরপুরের যাদবপুর গ্রামে। ১৯৯৮ সালের ১০ মার্চ বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

দুলাল সাঁই : ১৩৭০ বঙ্গাব্দে আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বনমালী শাহ। ছেলেবেলায় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। দীর্ঘ ৪৫ বছরের সঙ্গীত জীবনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়েছেন। নিজে গান লিখেছেন তিন শতাধিক। ১৯৯৫ সালের ৯ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। ফরিদপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে সমাধি রয়েছে।

বেহাল সাঁই : ১৯০৪ সালে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আলচরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বাহাদুর ফকির। জন্মের পর মাকে হারিয়ে আলমডাঙ্গার নাগদহ গ্রামে খালার বাড়িতে বড় হন। খালু লালন প্রশিষ্য ছমিরউদ্দিন সাঁই কিশোর বেহাল দীক্ষিত করেন। ৩৫ বছর বয়সে আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে আস্তানা গড়েন। অসংখ্য বাউলগানের রচয়িতা ও সুরকার। কিছু গান প্রশ্নোত্তর ছলে রচিত।

লালগীতির মরমী শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। স্ত্রী হাওয়া খাতুন ও মেয়ে আয়েশা খাতুন। ১৯৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ফরিদপুর গ্রামে নিজ বাড়ির আঙিনাতে সমাধিস্থ করা হয়। বাউল সম্প্রদায় তাঁকে 'বাউল শিরোমণি' উপাধীতে ভূষিত করেছে।

www.pathagar.com

শুকচাঁদ সাঁই : ১৯০৭ সালে ঝিনাইদহ জেলার হলিনাকুন্ডু থানার চটকাবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শীতল মণ্ডল। গো-চারণ করেই ছেলেবেলা কাটে। মূল পেশা কৃষিকাজ। এক আসরে অমূল্য সাঁইয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব বরণ করে দীক্ষা নেন। লালন প্রশিষ্য হরিয়ারঘাটের খোদা বকশ সাঁইয়ের কাছ থেকে বহু লালগীতি সংগ্রহ করেন। রচিত গান সংখ্যা সীমিত, কিন্তু সেগুলো কবিত্বপূর্ণ ও ভাবসম্পদে অপূর্ব।

প্রথম স্ত্রী শাহারণ নেওয়া কালীদাসীর কোনো সন্তান না হওয়ায় রঙ্গনেছাকে বিয়ে করেন। তার ছেলে দুখী মামুদ। লালনগীতিতে খ্যাতি অর্জনের পর চুয়াডাঙ্গার গড়গড়ি-পুটিমারি গামের বাণুকে বিয়ে করেন। প্রধান শিষ্য জাঁহাপুরের খোদা বকস সাঁই। চুয়াডাঙ্গা শহরের কাছে গোপীনাথপুর গ্রামে মাজার বর্তমান।

যাত্রাশিল্পী

চুয়াডাঙ্গার যাত্রাশিল্পী হিসেবে বাহার আলী, শঙ্কর, মুনসুর সর্দার, মধাব, তাহার আলী ইসলাম, শংকর, ইউসুফ, শাহজাহান আলী বিশ্বাস, পাঞ্জাব মিয়া, মোজাম্মেল হক, জহুর, নন্দকুমার দাস, আখের আলী, অজামীল চন্দ্র, জান মোহাম্মদ, চাঁন্দা, মোবারেক আলী (মুবা) দুলাল চন্দ্র, কলিম উদ্দিন, হারু ফকির, সার্জ্জেত আলী সিজু, ইসমাইল, ইউনুস, আবুল, তিনকৌড়ী, শুকরো, মনতাজ, জাফর, জবেদ আলী, সন্তোষ কুমার ভাস্কর, অজিত কুমার হালদার, বিষ্ণুপদ অধিকারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবী

সঙ্গীতে চুয়াডাঙ্গা গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। এখানে জন্ম নিয়েছেন বহু দেশ বরেণ্য শিল্পী। তাঁরা সার্বিকভাবে দেশের সঙ্গীতধারাকে শুধু এগিয়েই নিয়ে যাননি, প্রভাবান্বিত ও করেছেন। সঙ্গীতের বিকাশ ঘটে শিল্পীর নিরবছিন্ন সাধনা ও সঙ্গীত পিপাসুদের অকৃত্রিম প্রেরণার উপর।

বৈঠকী সঙ্গীত ও আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার অতীত ঐতিহ্য বেশ গুরুত্ববহ এবং গৌরবময়। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ সঙ্গীত-সাহিত্য, ক্রীড়া ও লোকশিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। আর সেই সূত্র ধরেই এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এসবের চর্চা ও নানা অনুষ্ঠানে ইত্যাদি উদযাপিত হয়ে এসেছে।

বৈঠকী সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গা জেলা এলাকার ইতিহাস খুব বেশি দিনের পুরনো না হলেও ইংরেজ শাসনামল শুরুর পর থেকেই শহর ও গ্রামাঞ্চলে কবি, জারী, ধুয়ো জারী, পীরের গান, কৃষ্ণ যাত্রা, মেঠো জারী, ভাসান গান, শোকনামা, শব্দগান, যাত্রা, পালা গান, ও বেহুলা মনসার ঝাঁপান ইত্যাদি সুপরিচিত ছিল।

সেই সময় সংগীত সংস্কৃতি পিপাসুদের মানসিক বিকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য এগুলোই ছিল প্রধান উৎস ও জনপ্রিয় মাধ্যম। এসব গান-যাত্রাগুলোতে সাধারণত ডুগী, খোল, কাঁসি, ঢোল, আড় বাঁশী, ঝুমুর, পাখোয়াজ, দোতরা, খুঞ্জরী ও হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো।

www.pathagar.com

ভারতবর্ষ বিভাগের পর এই অঞ্চলে বৈঠকী সঙ্গীতের প্রসার শুরু হয়। চুয়াডাঙ্গার দুজন মহকুমা প্রশাসক রাজা সাহেব ও শ্রীমন্ত বাবু, বিশিষ্ট জমিদার বুদু মিয়া, ডা. মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, ভাদু বাবু, নথিয়া বাবু বোয়ালিয়ার সুধীর বাবু, নীলমণিগঞ্জের নীলমণিবাবু প্রমুখ এতদ্বঅঞ্চলের লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

সেই সময় এই এলাকায় কোনো সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। পৃষ্ঠপোষকদের বাসভবনে কিংবা বাগানবাড়িতে মাঝে মধ্যেই বৈঠকী গানের আসর বসত। আসরে বাইরে থেকেও সঙ্গীতানুরাগী ও শিল্পীদের অংশগ্রহণ করার কথা শোনা যায়।

১৯৫০ সালে চুয়াডাঙ্গায় প্রথম সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'চুয়াডাঙ্গা সঙ্গীত সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ডা. মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। চুয়াডাঙ্গা সঙ্গীত সংঘ প্রতিষ্ঠায় অন্যান্যদের মধ্যে যারা অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আফসার উদ্দিন সর্দ্দার, ওস্তাদ আবদুল মজিদ সরকার, শামসুল হুদা, আবদুল মালেক জোয়ার্দার, অজামিল চন্দ্র দাস, কলিম উদ্দিন, ইসমাইল হোসেন, মহিউদ্দিন মহি, ওয়াজেদ আলী ঝড়, বদরউদ্দিন ও আবদুল গণি অন্যতম।

সঙ্গীত প্রসারের ক্ষেত্রে সে সময়ে আরো যেসব সঙ্গীতানুরাগী স্মরণযোগ্য, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : সাহাদৎ হোসেন, টেংরা বাবু, আবুল হোসেন জোয়ার্দার, বাবু অরুণধর, মহেন্দ্র বাবু, ফজলু মিয়া, হেমন্ত সান্যাল, বনমালী, তারাশঙ্কর, ওয়াজেদ আনোয়ারুর কাদির, দর্শনার ক্ষিতিষ বাবু, ওস্তাদ আবুল হোসেন, মুলুক চাঁদ, এবাদত মণ্ডল প্রমুখ।

সেই সময় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা ও সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে মহিলা শ্রেণীর মধ্যে সঙ্গীত চর্চা ছিল না বললেই চলে। তবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের কয়েকজন মহিলার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন: মাখন বিশ্বাসের মেয়ে গীতা, রমণী ভগবতী, সাইমা খাতুন তরু, ডা. উমা ও কহিনুর বেগম প্রমুখ।

পরবর্তী পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গার সঙ্গীত ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়। গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে ছিল– সুরবিতান, গীতবিতান, সুরালয়, নজরুল একাডেমী ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এ. কিউ. জোয়ার্দ্দার খসরু, মহিউদ্দিন আহমেদ, মনোজ কুমার (ফিরোজ চৌধুরী), সুকুমার বাবু, আলী হোসেন, সুধীর বাবু, ইসরাইল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, ছহিউদ্দিন, আবুল কালাম খাঁন, ইকবাল আতাহার তাজ, মতিয়ার রহমান ভল্টু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গা এলাকায় যেসব শিল্পী কুশলীরা বিভিন্ন সময় অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে দৌলতদিয়াড়ের হাজারী বাদল, নতিডাঙ্গার দিদার বকস, খাদেমপুরের সাবের গায়েন, মোজাম্মেল ও দিদার বকস, কেষ্টপুরের মহরালী (মওরা) নবীন মণ্ডল ও হকাজ্জেল, হাজরাহাটীর ফলেহার, কুলচারার আহাদ গায়েন, শিয়ালমারীর ইকারদ্দি, হোগলবগাদীর মাতু গায়েন, হানুরবাড়াদীর শুকুর আলী, পিরোজখালীর সাত্তার, নিমতলার সুলতান ও কালুব্বারী, জাফরপুরের হায়দার, সুমিদ্দিয়ার আজিবর, নাগদার হোসেন গায়েন চুয়াডাঙ্গার কাতর বয়াতী, হোসেন মণ্ডল, মোজাম, মাতু, আবুল, নুরু আজিমদ্দি, ফজলু, মুসা, রহম, সোমো মণ্ডল, সাজু,

www.pathagar.com

মতলেব আলী, সবেদালী ও ভেলু, গোপীনাথপুরে নরজেত আলী হারদী-চাঁদপুরের চাঁদ আলী, পীরপুরের মানুয়ার, পাইকপাড়ার নকিমউদ্দিন, তালতলার আমজেদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শব্দগান-এর শিল্পীদের মধ্যে জাহাপুরের খোদা বকস শাহ ও ইউনুস আলী, ভুলটিয়ার খোরশেদ শাহ, তাইজেল ও আফজেল শাহ, বহালগাছির হেদায়েত শাহ, দর্শনার হোসেন শাহ, ফরিদপুর (আলমডাঙ্গা)-এর বেহাল শাহ ও দুলাল শাহ, খাড়াগোদার শুকুর শাহ, চুয়াডাঙ্গার বাক্কার, এলিমদ্দি, আজিজ, রহম আলী, আবদুল ফকির, ফজলু, রবি, এবং যাত্রা-পালা/পীরের গান; ভাসান গান-এর সৈয়দ আলী, হাজারী বাদাল, তোকিম মণ্ডল, কিয়ামদ্দি, ওলি মালিতা, কুশো, তাহার আলী, চাঁদ আলী, মাধব, ভাদু, কায়েমালী, মনসুর আলী, আফসার ও বাহারালী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেহুলা মনষার 'ঝাঁপান' বহুকাল এতদ্বঞ্চলের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত রেখেছিল। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি ও আর্থিক অভাবে এই ঐতিহ্যময় ঝাঁপান শিল্প আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। জেলার গ্রাম-গঞ্জে এখনো এই 'ঝাঁপান' দেখা যায়। অসংখ্য বিষধর সাপ গায়ে জড়িয়ে দুটি দল এই সাপ খেলা দেখায়। প্রতিপক্ষের তন্ত্র-মন্ত্রে সাপ উত্তেজিত হয়ে নিজের প্রভুকেই শেষে ছোবল দেয়।

ঝাপানের সময় এই বিষধর সাপের ছোবলে চুয়াডাঙ্গার রহম আলীর মতো প্রখ্যাত সাপুড়ে মারাও গেছেন। এই ঐতিহ্য ও গৌরবময় 'ঝাপান' শিল্পের সঙ্গে জড়িত চুয়াডাঙ্গার খোরশেদ আলী, সবেদ আলী, উজিরপুরের চাঁদ আলী, সুমিদ্দিয়ার ছামছদ্দিন, বুজরুকগড়গড়ির জামাত আলী, তালতলার রহমান ও আমজেদ, টেংরামারির নৈমুদ্দিন, পুরন্দরপুরের ফটিক, আকুন্দবাড়িয়া (দর্শনা)-এর কাসেম, জয়রামপুরের মোফাজ্জেল, কাঁঠালপোতার আকসেদ, গাইদঘাটের ইছাহক, খেজুরতলার জহির, কেদারগঞ্জের প্রেমচাঁদ, লোকনাথপুরের দুখীদাস, উকতোর ভাগবত মিস্ত্রী, শিয়ালমারির মকছেদ মালবদ্দী, মৃগমারীর অবনী বাগদী, নেহালপুরের ময়া বাগদী, ধুতরহাটের রাজীন্দ্র দাস, শাহাপুরের আবদুল করিম, তেঘরীর কেশরী দাস, ফরিদপুর (আলমডাঙ্গা)-এর নৈমদ্দি, সিংহটিয়ার হবি, গাড়াবাড়িয়ার জমাত আলী, খাদিমপুরের মকবুল বিশ্বাস ও হাজরাহাটির বিশারত আলী প্রমুখ লোকশিল্পী ও সাপুড়েদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের সংগীত শিল্পীদের মধ্যে আবুল হোসেন খোকন, আবদুস সামাদ, শরীফউদ্দিন বিশ্বাস, সহিদুল হক, গোলাম মোস্তফা ভোলা, মাহতাব উদ্দীন, আকতার হোসেন, আশরাফুল হক মনা, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম তারা, তালাত মাহমুদ, শওকত মাহমুদ, আবদুল মান্নান, আশাবুল হক, নিজাম মাহমুদ, মিজানুর রহমান হীরা, জামাল উদ্দিন, মিজানুর রহমান হান্নান, ইলিয়াস হোসেন ইলু, সিরাজুল ইসলাম, আলী আশরাফ, আবদুল মান্নান কচি, নূর ইসলাম, শওকত হাসান, মোহাম্মদ হারুন, আবদুর রাজ্জাক, আজহারুল ইসলাম, হাসমত আলী চৌধুরী, আতিয়ার রহমান, আকবর হোসেন ইন্না, কাজল মাহমুদ, আবদুল মালেক, সাহাদৎ হোসেন, সাহাবুদ্দিন খোকন,

www.pathagar.com

মুসা, দিনু, আবুল হোসেন আবুল, শাহাদাত হোসেন, আবুল হোসেন, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, যতীন্দ্রনাথ সরকার, তারাপদ ঘোষ, আবুল লতিফ, আফসার আলী মিয়া, আনসার আলী, শাহাবুদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন, মোমিন উদ্দিন, আবুল ওয়াদুদ, ইসরাইল হোসেন বাদল, আবুল হোসেন জোঃ, আবদুল মজিদ সরকার, আফসার উদ্দিন, ইউসুফ আলী, নজরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে শিরিন আরা, স্বপ্না, শান্তা, কেয়া, লিলি, সামীমা, শিউলী, বেবী, রেহানা, পলি, মুক্তি, পারভিন, মাহমুদা পলি, সোনিয়া, স্বাতী, ডোরা, রীনা, দোলনা, বেলী, মনিকা, বীনা, কণিকা, রুবিনা ও আরো অনেকের নাম স্মরণযোগ্য।

চুয়াডাঙ্গার মোঘলজাল ছিলেন সাধক সঙ্গীতজ্ঞ। চুয়াডাঙ্গার কোর্টপাড়া নিবাসী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরী ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা গানগুলোকে রাগভিত্তিক সুরারোপ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা হলেনঃ শতকত আলী, গাজী বাবুল, আঃ লতিফ, নবীউল ইসলাম, পুর্ণচন্দ্রনাথ, আজামিল দাস, তরুণ ধর, অরুন ধর, অজামিল চন্দ্র দাস, ইসমাইল হোসেন, মাহতাব উদ্দিন, তজপ আলী (গড়াইটুপি) প্রমুখ।

১৯৭৭ সালে 'চুয়াডাঙ্গা মহকুমা শিল্পকলা পরিষদ' নামে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তা শিল্পকলা একাডেমীর মর্যাদা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদাধিকারবলে মহকুমা প্রশাসক বদিউজ্জামান এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবদুল মজিদ সরকার।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল ছোটশিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য ন্যাজজুড়া (লেজ জড়ো) এক কাল্পনিক প্রাণীর গল্প বলা হতো। শিশু ঘুমাতে না চাইলে পাশের কোনো বড় ঝোপালো গাছের কথা উল্লেখ করে বলা হতো, শিগরি ঘুমিয়ে পড়ো নাহলে ওই গাছে থেকে 'ন্যাজজুড়া' নেমে এসে তোমাকে লেজে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাবে। ভয়ে শিশু ঘুমিয়ে পড়ত।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের অনেক লোকগল্প মুখে মুখে প্রচলিত আছে দীর্ঘদিন থেকে। কবে এই সমস্ত গল্পের উৎপত্তি কেউ বলতে পারে না। এখানে সেই সমস্ত গল্প থেকে দুটো গল্পের উল্লেখ করা হলো।

লোকগল্প-১: ভোম্বলদাস

একদিন এক পাঁঠা দুপুরে ঘাস খাওয়ার জন্য বাড়ির বাইরে গেল। সে পাঁঠা দেখতে যেমন বিরাট, তেমনই তার গায়ের গন্ধ! পাঁঠার গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, এমনই অবস্থা। তো সেই পাঁঠা ছিল খুবই ক্ষুধার্থ আর মাঠ ভরা ছিল লোভনীয় ঘাসের সমারোহ। খেয়েই চলেছে, আর এগিয়ে চলেছে। এগুতে এগুতে সে ঘাসের মধ্যে একখানা তলোয়ার পেলো, তলোয়ারটা কোমরে গুজে সে এগিয়ে চলল বীরদর্পে। কিছু দুর যাবার পরে একগোছা পাট পড়ে থাকতে দেখে সে পাটের গোছাটা তুলে নিল পিঠে। মনে মনে নিজেকে বুঝালো কোনো কিছুই ফেলনা নয়, এটাও হয়ত সময়ে কাজে লাগতে পারে। আরো কিছু দূর এগুবার পরে ঘাসের জঙ্গলে সে একটা মাটির হাড়ি দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হাড়ির মুখ খুলে দেখা গেলো যে তাতে রয়েছে চুন, পানের সাথে খাওয়ার জন্য কেউ বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, পড় গেছে মাঝপথে। পাঁঠা চুনের হাড়িটাকেও তার সাথে নিয়ে নিল।

এদিকে যে বেলা পড়ে এসেছে তার সে খেয়াল নেই। ঘাস খেতে খেতে সে ক্রমেই মাঠের পাশে গভীর বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় সে ঢুকে পড়লো সেই বনের ভিতরে, তবু তার আঁশ মেটেনা ঘাস খেয়ে। যখন হুশ হলো, সে দেখতে পেল যে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, পথ চেনা দায়। বাড়ি ফিরবার জন্য তাড়াহুড়া করতে যেয়ে সে দিশা হারিয়ে ফেলল, যেদিকে যায় সেদিকেই ঘন জঙ্গল, পথ হারিয়ে সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বুঝল যে এইরাতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সে তখন কোনোরকমে রাত কাটাবার জন্য একটা অশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগল। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করতে করতে সে আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এমন সময় সে একটি লার কাছে যেয়ে একটা গুহা দেখে সেটা ভিতরে ঢুকে পড়ল। গুহাটাকে বেশ নিরাপদ মনে হওয়ায় সেখানে রাত কাটাবে বলে শুয়ে পড়ল, আর ভরপেটে ঘুমিয়েও পড়ল নিমেষেই।

www.pathagar.com

গুহাটা আসলে এক বাঘের বাসা। পাঁঠা তো আর তা জানে না। বাঘ গিয়েছিল খাবারের সন্ধানে, খেয়েদেয়ে সে ফিরে এসেছে তার আস্তানায় ঘুমাবার জন্য। বাঘের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, বাসার কাছে এসে সে পাঁঠার গায়ের গন্ধ টের পেল, বুঝতে পারল যে এই গন্ধ তার ঘরে ভেতর থেকেই আসছে। বাঘ হুঙ্কার ছেড়ে উঠল। বাঘের হুঙ্কারে পাঁঠার ঘুম ছুটে গেলো, আর তার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার মত।

গুহার ভেতর থেকে আসা তীব্র ভোঁটকা গন্ধে বাঘের তো সেই প্রথম দিন খাওয়া মায়ের দুধ ও পেট থেকে বাইরে চলে আসার মতো অবস্থা। একেবারে গুহার মুখের কাছে যাবার মতো সাহসও হচ্ছেনা; এত তীব্র যার গায়ের গন্ধ, না জানি, সে কত শক্তিশালী প্রাণী! এদিকে নিজের বাসা বেদখল হয়ে আছে, তাও তো মেনে নেওয়া যায় না, এ যে একেবারে অসহ্য! গুহা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাঘ হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'আমার ঘরে কে রে?'

বাঘের হালুম এতদিন শুনেছে অনেকদূর থেকে, তাতেই বুক কেঁপে উঠতো দুরুদুরু। আর আজ সে নিজেই ঢুকে পড়েছে বাঘের আস্তানায়। নিজের বোকামিতে তার নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে, নিজেকে হাজারোবার গালি দিচ্ছে বোকা পাঁঠা বলে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না, নিজের বোকামিতে নিজের হাত কামড়েও কোনো লাভ হবে না, নিজেকে গালাগালি করে জীবন রক্ষা করা যাবে না। নিজেকে সাহস যোগাল মনে মনে, 'মেঘ দেখে কেউ করি সনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে', 'যে সহে, সে রহে' ইত্যাদি কথা মনে মনে নিজেকে শুনিয়ে পাঁঠা সাহস সঞ্চয় করতে লাগল।

গুহার ভেতর থেকে কেউ কোনো কথা না বলায় বাঘ গেল আরও খেপে। সে আরও জোরে হুঙ্কার ছেড়ে আবারও বলল, 'আমার ঘরে কেরে?' পাঁঠা নিজের স্বরে গম্ভীরতা এনে এবারে জবাব দিল, 'সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। শুনে বাঘের পিলে চমকে উঠল, এই না হলে গায়ে এমন গন্ধ! বাপরে বাপ! এ যে দেখছি দশগণ্ডা, মানে চল্লিশটা বাঘ মেরেছে। আমাকে দিয়ে বুঝি একচল্লিশটা পুরো করবার জন্য আমার ঘরে ঢুকেছে! বাঘ কী আর সেখানে দাঁড়ায়! যে পথে এসেছিল, সে পথে ফিরে যেতে লাগল। যত দূরে যায়, তার ভয় আরো বাড়তে থাকে, এই বুঝি সিংহের মামা ভোম্বল দাস এসে লাফ দিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের পরে! বাঘ দৌড়ানো শুরু করল।

বনের ভিতর সব বাঘের যার যার এলাকা ভাগ করা থাকে। কেউ বড় ধরণের বিপদে না পড়লে নিজের এলাকার বাইরে সচরাচর যায় না। ভোম্বল দাসের ভয়ে বাঘ দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য বাঘের এলাকায় চলে এল। সে এলাকার বাঘ তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তার বাসায় ফিরছিল। পথের মাঝে দুই বাঘের দেখা হয়ে গেল। 'কিরে বাঘ ভাই, অমন পাগলের মত দৌড়াচ্ছিস কেন? ''আর ভাই' হাফাতে হাফাতে সে বললও, 'ভোম্বল দাস'! 'ভোম্বল দাস কীরে? ''সিংহের মামা'। 'সে আবার কী?'' সিংহের মামা ভোম্বল দাস, আমার ঘরে ঢুকেছে, বলে কিনা, সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। নতুন বাঘ তখন পুরাতন বাঘকে বলল, 'চলত দেখি, কেমন ভোম্বল দাস?'

www.pathagar.com

দুই বাঘ ফিরে চলল সে গুহার দিকে। যেতে যেতে সেই অচেনা ভোম্বল দাসের গায়ের গন্ধের তীব্রতা নিয়ে দুজনে আলোচনা করল। ভোম্বল দাসের কণ্ঠস্বরও যে অতিশয় ভয়ঙ্কর তাও জানাতে ভুলল না। দুই বাঘ গুহার কাছে আসার আগেই দূর থেকে গন্ধ নাকে এলো তাদের। আগের চেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুইজনে হুঙ্কার ছাড়ল, 'ঘরের ভেতর কেরে?' পাঁঠা ভয় পেলেও সাহস না হারিয়ে আগের চেয়ে গম্ভীর স্বরে বললও, 'সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। নতুন বাঘ এবার সাহস করে বলল, 'কেমন ভোম্বল দাস, দেখি তোর দাঁত!' পাঁঠা পড়লো বিপদে! হঠাৎ তার কোমরে গোঁজা তলোয়ারের কথা মনে পড়তেই সেটা বের করে দিলগুহার মুখ দিয়ে। তলোয়ারকে দাঁত মনে করে দুই বাঘ খুব ভয় পেল। শুরু করল দৌড়!

দৌড়াতে দৌড়াতে তারা আর একবাঘের এলাকায় ঢুকে পড়লো, দেখাও হয়ে গেল সে বাঘের সাথে। এই বাঘ জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে বাঘ ভাইয়েরা, অমন পাগলের মতো দৌড়চ্ছিস কেন?' 'আর ভাই' হাপাতে হাপাতে তারা বললো, 'ভোম্বল দাস'! 'ভোম্বল দাস কী রে?' 'সিংহের মামা'। 'সে আবার কী?' 'সিংহের মামা ভোম্বল দাস, এই বাঘের ঘরে ঢুকেছে, বলে কী না, সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। নতুন বাঘ তখন পুরাতন বাঘদের বলল, 'চলত দেখি, কেমন ভোম্বল দাস?'

এবারে তিন বাঘ মিলে আবার গেলো সেই গুহার কাছে। তিনজন মিলে জিজ্ঞাসা করল, 'গুহার ভেতর কে রে? 'পাঁঠা কাঁপছে ভয়ে থরথরিয়ে, তবু সে সাহস হারায়নি, আগের মতই জবাব দিল, 'সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। এবারের নতুন বাঘ বললো, 'কেমন ভোম্বল দাস, দেখি তোর দাড়ি!' এবারে পাঁঠা মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে পথে কুড়িয়ে পাওয়া পাটের গোছা ছুড়ে দিল গুহার বাইরে। পচা পাটের গন্ধের সাথে পাঁঠার গায়ের গন্ধ মিলে বিকট গন্ধের দাড়ি দেখে আর কী সেখানে দাঁড়ায় তিনবাঘ? দৌড়, দৌড়, দৌড়!!!

দৌড়াতে দৌড়াতে তারা পৌঁছে গেল চার নম্বর বাঘের এলাকায়। সে এলাকার বাঘের সাথে দেখা হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে বাঘ ভাইয়েরা, অমন পাগলের মত দৌড়াচ্ছিস কেন?' 'আর ভাই' হাফাতে হাফাতে তারা জানাল, 'ভোম্বল দাস'! 'ভোম্বল দাস কী রে?' 'সিংহের মামা'। 'সে আবার কী?' 'সিংহের মামা ভোম্বল দাস, এই বাঘের ঘরে ঢুকেছে, বলে কিনা, সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। নতুন বাঘ তখন পুরাতন বাঘদের বলল, 'চলত দেখি, কেমন ভোম্বল দাস?'

এবারে চার বাঘ মিলে আবার গেল সেই গুহার কাছে। চারজন মিলে জিজ্ঞাসা করল, 'গুহার ভেতর কে রে?' পাঁঠার জান কী আর তখন তার ধড়ে আছে? তবু সে বিরক্ত ভরা কণ্ঠে সেই আগের মতই বললও, 'সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। চার নম্বর বাঘ বলল, 'ভোম্বল দাস? সে আবার কী জিনিষ? আচ্ছা, দেখি তোর থুথু কেমন?' বলতে না বলতেই পাঁঠা হাড়ি থেকে একগাদা চুন বের করে দিল বাইরে ছুড়ে। চুন এসে কিছু পড়লো বাঘদের সামনে মাটিতে, আর কিছু চুন ছুটে যেয়ে পড়ল তাদের চোখে-মুখে। চোখে চুন ঢুকতেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো তারা, আর বুঝল যে এই ভোম্বল দাসের হাতেই তাদের জীবন শেষ হতে চলেছে। চার বাঘ

www.pathagar.com

লেজ পিঠে তুলে দৌড় আর দৌড়, কে কাকে ফেলে আগে যেতে পারে! 'চাচা, আপন জান বাঁচা' অবস্থায় তারা যেয়ে পৌঁছাল পাঁচ নম্বর বাঘের এলাকায়।

পাঁচ নম্বর বাঘ সে এলাকার সবচাইতে বয়স্ক বাঘ, সব বাঘের নেতা। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিরে তোরা এমন পাগলের মত দৌড়চ্ছিস কেন?' 'আর গুরু' হাফাতে হাফাতে তারা জানালো, 'ভোম্বল দাস'! 'ভোম্বল দাস কীরে?' 'সিংহের মামা'। 'সে আবার কী?' 'সিংহের মামা ভোম্বল দাস, এই বাঘের ঘরে ঢুকেছে, বলে কিনা, সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস, বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ'। নতুন বাঘ তখন পুরাতন বাঘদের বলল, 'চল তো দেখি, কেমন ভোম্বল দাস?'

তারা প্রথম বাঘের গুহার কাছে যখন এসে পৌঁছাল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পাঁঠা গুহা থেকে বের হয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকের ও না হয়ে গেছে। পাঁচ বাঘ এসে বোটকা গন্ধ পেল, আগের মতই গুহা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'গুহার ভেতর কেরে?' পাঁঠাতো আগেই পগার পার! কে দেবে জবাব? বার বার জিজ্ঞাসা করেও কারো কোনো রকম সাড়া না পেয়ে তারা গুহার ভিতরে ঢুকবার প্রস্তুতি নিল। পাঁচ নম্বর বাঘের পিছু পিছু তারা ভয়ে ভয়ে না ককুঁচকে গুহার ভিতরে ঢুকলো। বোটকা গন্ধে তাদের বমি আসছিল, তবু তাদের নেতার পিছন থেকে তো আর তারা সরে যেতে পারে না!

একটু এগিয়ে যেয়ে তারা বাদাম দানার মতো পাঁঠার নাদি আর ঘন হলুদ চেনা দেখে সেটা যে ছাগল জাতীয় কোনো প্রাণী ছিল তা সহজেই বুঝতে পারল। নেতা বাঘ অন্য বাঘদের ভীরুতার জন্য অনেক ভর্ৎসনা করতে করতে গুহা থেকে বের হয়ে নিজের এলাকার দিকে রওনা হয়ে গেল। আর চার বাঘ লজ্জায় তখন একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে পারছিল না। মুখ নিচু করে তারাও ধীরে ধীরে যার যার বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু এক নম্বর বাঘ অপেক্ষা করতে লাগল, কবে বৃষ্টি হয়ে তার গুহার গন্ধ দূর হবে সে আশায়। আপাতত নতুন একটা আস্তানার খোঁজে সেও হাঁটা শুরু করল।

লোকগল্প-২: বেজি ও শিয়াল

গাঁয়ের পাশে বিরাট এক বন। সেই বনে থাকত এক শিয়াল, আর বনের মাঝে গর্তে বাস করত এক বেজি। শিয়াল আর বেজির খুব বন্ধুত্ব, কাউকে একদিন না দেখলে আর একজনের মন হয় উতলা। একদিন শিয়াল বেজিকে বলল, বন্ধু, চল আমরা বিদেশে যাই। বেজি সানন্দে রাজি হলো। শুভ দিনক্ষণ দেখে দুই বন্ধু একদিন বেরিয়ে পড়ল অজানা অচেনা দেশ দেখতে। দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল, কিন্তু চলার পথে কোনো খাবার জোগাড় করতে পারল না। এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হতে চলেছে, দুই বন্ধুর পেটে কোনো খাবার নেই। পানি পিপাসায় দুজনেই কাতর হয়ে উঠেছে।

এমন সময় তারা এসে পৌঁছাল এক নদীর কাছে। কী সুন্দর টলটলে সে নদীর পানি, দুই বন্ধু লাফ দিয়ে নদীতে নেমে চোঁ চোঁ করে পেট ভরে পানি খেল, ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে সারা গা ভালো করে ডলে গোসল করল। পানি থেকে উঠতেই ইচ্ছা

www.pathagar.com

করছিল না তাদের। কিন্তু পেটে কোন খাবার নেই কারো, শুধু পানি খেয়ে কী আর থাকা যায়? খিদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা নদী থেকে ডাঙায় উঠল। একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া কুল গাছের দিকে চোখ পড়ল তাদের। দৌড়ে গেল তারা সেই কুল গাছের কাছে, বেজি লাফ দিয়ে গাছে উঠে গপাগপ করে পাকা পাকা কুল খেতে শুরু করে দিল।

শিয়াল তো আর গাছে উঠতে পারেনা, সে নিচে দাঁড়িয়ে বেজির কুল খাওয়া দেখতে লাগল। তার মনের আশা বন্ধু তাকে অবশ্যই কুল দেবে, কিন্তু তার আশা পূরণ হয় না। বেজি শিয়ালকে একটা কুলও দিল না, একা একা কুল খেয়ে পেট ভরাতে লাগল। শিয়াল তখন নিচ থেকে বলল, বন্ধু, একা খেয়ো না, আমাকে দুএকটা কুল দাও। বন্ধু, ও বন্ধু, দোস্ত আমার, একটা কুল দাও না ভাই। বারবার এমন করে কাকুতি মিনতি করায় বেজি একটা কুল ফেলল নিচে, শিয়াল খপ করে ধরেই হপ করে মুখে দিল। পর মুহূর্তেই থু থু করে ফেলে দিয়ে বলল, দোস্ত, একটা কুল দিলে, তা আবার পোকা ধরা, খেতেই পারলাম না। দোস্ত, বন্ধু আমার, আর একটা কুল দে। অনেক বার বলার পরে বেজি গাছের উপর থেকে একটা কুল ছুড়ে দিল, গাছের নিচে ছিল গোবর, কুল যেয়ে থপ করে পড়ল সেই গোবরের উপরে। শিয়াল এই কুলটাও খেতে পারল না। খিদেয় শিয়ালের অবস্থা কাহিল, ওদিকে বেজি পেট ভরে কুল খেয়েই যাচ্ছে। শিয়াল আবারও কাকুতি মিনতি করতে লাগল। শেষে বেজি আরও একটা কুল ছুড়ে দিল তার দিকে, সেটা ঢালু জায়গায় পড়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল একেবারে নদীতে। নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে গেল সে কুলটা। আবারও কুল চাইবার জন্য উপরে তাকিয়ে শিয়াল দেখতে পেল বেজি একটা মোটা ডালে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। শিয়ালের আর কুল খাওয়া হলো না।

কুল গাছের নিচে বসে থাকল শিয়াল। একটু পরে হঠাৎ করে বেশ জোরে এল বাতাসের ঝাপটা, কুল গাছের ডালে লাগল জোর ঝাঁকুনি, আর সেই ঝাঁকুনিতে বেজি নিচে পড়ল ধপাস করে। আর শিয়াল করল কী, দৌড়ে যেয়ে আস্ত বেজিটাকে খপ করে গিলে খেয়ে ফেলল। বন্ধুকে খেয়ে খিদে কমল শিয়ালের, কিন্তু তার মন খুব খারাপ হলো। সে মন ভার করে একা একা হাঁটতে শুরু করল। কিছু দূর যাবার পর রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট মেয়েকে শাক তুলতে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। মেয়েটা শিয়ালকে দেখে ভয় পেলো না, শিয়ালের মোটা পেট দেখে সে খুব বিস্মিত হলো আর বলল, ওরে বাবা, শিয়ালটার পেট কী মোটারে! শিয়াল এ কথা শুনে চটে উঠে বলল, পেট মোটা পেট মোটা বলিস না, আমি বন্ধুকে খেয়েছি, পেট মোটা বললে তোকেও খেয়ে ফেলব। মেয়েটা তখন বলল, ইস বললেই হলো, খেয়ে ফেলবে, খা তো দেখি, পেট মোটা শিয়াল। অমনি শিয়ালটা ছুটে যেয়ে খপ করে ধরে মেয়েটাকে আস্ত গিলে ফেলল।

শাক তোলা মেয়েটাকে খেয়ে শিয়ালের মন বেশ খারাপ। সে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেটে যাওয়া শুরু করল। বেশ কিছু দূর যাবার পরে দেখা হলো এক ঘুঁটে কুড়ানী বুড়ির সাথে। শিয়ালকে দেখে বুড়ি বলল, আররে, শিয়ালটার পেট এত মোটা! শিয়াল বললো, পেট মোটা পেট মোটা করিস না, আমি বন্ধুকে খেয়েছি, একটা শাক তোলা

www.pathagar.com

ছুড়িকে খেয়েছি; পেট মোটা বললে তোকেও খেয়ে ফেলব। বুড়ি বলল, ইস বললেই হলো, খেয়ে ফেলবে, খা তো দেখি, পেট মোটা, পেট মোটা শিয়াল। অমনি শিয়ালটা ছুটে যেয়ে খপ করে ধরে বুড়িটাকেও আস্ত গিলে ফেললো।

বুড়িকে খেয়ে শিয়াল আবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখা হলো বর-বউয়ের ছয় বেহারার একটা পালকী আর বরযাত্রীদের সাথে। তারা শিয়ালকে দেখে বললো, দেখ দেখ শিয়ালটার পেট কেমন মোটা! শিয়াল এই কথা শুনে বলে উঠল, পেট মোটা পেট মোটা বলিস না, আমি বন্ধুকে খেয়েছি, একটা শাক তোলা ছুড়িকে খেয়েছি, এক ঘুঁটে কুড়ানো বুড়িকে খেয়েছি; পেট মোটা পেট মোটা বললে তোদেরকেও খেয়ে ফেলব। বেহারা ও বরযাত্রীরা সবাই বলল, ইস বললেই হলো, খেয়ে ফেলবে, খা তো দেখি, পেট মোটা শিয়াল। অমনি শিয়ালটা ছুটে যেয়ে খপ খপ করে তাদের সবাইকে পালকী সমেত গিলে ফেলল।

শিয়াল আবারও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুদূর যেয়ে দেখতে পেল একটা নাদুসনুদুস ছাগল নিজের মনে রাস্তার পাশের তাজা ঘাস খাচ্ছে। তার কাছাকাছি হতেই ছাগলটা শিয়ালকে দেখে বলে উঠল, ও মাগো, শিয়ালটার পেট কী মোটা গো! শিয়াল এই কথা শুনে বলল, পেট মোটা পেট মোটা বলিস না, আমি বন্ধুকে খেয়েছি, একটা শাক তোলা ছুড়িকে খেয়েছি, এক ঘুঁটে কুড়ানো বুড়িকে খেয়েছি, বরযাত্রী বর-বউ বেহারা সমেত পালকী সব খেয়েছি; পেট মোটা পেট মোটা বললে তোকেও খেয়ে ফেলব। ছাগল এই কথা শুনে বলল, শিয়াল ভাই, বাড়িতে আমার দুটো ছোট বাচ্চা আছে, তাদের দুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকো, আমি বাড়ি যেয়ে বাচ্চা দুটোকে দুধ খাইয়ে আসি, তারপর আমাকে খেয়ো। শিয়াল তার এই কথায় রাজি হলো। ছাগল গেল তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে।

বাড়িতে যেয়ে ছাগল তার বাচ্চাদের অনেক আদর করল, পেট ভরে দুধ খাওয়াল। তারপর তাদের বলল, সোনামনিরা, তোমরা সাবধানে থেকো, তোমরা এখন কিছুটা বড় হয়েছো, নিজেরা ঘাস খাওয়া শিখেছো। আমি যদি আর ফিরে না আসি মন খারাপ করো না। এরপর সে বাচ্চাদের সব কথা খুলে বলল, আর বলল সে কী করতে যাচ্ছে। বাচ্চারা খুব মন খারাপ করে তার মাকে বিদায় দিল।

বাড়ি থেকে বের হয়ে ছাগল গেল তাদের গ্রামের এক কামারের বাড়িতে। কামার ভাই, কামার ভাই, বাড়িতে আছো? কামার বাইরে এলে তাকে বলল, কামার ভাই, আমার শিং দুটো ভালো করে ধারালো করে দাও। কেন ধারালো করতে চায় সে কথা জানতে চাইলে ছাগল বলল যে ফিরে এসে সব কথা জানাবে। শিং ধারালো করে নিয়ে ছাগল গেল কলু বাড়ি। সেখানে যেয়ে কলুকে ডাকল, কলু ভাই কলু ভাই, বাড়িতে আছো? কলু বাইরে এলে তাকে বলল, কলু ভাই আমার শিংয়ে ভালো করে সরষের তেল মাখিয়ে দাও। কেন তেল দিতে চায় তা জানতে চাইলে ছাগল বলল যে ফিরে এসে সব কথা জানাবে। এরপর সেখান থেকে ছাগল গেল শিয়ালের কাছে।

সারা দিনের পথ চলার ক্লান্তি, তার উপরে বন্ধু বেজি, শাক তোলা মেয়ে, ঘুঁটে কুড়ানো বুড়ি, পালকী বেহারা বর বউ বরযাত্রীদের খেয়ে ভরপেটে শিয়াল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছাগল এসে তাকে ডাক দিলে আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জেগে ঘুম ঘুম

www.pathagar.com

চোখে সে ছাগলের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে তার সব কথা মনে পড়ল, সে তখন ছাগলকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। তখন ছাগল বলল, শিয়াল ভাই, আমাকে তো খেয়েই ফেলবে, তো মরার আগে আমার একটা শেষ ইচ্ছা আছে। শিয়াল জানতে চাইল, কী ইচ্ছা। ছাগল বলল, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, ঠিক তোমার পেটের নিচ বরাবর যে কচি ঘাস সেগুলো খাওয়ার আমার খুব ইচ্ছে করছে। শিয়াল ভাবল, এ আর এমন কী? ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

ছাগল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল শিয়ালের দিকে, মুখ বাড়িয়ে শিয়ালের পেটের নিচের ঘাস খেতে শুরু করল। মাথাটা যখন শিয়ালের ঠিক পেটের নিচে গেল, তখনই ছাগল তার ধারাল তেলমাখা শিং দিয়ে শিয়ালের পেটে খুব জোরে দিল এক ধাক্কা। এক ধাক্কাতেই শিয়ালের পেট ফুটো হয়ে গেল, আর শিয়াল পেল অক্কা। পেট থেকে বের হয়ে এল বরযাত্রী বর বউ পালকি বেহারা, ঘুঁটে কুড়ানো বুড়ি, শাক তোলা মেয়ে, আর বন্ধু বেজি। তারা সবাই যে যার পথে চলে গেলো, ছাগল গেল তার বাচ্চাদের কাছে। আর শিয়ালটা সেখানেই মরে পড়ে থাকল।

ব্যাধ আর তার বউয়ের পাখি ধরার গল্প

এক যে ছিল ব্যাধ আর তার বউ। ব্যাধ সকাল হলেই তারা দুজনে মিলে সাত-নলা-কাঠি, জাল আর পাখি রাখার খাঁচা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বনে-জঙ্গলে। সারা দিন বনে বনে ঘুরে কপাল ভাল হলে কোন দিন পাখি জোটে, না হলে খালি হাতেই ঘরে ফিরতে হয়। খালি হাতে ঘরে ফিরতে স্বামী আর বউয়ের দুজনেরই বেজার মুখ। ব্যাধও চোখে আঁধার দেখে। মুখে খাবার জুটবে কি করে আর চলবেই বা কি করে। একদিন বউ বললো, শোন, আমরা গরিব কেন তা জানো ? যে পাখিটাই তুমি ধরো, তা বাজারে বেচে দাও। শোন, আমরা যদি কয়েকটা পাখি রান্না করে খাই, তা হলে আমাদের কপাল ফিরলেও ফিরতে পারে। লোকে তো তাই বলা-কওয়া করে। হাভাতে, পাখি ধরে ধরে সব বেচে দেয়। পাখির শাপে ওদের কপালের দুঃখ আর ঘোচে না।

বউয়ের কথায় সেদিন ব্যাধ রাজি হল। সাত-নলা-কাঠি, জাল আর পাখি রাখার খাঁচা নিয়ে ব্যাধ বেরিয়ে পড়ল দুজনে পাখি ধরতে।

খ. কিংবদন্তি

আনার শাহের দরগা

দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধ পাতিলা গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বট পাকুড় শিমুল আম জাম আরও পাঁচমিশালি প্রায় ১৫/১৬ রকমের গাছপালায় ঘেরা তিন বিঘার মত জমির উপর বাগানের একপাশে কয়েক শ বছরের পুরনো এক ছোট্ট মাজার। প্রথম দর্শনে সাধু-সন্তের মাজার বলেই মনে হয়। দুধপাতিলা গ্রামের মানুষ বহুপুরুষ ধরে শুনে আসছে মাজারটি আনার শাহের। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখে মাজারকে ঘিরে সাধু-সজ্ঞ বসে। দূর-দূরান্ত থেকে সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার নানা আশা-ভরসা নিয়ে মানুষ এখানে এসে প্রতি বৃহস্পতিবারে মানত করে। মাজার প্রাঙ্গনের পাকুড় গাছে নিয়ত করে পাথরের টুকরো বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। এক সময় আশা পূরণ হলে বেঁধে রেখে যাওয়া পাথর খুলে দেয়। সেই সাথে মনোষ্কামনা পূরণ হওয়ায় সিন্নি দেয় বৃহস্পতিবারে।

www.pathagar.com

আনার শাহের মাজার

আনার শাহের দরগার পাকুড় গাছ

আনার শাহের দরগার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রায় মুছে যাওয়া কালের সাক্ষী চিত্রা নদীর চিহ্ন। ইতিহাসের এই সেই চিত্রা-নির্জন মাঠের মাঝখানে মরা নদীর রেখা ধরে হারিয়ে গেছে প্রায়। ভাবতে অবাক লাগে কবে কোন যুগে এই নির্জন সাধক আনার শাহ কত শত জনপদ ঘুরে-ফিরে শেষে এখানেই আশ্রয় নিলেন। খুঁজে পেলেন তাঁর পরম শান্তির আশ্রয়। শেষ পর্যন্ত এই ঘাসের বিছানাতেই পেতে নিলেন তাঁর শেষ-শয্যাটুকু। নির্জন চুপচাপ, কোনই কোলাহল নেই। সন্ধ্যাবেলায় কিছু আশ্রয়-সন্ধানী পাখির ঠাঁই হয় এই আস্তনার গাছপালার ডালে রাত কাটানোর। কখনো-সখনো গভীর নিশুত রাতের বুক চিরে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় রাতপাখি। আর মাঝে মাঝে শোনা যায় মরা চিত্রার রেল-সাঁকোর ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলা রেলগাড়ির গুম-গুম করা আওয়াজ। এখান থেকে নিরিখ করলে সাঁকোটা নজরে আসে বটে। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

নানান মনোস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্যে
পাকুড় গাছের শেকড়ে বাঁধা পাথরের টুকরো

www.pathagar.com

ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে গা ছমছম করা মাঠ আর মাঠ। পুবে অদূরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে রেল-লাইন দুধ-পাতিলা গ্রামকে সোজাসুজি দুই ভাগ করে। ফলে জন্ম হলো ছোট দুধ-পাতিলা আর বড় দুধ-পাতিলা গ্রামের। পশ্চিমে চারাতলার বিশাল মাঠ পেরিয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম লোকনাথপুর। উত্তরে নাগরাগাড়িসহ অনেকগুলো মাঠ পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ২ কিলোমিটার দূরে ডুগডুগির হাট আর উত্তরে আরও আড়াই/তিন কিলোমিটার মাঠ পেরিয়ে উত্তরে জয়রামপুর গ্রাম, মানে সেকালের বড় গাঁ জয়রামপুর। রেলস্টেশনও আছে। দক্ষিণে আজমপুর আর দর্শনা–সেও অন্তত আড়াই/তিন কিলোমিটার গেলে তবে নাগাল পাওয়া যাবে।

ইতিহাসের চিত্রা নদীর উৎপত্তি রুদ্রনগর আর গোবিন্দপুরের মাথাভাঙ্গার মরা সোঁতা থেকে। তখন অবশ্যি মরা ছিল না। দামুড়হুদার হাউলি আর দামুড়হুদা মৌজার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া এই মরাগাঙই ছিল মাথাভাঙার মূলস্রোতধারা। নদীর উৎসমুখ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হাউলি আর দামুড়হুদার বাঁকের মুখে পলি জমে জমে মাথাভাঙ্গা নদীর তখন করুণ দশা । ১৮৯৮ সালে বাঁক বদলে দামুড়হুদা থেকে সোজা সুবলপুর-গোবিন্দপুরের দিকে মাথাভাঙ্গা চলে গেছে খাত বদল করে। পড়ে রইল মরাগাঙ আর মরা চিত্রা।

১৮৪০/৫০ সালের দিকেও চিত্রা ছিল বহতা নদী। তারপর কালে কালে চাপা পড়ে মুছে যেত থাকল চিত্রা নদীর প্রবহমানতার ইতিহাস। চিত্রা নদীর মতো আনার শাহের ইতিহাসও মানুষ ভুলে গেছে। শোনা যায় সাধক আনার শাহ এককালে ছিলেন বিপুল ধনাঢ্য সওদাগর। এই চিত্রা নদীতেই ভাসত তাঁর বাণিজ্য-তরী। হঠাৎ করে এক সময়ে তিনি বিষয়-সম্পদের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বরণ করে নেন সাধকের জীবন। দুধপাতিলা গ্রামে এক সময়ে হিন্দু ঘোষ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। দুধের বড় বড় পাতিলের জন্য গ্রামের নাম দুধপাতিলা। এখনও প্রায় ১৫০ হিন্দু আছে। তবে এদের পেশা মাছধরা। এখন নিরূপায় হয়ে পেশা বদল করেছে এরাও। তা ছাড়া এখানে এখনও অনেক স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু পরিবার বসবাস করে, যাদের জমিজমা আছে, পেশা চাষাবাদ।

তথ্যদাতা : মোঃ শহিদুল ইসলাম, গ্রাম : ছোট দুধপাতিলা, মেম্বার, হাউলি ইউনিয়ন, দামুড়হুদা উপজেলা। সংগ্রহের তারিখ : ১২/৬/২০১৪

পীর কেনায়েত আলী (র.): চুয়াডাঙ্গার মাঝেরপাড়া নিবাসী পীর কেনায়েত আলী (র.) সম্পর্কে না অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। তাঁর বাবা হেদায়েতুল্লাহ বিশ্বাস, মা ইমছান বিবি। তরীকা অনুযায়ী তিনি ৩৯তম পীর ছিলেন। তিনি বাল্যকালে গরু চরাতেন, শেষ জীবনে সবজি বিক্রি করতেন। শোনা যায়, একদিন তাঁর হাতে একটি বিষধর কুলীন সাপ কামড় দেয়। তিনি কোনো ওঝা বা ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে শুধু মুখের থুথু দিয়ে সেই বিষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে হাতের কয়েক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে সেই বিষ কালো নীলচে আকার ধারণ করে।

আরেকদিন তিনি সবজির দোকানে গিয়ে বসেছেন, এমন সময় বুকে হামাগুড়ি দিতে দিতে এক জন্মখোঁড়া কিশোর তাঁর সামনে এসে হাত পাতে। তিনি রাগান্বিত কণ্ঠে নির্দেশ দেন এই ওঠ, খাড়া হ, দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে যা। আজব ব্যাপার, জন্মখোঁড়া উঠে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

হেঁটে চলে গেল। এছাড়া প্রায়ই তিনি জিকির করতে করতে মাটি থেকে ৬/৭ ফুট ওপরে শূন্যে উঠে যেতেন বলে শোনা যায়। বাংলা ১৩৮১ সালের ২ পৌষ তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত রেজা শাহ্ চিশতী: চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রথম দিকে যাঁরা ইসলাম প্রচার করতে আসেন, হযরত রেজা শাহ্ চিশতী তাঁদের অন্যতম। চিশতীয়া তরীকাপন্থী হযরত রেজা শাহ্ দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে আস্তানা গড়েন। তিনি হযরত খাজা ময়েনউদ্দীন চিশতী (র.)-এর সাক্ষাৎ মুরীদ ছিলেন এবং পীরের হুকুমেই ইসলাম প্রচার করতে কোষাঘাটা আসেন। শোনা যায়, প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁর কাছে দুটি বাঘ আসত এবং তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে নদীর পানির ওপর হেঁটে বেড়াতেন। তিনি বহু প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। কোষাঘাটা গ্রামে হযরত রেজা শাহ্ চিশতীর মাজার আছে।

হযরত শাহ্ একদীল: হযরত শাহ্ একদীলের পরিচয় রহস্যাবৃত। তাঁর সম্পর্কে নানা পরিচয় পাওয়া যায়। চুয়াডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে হযরত শাহ্ একদীলের মাজার আছে। শোনা যায়, এই জায়গায় একটি ধর্ম সভা চলাকালে হযরত শাহ্ একদীল কবর কাটতে বলেন এবং জীবিত অবস্থায় কবরে ঢোকেন। তাঁর নির্দেশে কবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু সপ্তাহান্তে কবরটি ভাঙা দেখা যায় এবং লাশও পাওয়া যায় না। এরপর এখানে মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গা ছাড়াও কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি ও ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

একদীল শাহের মাজার

মূর্তজাপুরের পাঁচপীর-তলা: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সিন্দুরিয়া ও মুর্তজাপুর গ্রামের মাঝামাঝি পাঁচপীর-তলা আছে। এখানে হযরত ওলী দেওয়ান শাহ্, হযরত কুতুব উদ্দিন শাহ্, হযরত নেয়ামত শাহ্, মুর্তজা শাহ্ প্রমুখের মাজার আছে। পাঁচপীর-তলা সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

কথিত আছে, সিন্দুরিয়া নীলকুঠির প্রথম মালিখ জেমস আইভান মে ১৭৯৩ সালে তার ম্যানেজার সি. ডাব্লিউ শেরিফ, সহকারি ম্যানেজার আপন ভাইয়ের ছেলে টমাস আইজাক মে, প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রী ও মজুরদের সঙ্গে করে কুঠি তৈরির জন্যে পাঁচপীর-তলায় আসেন। কিন্তু কুঠি তৈরির জন্যে যে জায়গা নির্বাচন করেন, গ্রামবাসীরা তাতে বাধা দেয়। তারা নানা অলৌকিক কাহিনী শোনালে কাঠুরিয়া কালীচরণ সর্দার বেঁকে বসে। সে সাহেবের নির্দেশ মতো একটা উঁচু ঢিবির কাছাকাছি শেওড়া গাছে কোপ দিতে অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সাহেবের আদেশ অমান্য হতে দেখে যুবক আইজাক নিজেই কুঠার হাতে নিয়ে শেওড়া গাছের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ঘটনা! উত্তেজনা কেটে যেতে না যেতেই দেখা গেল, আইজাকের প্রচণ্ড কুঠারাঘাত শেওড়া গাছে না লেগে তার বাম তলপেটে ভেদ করে গেছে। সঙ্গে কুঠিয়াল জেমস আহত আইজাককে নৌকায় তুলে কলকাতা রওনা হন। পথে আইজাকের মৃত্যু হয়। জেমস আইভান কুঠি তৈরির স্বপ্ন বাদ দিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

এ ঘটনার তিন বছর পর জন রিভস কুঠি তৈরির জন্যে এখানে আসেন। এবার সেই উঁচু ঢিবি আর শেওড়া গাছ বাইরে রেখে দালানের ভিত্তি গড়া হয়। কিন্তু শুরু হয় নতুন উৎপাত। সারাদিন যতটুকু দালান গাঁথা হতো, রাতের বেলা কে বা কারা তা পাশের নবগঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করত। পাহারা দিয়েও ব্যাপারটা রোধ করা যায় না। পরে বাধ্য হয়ে অর্ধনির্মিত কুঠি ত্যাগ করে অন্যত্র নতুন কুঠি তৈরি করা হয়।

পরেশ বাবার মাজার: জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া গ্রামে মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে খোদা ফারাস নামক একজন সূফী সাধক ইসলাম প্রচারের জন্যে আস্তানা গড়েন। তাঁর আসল নাম পীর আশরাফ আলী শাহ্। 'খোদা ফারাস' উপাধি বিশেষ। ফারসি 'ফারাস' শব্দের অর্থ ঘোড়া। সম্ভবত ঘোড়ায় চড়ে তিনি এখানে আসেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। তাই তাঁর নামে 'খোদা ফারাস' যোগ হয়েছে।

তিনি অমুসলমান জমিদার ও জোতদারদের যৌথ বিরোধীতার মুখেও ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন। জমিদার তাঁকে আন্দুলবাড়িয়া ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু খোদা ফারাস তা অমান্য করলে জমিদার তাঁকে হত্যার জন্য লোক পাঠায়। তারা খোদা ফারাসের ওপর ইট নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি অভিশাপ দেন, যে আন্দুলবাড়িয়ায় বাসগৃহের জন্যে ইট পোড়াবে, সে সবংশে নিধন হবে। সেই থেকে বহুদিন এখানে কেউ পাকা বাড়ি তৈরি করেননি।

খোদা ফারাসে কবর ইটে গাঁথা। হযরত খোদা ফারাসের মাজার এলাকাবাসীর কাছে 'পরেশ বাবার' মাজার বলে পরিচিত। তিনি কোনো রোগীকে ছুঁয়ে দিলে তার রোগ ভালো হয়ে যেত। তাঁর মাজারে ভক্তরা মাটির ঘোড়া মানত করেন, শিরনি দেন।

গোকুলখালির দরগা: আলমডাঙ্গা সদর উপজেলার গোকুলখালি বাজারের দক্ষিণে পাকা রাস্তার পাশেই একটি দরগা আছে। লোকে বলে পীর শাফালার দরগা। জানা যায়, দুশো বছর বা তারও আগে শাহ্ বহলুল নামে একজন কামেল পীর এখানে বট আর পাকুড় গাছের নিচে এসে আস্তানা গড়েন। তাঁর সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তাঁর কাছে নিবেদন জানিয়ে এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেছিলেন। আরেক দরিদ্র লোক সাত ঘড়া মোহর পেয়েছিলেন।

শাহ্ বহলুল একদিন স্থানীয় ঘোষদের একটা গাভী দিয়ে বলেন, 'গাভীটা নিয়ে যা, কিন্তু এর দুধ দুয়ে নিসনে। আর প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এখানে রেখে যাবি।' ঘোষরা গাভীটি নিয়ে যায় আর প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ফকিরের আস্তানায় রেখে আসে। দিন যায়, ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে ওঠে। কিন্তু ঘোষদের কৌতূহল হলো, বৃহস্পতিবার রাতে ফকির গাভী দিয়ে কী করে, দেখা দরকার।

www.pathagar.com

একদিন তারা গোপনে লুকিয়ে থাকল। গভীর রাতে দেখল, নদী থেকে একটি সোনার ষাঁড় উঠে এল। শুরু হলো গাভী আর ষাঁড়ের যুদ্ধ। হঠাৎ সোনার ষাড়ের শিং কিছুটা ভেঙে পড়ে। তারপর সেটি নদীতে তলিয়ে গেল। ঘোষরাও ভাঙা সোনার শিং-এর টুকরা চুরি করে পালিয়ে গেল। প্রতি বৃহস্পতিবারেই একই ঘটনা ঘটতে লাগল। ঘোষদের লোভ আরো গেল বেড়ে- তারা গাভীর দুধও চুরি করতে লাগল। ফলে এক যুদ্ধে গাভীটা মারা গেল। ফকির অভিশাপ দিলেন ঘোষদের। ভিটে মাটি সব উচ্ছন্নে গেল তাদের।

এ ঘটনার কিছুদিন পর এক ভোরে দেখা গেল নদীর তীরে পীরের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে। এলাকাবাসী তাঁকে কবর দিয়ে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে কয়েকজন সেখানে পৌঁছে জানালেন– 'পির সাহেবকে চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীর ঘাট পার হতে দেখে এলাম। আমরা সালাম দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন।'

এরপরেও আরও কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। শাফালার দরগার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানত না করলে নৌকা এগুতো না। চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর সড়কে চলাচলকারী গাড়ির চালকরা শাফালার দরগাকে উদ্দেশ্য করে সালাম না দিলে গাড়ি বিগড়ে যেত, চলত না। এখনো প্রবীণ চালকেরা শাফালার দরগাকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেন।

গড়াইটুপির মাজার: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইপুপি গ্রামে বটগাছের নিচে একটি মাজার আছে। জায়গাটি মোকামতলা নামে পরিচিত। শোনা যায়, বহু বছর আগে পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠবিহার গ্রামের এক মহিলার গায়ে প্রতি বৃহস্পতিবার 'জ্বিন লাগত'। জ্বিন নাকি বলত আমি পীর, মানুষের খেদমত করাই আমার ধর্ম। ক্রমে এ কথা রটে গেলে প্রতি বৃহস্পতিবারে ওই মহিলার বাড়িতে ভিড় জমত। একদিন হঠাৎ দেখা গেল ওই মহিলা গড়াইটুপি গ্রামের মাঠে বটগাছের নিচে শুয়ে আছেন। এরপর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবারে এ বটগাছের নিচে মহিলাকে 'জ্বিন ধরত'।

এর কিছুদিন পর এক জটধারী সংসারত্যাগী ফকির এসে জোটেন। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)-র শিষ্য মালেকুল গাউস। ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী ফকির বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বন্ধ হয়ে যায় তাঁর 'জ্বিন লাগা'। কিন্তু ফকির বাবার খেদমতে প্রতিদিনই গ্রামবাসীরা সেখানে হাজির হতেন। এখন শুধু মাজারটা রয়েছে।

গড়াইটুপির মাজার

www.pathagar.com

প্রতি বছর ৭ আষাঢ় থেকে ১৩ আষাঢ় পর্যন্ত এখানে মেলা বসে। কিংবদন্তী আছে, এই মাজারে মানত করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো, অসুস্থ মানুষের রোগ ভাল হয়ে যেত, নিঃসন্তান দম্পত্তি সন্তান লাভ করত, আবার অনাবৃষ্টির সময় শিরনি দিলে বৃষ্টি হতো।

গলায় দড়ির ঘাট

সোনাতনপুর মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের রাজপুত বংশীয় সাত ভাই মহাদেব ও রঘুনাথদেবের সেবায়েত হিসেবে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ও দেবালয়ের বিগ্রহ দুটির অধিকারী হন। বংশ লোপ পেতে শুরু করলে সাত ভাইয়ের ছোটভাই রুদ্ররায় মহাদেব ও রঘুনাথদেব বিগ্রহ দুটি বিসর্জনের জন্য লোকনাথপুরের কাছে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আলমডাঙ্গা অঞ্চলের জমিদার বিজয়কৃষ্ণ দোবে এ সময় মাথাভাঙ্গা নদীপথে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলেন। মহাদেব ও রঘুনাথদেবের বিগ্রহ দুটি বিসর্জনের খবর শুনে রুদ্র রায়ের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেন এবং সোনাতনপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহ দুটি উক্ত মন্দিরে স্থাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ দোবে এ সময় লোকনাথপুর মন্দিরের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তিরও অধিকারী হন। ওদিকে ক্ষোভে-দুঃখে রুদ্র রায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মাথানদীর যে জায়গায় রুদ্র রায় আত্মহত্যা করেন সে জায়গাটির নাম এখনও 'গলায় দড়ির ঘাট' নামে পরিচিত। রুদ্ররায়ের নামে পাশেই রুদ্রনগর নামে একটি গ্রামও বর্তমান আছে।

তথ্যসূত্র : মুরশিদ আলম [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম-মদনা, উপজেলা-দামুড়হুদা

সরিষাডাঙ্গার মাজারঃ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে একজন পীরের মাজার আছে। তাঁর নাম বিশু শাহ্। মোগল শাসনামলে তিনি এ গ্রামে এসে আস্তানা গড়েন। একবার তিনি সাধনা বলে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছিলে। পরে গুরুর প্রহারে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মাজারে মানত ও শিরনি হয়।

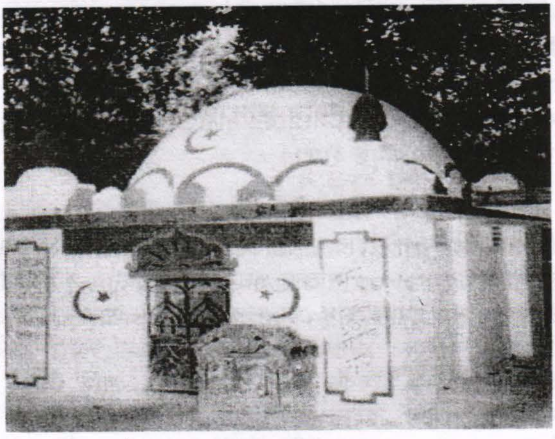

সরিষাডাঙ্গার মাজার

www.pathagar.com

গ. ভাট/চারণ কবিতা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এক সময়ে শক্তিশালী চারণকবিতার ধারা চালু ছিল। অক্ষর জ্ঞান নেই অথবা স্বল্প শিক্ষিত অনেকেই সমাজের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় চারণকবিতা বা গীতিময় কথা মুখে মুখে রচনা করে গেছেন। সমাজের দুঃখ-সুখের নানান ঘটনা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, আবেগানুভূতি বা অনাচারের নানান কাহিনী কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন। তবে এসব রচনা গীত হিসাবেই বেশি সমাদৃত হতো। কালের সীমা ছাড়িয়ে চুয়াডাঙ্গার গ্রামের নানান অঞ্চলে শ্রুতিধর মানুষের মনে এখনও গেঁথে আছে এই সব মূল্যবান চারণকবিতা। আমাদের সচেতন সমাজ প্রতিভাধর এসব চারণকবিদের রচনা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হতো। চুয়াডাঙ্গার বিস্মৃত গ্রামাঞ্চলে অনেক চারণকবির মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের গোবর্ধন মল্লিক [১৮৮৭-১৯৬৩], বিষ্ণুপুরের আমজাদ আলি [১৯৩৭-২০১১], দলিয়ারপুরের নুরুল ইসলাম [জন্ম ১৯৪০] আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদহের হোসেন আলি গায়েন, নগর বোয়ালিয়ার নিয়ামত মণ্ডল [১৯০৫-২০১০], ভাংবাড়িয়ার বাদশা মণ্ডল [১৮৮৯-১৯৬৯] চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কবি খলিলুর রহমান [১৯২৭-২০০২], বড় বলদিয়ার রুস্তম শাহ [১৯০৮-২০০০], ছয়ঘরিয়ার এলাহি মাস্টার, ইত্যাদি বেশ কিছু চারণকবির কথা জানা যায়। নাম না জানা আরও অনেক সৃজন-কুশলী কবিই আছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গোবর্ধন মল্লিক [১৮৮৭-১৯৬৩]

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এক সময়ে শক্তিশালী চারণকবিতার ধারা চালু ছিল। অক্ষর জ্ঞান নেই অথবা স্বল্প শিক্ষিত অনেকেই সমাজের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় লোককবিতা বা গীতিময় কথা মুখে মুখে রচনা করে গেছেন। সমাজের দুঃখ-সুখের নানান ঘটনা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, আবেগানুভূতি বা অনাচারের নানান কাহিনী কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন। তবে এসব রচনার গীত হিসেবেই ছিল বেশি সমাদর।

কালের সীমা ছাড়িয়ে চুয়াডাঙ্গার গ্রামের নানান অঞ্চলে শ্রুতিধর মানুষের শ্রুতি ও স্মৃতিতে এখনও গেঁথে আছে এই সব মূল্যবান লোককবিতা। আমাদের সচেতন সমাজ প্রতিভাধর এসব লোককবিদের রচনা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হতো।

২

চারণকবি গোবর্ধন মল্লিক পাটাচোরার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৮৭ সালে জন্ম। বাবার নাম নেপাল মল্লিক। ১৮০০ সালের প্রথম দিকে তাঁদের পূর্বপুরুষ আলমডাঙ্গার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারি গ্রাম থেকে পাটাচোরায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। ১৮৫৯ সালে নীলবিদ্রোহের সময়ে কবির বাবা তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীসহ গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করে নীলবিদ্রোহে যোগ দেন। এই বিদ্রোহে সাফল্যের একপর্যায়ে অসীম সাহসী কয়েকজন কুঠিতে হামলা করে নীলচাষীদের নীলচাষের চুক্তিনামা [পাট্টা > পাটা] চুরি করে গ্রামে এনে ভস্মীভূত করেন। কুঠির

সাহেবরা এতে হতবাক হয়ে যায় এবং জগন্নাথপুর গ্রামকে 'পাট্টা চোরা'র গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই থেকে গ্রামের নাম আস্তে আস্তে পাল্টে পাটাচোরা হয়ে যায়।

১৯৩৪ সালে দর্শনায় কেরু কোম্পানির চিনিকল স্থাপনের সময় গোবর্ধন মল্লিক একটি কবিতা রচনা করেন। সে সময়ে মুটেরা আঁখ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে মাথায় পোয়ালের তৈরি 'বিড়ে' বাঁধতো কবিতাটিতে তার ইংগিত আছে। কবিতাটি পাওয়া গেছে কবির দ্বিতীয় ভাই ইছব মল্লিকের ছেলে কালু মল্লিকের [জন্ম :১৯৩৮] কাছে।

কবি গোবর্ধন মল্লিকের জীবনযাপন ছিল খুবই সাদাসিদে। কবি ছিলেন ৫ ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। কবির ৩ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলেরা সবাই মারা গেছেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও পাটাচোরায় বাস করেন। একমাত্র মেয়ে উল্লাসী বানুর বিয়ে হয় রামনগরে। তিনি সপরিবারে সেখানেই থাকেন।

১

দর্শনায় বসল চিনির কল
পুবদিকে রেলের গাড়ি পশ্চিমে স্টেশন হল।
এবার পাটের চাষ সব উঠে যাবে
কলের লাঙল ভুঁই চষাবে
নুন জোটেনা চিনি খাবে জিহ্বায় ওঠে জল।
যত দেশের কুলি মুটে খবর পেয়ে এলো ছুটে
টিকরের চুল গেছে উঠে মাথায় বাঁধে পোয়াল।
দর্শনায় বসল চিনির কল ...

অল্পবিদ্যা বাবু যারা চাকরির ছলে ঘুরছে তারা
দেখেশুনে কামটি সারা যারা পায় না কোন স্থল।
দেয়াল চাপায় শেয়াল ম'লো এ কথা ভাই নয় নকলও
দারোগা বাবু এসে প'লো ধরে থানায় নিয়ে চল।
দর্শনায় বসল চিনির কল ...

লম্বা করে চোং গেঁথেছে তাই দেখতে সবাই যেতেছে
হুজুগে দেশের লোক মেতেছে পায় কি তাতে ফল।
সাহেব হুজুর এমনি ধনী বসায়েছেন ম্যাসিনখানি
তাতে তৈরি হচ্ছে মদ অর চিনি ও তার পিছে পাবে ফল।
দর্শনায় বসল চিনির কল ...

২

শোন ভাই ইনছান এই জগতে উঠে গেছে কলুর মান
কলিতে কলুর ব্যবসা কেড়ে নিল মুসলমান।

www.pathagar.com

মুখে বলে বিসমিল্লাহ এবার যা করে আল্লাহ
খেজুর পাতায় বেড়া বেঁধে পাতালেন এক ছাল্লা।
কলুর ঘানি কটকটানি তিন পাকে তেল করতে চান।
শোন ভাই ইনছান এই জগতে উঠে গেছে কলুর মান।

পাটাচোরায় নতুন ঘানি বারো আনা তার বানি
ঢেলে দিল এক বদনা পানি তেলের বেলায় টানাটানি।
সেদিনের মতো ক্ষান্ত দিয়ে নরম বলে কাজ মেটান।
শোন ভাই ইনছান এই জগতে উঠে গেছে কলুর মান।

৩

কালো লুঙ্গি পরনে মুখে দাড়ি মাথায় টুপি খায় সে তাড়ি
গোপনে যায় ব্রজের বাড়ি পরিচয় দেয় মুসলমান।
সিজদা খাওয়া দাগ কপালে দেখবি তারে টকির হলে
কোন হাদিসে দেখতে বলে চন্দ্রবালার ফটো খান।

ব্ল্যাক করে কয়েক বুড়ি কিনে দুখান নকশা শাড়ি
তলপেটে বেঁধে বুড়ি গর্ভের আকার বানান।
কাস্টমের অনুচরে বুড়িকে জিজ্ঞেস করে
কদিন পরে হতে পারে তোমার গর্ভের এ সন্তান।

শুনে বুড়ি লজ্জার কথা অন্যদিকে ঘুরায় মাথা
তলপেটে মেরে গুঁতা চুল ধরে টেনে ফেলান।
আপন টাকায় মাল খরিদ করে মা'র খায় আরও পায়ে ধরে
ব্ল্যাক করতে আর যাব না আমরা ধড়ে থাকতে প্রাণ।

গরিব লোকের হলে টাকা নয়ন দুটি করে বাঁকা
দেশের লোকে সবাই বোকা আমিই কেবল বুদ্ধিমান
যার তেল বিনে হয় উকো মাথা এ দুঃখে আর যাব কোথা
যার মা'র পরনে ছেঁড়া খ্যাতা তার ছেলে মাখে সাবান।
দেখে শুনে ভেবে গুনে দুঃখে জ্বলে যায় প্রাণ।

৪

শুনেছি ভৈরব নদী পার হলি হয় পাটাচোরা
নদীর ধারে যাবি খবর নিবি নইলে ডুবে মরবি তোরা।
কাঞ্চনতলার কয়েকজনা সাঁকো পেতে সুখ পেল না
নদীর কূলে কাঠিমারা নৌকো চলে তাও জানো না [অসমাপ্ত]

www.pathagar.com

কালু মল্লিক

তথ্যদাতা : কালু মল্লিক [জন্ম : ১৯৩৮] , মুক্তারপুর, দামুড়হুদা উপজেলা
গোলজার হোসেন [জন্ম : ১৯৫৮], পাটাচোরা, দামুড়হুদা উপজেলা
আনসার আলি [জন্ম : ১৯৪৯], কোমরপুর, দামুড়হুদা উপজেলা

ঘ. লোকছড়া

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান হল ছড়া। ছড়ায় বাঙালি সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ছাপ ফেলেছে। ফলে লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয় থেকে শুধু ছড়াকে আলাদা করা হলেও তার স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত রূপ পাঠক বা শ্রোতাদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গার্হস্থ্য বিষয়ে, হাসি-কান্নায়, ঝগড়া-বিবাদে, সামাজিক-পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠান-পার্বণ-অবসর-বিনোদনে মুখে মুখে ছড়া-কাটা বাঙালির শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক।

আবহমান বাংলা ছড়ার রূপবৈচিত্র্যের প্রকাশ চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়াগুলোর মধ্যেও সহজেই টের পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলের ছড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং লোকমুখিনতা ছড়াকে জীবন্ত করে রেখেছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রচলিত নানান ধরণের গানে, প্রবাদে, ধাঁধায় ছড়ার রচনাগত যোগ বন্ধন আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে থাকলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক – জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যা ছড়ার ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। কথা-কাহিনী থেকে জীবনের স্বপ্ন-সাধ-কল্পনা, কৌতুক থেকে রঙ্গ-রস, বলা যায়, ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে জীবনের অন্তর্গূঢ় উপলব্ধির অনায়াস প্রকাশ একমাত্র ছড়াতেই সম্ভব। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের শিশুতোষ ছড়াসহ অন্যান্য কিছু ছড়া এখানে উল্লেখ করা হল।

১

আগে নৌকো পাছে নৌকো
নৌকো সারি সারি
মাঝের নৌকোয় চড়ে যাব
লালবিবির বাড়ি।
লালবিবি পান খেয়ে
পথে ফেলায় চিপ
বাঁশবাগান পার হতি
বুক করে ঢিপঢিপ ॥

www.pathagar.com

২

আমার জুড়ি ছিল যারা
তিন ছেলের বাপ হলো তারা
আমার এমন পোড়া কপাল
এমনি কাটবে আর কত কাল।
আমার বিয়ের ফুটবে ফুল
ঘটবে কত হুলস্থুল।
আমার বিয়ে নিশ্চিন্তপুর
যেতে আসতে অনেক দূর।
সাজা তোরা পাল্কি সাজা
চড়ে যাতি ভারি মজা ॥

৩

আয় ঘুম যায় ঘুম
বটের পাতায় চাক
কানকাটা কুকুর ডাকে
চুপ করে থাক ॥

৪

আয় ঘুম আয় ঘুম
বাঁশতলা দিয়ে
আসলে তোরে খেতে দেব
দই কলা চিড়ে।
আকাশে উঁকি দেয়
গোলগাল চাঁদ
বায়না থামিয়ে এবার
যত পারিস কাঁদ।
চাঁদ আকাশে ডুব দিল
আমার চাঁদ ঘুমিয়ে প'লো ॥

৫

আয় চাঁদ আয় না
তোরে গড়িয়ে দেব গয়না।
দুই হাতে বালা দেব
গলায় দেব হার।
বল কি নিবি আর
ঘুঙুর দেব পায়
আয় খুকুর কাছে আয় ॥

www.pathagar.com

৬

আয়রে আয় ঘুমের বুড়ি
চালতেতলা দিয়ে।
দেখ চেয়ে দেখ খোকন ঘুমোয়
গামছা মুড়ি দিয়ে ॥

৭

আয়রে আয় ঘুমের বুড়ি
ঘুমের পাড়ায় যাবি
হাটের বাটের ঘুম এনে
খুকুর চোখে দিবি।
বাটা ভরে পান দেব
গাল ভরে খাবি
বিনি পয়সার সেলামি নিয়ে
হাসতে হাসতে যাবি ॥

৮

আয়রে আয় টিয়ে
সোনামনির বিয়ে
খুকুর গলায় মোতির মালা
খুকুর হাতে হীরের বালা
খুকুর কানে সোনার দুল
খুকুর মাথায় চাঁপা ফুল
আয়রে আয় সাঁঝের বায়
আমার খুকু ঘুম যায় ॥

৯

আয়রে আয় মিনি
খোকার দুধে চিনি
দুধ খাবে না রাগ করেছে
খোকন যাদুমনি।
আয়রে মিনি আয়
পাড়া জুড়িয়ে যায় ॥

১০

আয়রে পাখি বয়রে ডালে
নাচন দেখা তালে তালে।
আয়রে পাখি লেজঝোলা

www.pathagar.com

খেতে দেব দুধকলা।
খাবিদাবি কলকলাবি
যাদুমনির ঘুম পাড়াবি ॥

১১

ইচিং বিচিং চিচিং ছা
লালপাখিটা উড়ে যা।
বাড়ির পাশে পদ্মপুকুর
পদ্মফুল ফোটে
পদ্মফুল তুলতে কারা
পুকুর পানে ছোটে।
পদ্মপাতায় ল্যাকাজোকা
ফুল ফুটেছে থোকা থোকা।
ফুলের আগায় কড়ি
ফুল তুলতে ডুবে মরি।
পাড়াপড়শী জোকার দে লো
ঝাঁপিয়ে পড় ওলো।
খোকন সোনা ফুল তুলতে
বুঝি ডুবেই ম'লো ॥

১২

উলু উলু মধুর সুর
বর এয়েছে কত দূর।
বর এয়েছে দখিনপাড়া
ও ছোট বউ ভাত চড়া
ও মেজো বউ জলদি ওঠো
কাজ ফেলে তরকারি কোটো
হাতে ফুটল বেগুন কাঁটা
সরাও দেখি পানের বাটা।
লাল লাল পাকড়ার ফুল
বর এনেছে কানের দুল।
আর এনেছে ঢাকাই শাড়ি।
ওই শাড়ি কি পরতি পারি
শাড়ি থুয়ে দেও আলমারি ॥

১৩

এ পাড়ার বুড়ো কামার
কাঁচি গড়ে না ভাল
দখিন পাড়ার কামারে ভাই

www.pathagar.com

কাঁচি গড়ায় ভাল।
কাঁচি হলো যেমন তেমন
তিন আনা তার বানি
কচু গাছে বাধিয়ে দিয়ে
হায়রে টানাটানি ॥

১৪

ওরে আমার সোনা
মাছ ধরেছে ব্যাঙের পোনা।
ওরে ও মাছ খাব না
ও মাছ আমি ছোঁব না
শুটকি করে থোব।
আমার সোনার শ্বশুর এলে
অম্বল রেঁধে দেব ॥

১৫

কড়ি কড়ি কড়িটি
কলাই ডালের বড়িটি
নাকের ডগায় দ্যাখ
এক এক্কে এক।
দুই এক্কে দুই
হারিয়ে গেলি তুই।
কড়ি আমার কড়িটি
হাতের কাছে ছড়িটি।
তিন এক্কে তিন
সবাই নজর দিন।
বকুল গাছের তল
চারের ঘরে চল।
হাতের কড়ি পাঁচ
খেলাধুলো শেষ হল
এবার শালিক নাচ ॥

১৬

কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি
কাপড় কেচে দে
তোর বিয়েতে যাব আমি
পাল্কি এনে দে।
পাল্কিতে পাকা পান
বর এয়েছে মুসলমান।

www.pathagar.com

১৭

কুশি কুশি পেয়ারা
ফুলের মতো চেহারা।
পেয়ারা যখন পাকবে
শালিক খাবে ঠুকরে।
এক দুই তিন
পায়ে ঝিন ঝিন
পায়ে হলো ঘা
বদ্যি বাড়ি যা।

১৮

খিদেয় কাঁদে আমার সোনা
ওরে কিছু খেতে দে না।
আয়রে আয় ময়না পাখি
দেখে তোরে জুড়াই আঁখি।
আনবি ফল বন থেকে
ফল খাবে সে চেখে চেখে।
দেব তোরে দুধুভাতি
তুই হবি ওর খেলার সাথী ॥

১৯

খোকা যাবে শিকার করতি
সঙ্গে যাবে কে
সঙ্গে যাবে হুলো বিড়াল
কোমর বেঁধেছে।
কি মারবে কি মারবে
একটুখানি ছেলে
ব্যাঙ মারবে ছুঁচো মারবে
সামনে ধরে দিলে ॥

২০

খুকুরানি টুকটুক
দুধ খায় চুকচুক।
দুধ খাওয়া হল সারা
চুপচাপ সারা পাড়া।
দুধ খাওয়ার একি ধুম
খুকুর চোখে নামল ঘুম ॥

www.pathagar.com

২১

খোকা যাবে আলি আলি
ধরবে ছাতি বনমালি
ছাতির মধ্যি কোম্পানি
কোন কাঙালের ধন তুমি।

২২

ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে
মিঠাই দেব খেতে
খুকুর চোখে ঘুম আয়রে
সোনার পিঁড়ি পেতে।
খেতে দেব ছানা ননী
আয়রে ঘুম আয়
সোনার যাদুমনি আমার
অঘোরে ঘুম যায় ॥

২৩

চাঁদ দোলে সূয্যি দোলে
দোলে কত তারা
আমার যাদু একা একা
কেঁদে হলো সারা।
আর কেঁদো না আর কেঁদো না
দুধ ভাত খাও
খেয়েদেয়ে খাটে শুয়ে
আরামে ঘুম দাও ॥

২৪

ছেলে সোনার কড়ি
পাকা কলার ছড়ি।
কোলে নিতে দেরি হলে
ধুলোয় গড়াগড়ি।
ও ছেলে কেন্দো না
বেজিতি ধরে নেবে।
তোমার মামু তালুকদার
গোট গড়িয়ে দেবে
ওই না গোট পরবে ছেলে
কত বউ আসবে ভুলে ॥

www.pathagar.com

২৫

ঝুম ঝুমা ঝুম ঝুমকো লতা
এত দিন ছিলে কোথা।

ছিলাম আমি কোনখানে
মামুদের কচু বাগানে।

মামুর বাড়ি যাও না কেন
কচু শাক খাও না কেন
মামুর বাড়ি যেতে হয়
দই চিড়ে খেতে হয়।

মা মরেছে কত কাল
ভাগ্নের তাই এমন হাল।
মামী বড়ই মনোহরা
মিষ্টি কথায় ছিষ্টি ছাড়া।
খেতে দেয় কাঁচকলা।
কাউকে তা যায় না বলা ॥

২৬

তা-তা-তা-তা
পান সুপারি খা
পান সুপারি খেয়ে দাদা
হাট করতি যা।
হাটে ছিল পাগলা ঘোড়া
তাড়া করেছে।
তাড়া খেয়ে ভয়ে দাদা
সোজা চিৎপটাং
আছাড় খেয়ে দাদামনির
ভাঙল একটা ঠ্যাং।
পায়ের ব্যথায় কাতরানি
পানি ঢেলে ছোট নানি।

২৭

তারামনি ভাড়া ভানে
ঢেঁকি ওঠে না।
মা জননী চেয়ে আছে
জামাই আসে না।

www.pathagar.com

জামাই আসবে নেবে ঝি
মা'র পরানে বলবে কি।
মা কান্দে বোন কান্দে
গলায় গলা ধরে।
শঙ্খ চিলের কান্দন শুনে
চোখের পানি ঝরে ॥

২৮
তিন পয়সার তেল
কেমনে কেমনে গেল।
তোমার দাড়ি আমার পায়
আর দিয়েছি ছেলের গায়।

ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলো
সাত রাত গান হলো।
আবাগির বেটি ঘরে এল
বাকিটুকু নিয়ে গেল ॥

২৯
তিড়িং বিড়িং ফড়িং নাচে
ডালিম গাছের ডালে।
ফুলটুসকি পাখনা নাচায়
হাওয়ার তালে তালে।

৩০
দোল দোল দোলে
রাঙা মামির কোলে।
মামি দিল দুধভাত
খেয়ে খোকন হলো কাত।

৩১
দোলে দোলে ময়না দোলে
ছোটচাচির কোলে
পাহাড় টুঁড়ে ময়না পাইছি
দেব কি তোর কোলে ॥

৩২
ধন ধন পায়রা
এ ধন পায়গো কারা ?

www.pathagar.com

সাগরে কামনা করে
ধন পেয়েছি আমরা
এ ধন যাদের নেই ঘরে
তারা কি নিয়ে ঘর করে ॥

৩৩

ধেপো কচু কোলা ব্যাঙ
আমার গর্তে আলি ক্যান
আলাম তো তোর কি
মারব পেটে লাথি।
মার তো কেমন দেখি ॥

৩৪

টিম টিমা টিম
কাকের বাসায় কোকিল এসে
পাড়ছে দেখ ডিম।
ঠক ঠকা ঠক
এক পায়েতে দাঁড়িয়ে দেখ
একটা কানা বক।
মচ মচা মচ
নতুন জুতো পরে খোকন
হাঁটছে কচ কচা কচা॥
ফট ফটা ফট
এবার খোকন শিখে ফেল
পড়াটা ঝটপট ॥

৩৫

পুবপাড়ায় দোতলা বাড়ি
কাক বসেছে সারি সারি
ও মা তোর পায়ে পড়ি
বউ এনে দে খেলা করি।
বউ হল কালো
নাক কেটে ফেল।
নাকে কেন রক্ত
জবাফুলের ভক্ত ॥

www.pathagar.com

৩৬

ফুলি উঠল ডুলিতি,
ডুলি বয় কাহার
এই তো ফুলির বাহার ॥

৩৭

বরের বাড়ি কাঞ্চনপুর।
বাদ্যি বাজে বাজনা বাজে
বড়ই মিঠে সুর।
বাড়ির কাছে কাছারি
পুঁটি মাছের ব্যাপারি।
মাছ কুটব কি করে
বটি নিল চোরে।

ভানুমতির বিয়ে দেব
রাজার বেটার ঘরে।
জামাই এলে দেব পান
মেয়ের কিছু বললে পরে
জামাই বেটার কাটব কান ॥

৩৮

ভানু কেন কান্দেরে--
চিকন চালের ভাত
ভানুর মা রান্দেরে।

ভানু খাবে দুধের সর
সেজেগুঁজে দাঁড়া সবাই
জামাই আসবে সুন্দর ॥

৩৯

ভানুমতি গোছল করে
হাতে সোনার বালা
দুধের বাটি ঠাণ্ডা করে
ভানুমতির খালা ॥

ভানুর গোছল হলো সারা
আপদ বালাই সরে দাঁড়া

www.pathagar.com

গাঙের পানি গাঙে যায়
ভানুমতি দুধ খায় ॥

৪০
মনি কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
কাল যাব গঞ্জের হাট
কিনে আনব শুকনো কাঠ।
মনির কান্না না শুনি
মনির জন্যি তোলা আছে
সিকেয় মাখন ননী।
তুমি খাওনা সারা দিনই ॥

৪১
মনি নাচে পায় পায়
ঘুঙুর বেঁধে দেব পায়
ঢোল বাজাবে ঘুরে ঘুরে
আয় ছুটে আয় কাছে দূরে
পাঁচ-ছ কুড়ি কড়ি নেব
মনির নাচন দেখিয়ে দেব ॥

৪২
মনি যায় যুদ্ধে
তরোয়াল হাতে দে।
তার মতো জোরদার
নেই কেউ নেই আর।
এই ওড়ে ঝান্ডা
দুশমন ঠাণ্ডা ॥

৪৩
ময়না করে নাচনা
উজানতলির বাজনা
ছমকে ফেলে পা
টাকার উপর সিকে ফেলে
নাচন দেখে যা ॥

৪৪
ময়নামতি দুধের সর
চায় না যেতে পরের ঘর।

www.pathagar.com

বাপ বলছে আয় আয়
মা বলছে থাক
বউ বলছে দূর করে দাও
শ্বশুর বাড়ি যাক ॥

৪৫

ময়নামতি নাচ তো সোনা
ওরে বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না।
ছোট দেবরের বিয়ে
ধীরে ধীরে নাচব আমি
পায়ে আলতা দিয়ে।
দই খাব খাব চিড়ে
বসতে দেবে নতুন পিঁড়ে।
ও দোকানদার ভাই
রাঙা ফিতে চাই
বোনের বিয়েয় মাথায় দিয়ে
নাচতে নাচতে যাই ॥

৪৬

মাঝ গাঙে নাও নিয়ে
মাঝি বেটা কই
উলুকঝুলুক গাঙের পানি
করেরে থই থই।
নায়ে আছে কাটারি
মুরগি হাটার ব্যাপারি ॥

৪৭

রাখাল ছোঁড়া গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে।
তার মাকে নিয়ে গেল
টোপর মাথায় দিয়ে।
উদবিড়ালে খুদ খায়
আকাশে ওড়ে ফিঙে
ট্যাংরা মাছে গীত গায়
ভ্যাড়া বাজায় শিঙে ॥

www.pathagar.com

৪৮

লাল জামা গায়
রাঙাজুতো পায়
খোকা হবে সায়েব
দেখতে হবে নায়েব।
আদর করে দিলাম চুমো
খোকা এবার ঘুমো ঘুমো॥

৪৯

হলুদ বাটো মেন্দি বাটো
জোড় পুতুলের বিয়ে।
ওই আসছে নতুন জামাই
গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা ভাল না
মেয়ের বিয়ে দেব না।
মেয়ে দেব সাজিয়ে
টাকা নেব বাজিয়ে ॥

৫০

হুতুম প্যাঁচা ভুতুম ডাকে
ডাকে প্যাঁচার মা
পথে বসে কাক পক্ষী
করে রে কা কা ।
হুতুম প্যাঁচা মুখ বাড়িয়ে
এদিক সেদিক চায়
সুযোগ বুঝে ঝপাং করে
ইঁদুর ধরে খায় ॥

তথ্য সূত্র :

মনোয়ারা খাতুন, বয়স : ৫৬ বছর, গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
মন্টু মিয়া, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
গোলাম ফারুক জোয়ার্দার, বয়স : ৪২ বছর, গ্রাম : সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
আমেনা খাতুন, বয়স : ৬৯ বছর, গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
রুবি খাতুন, বযস : ৫৭ বছর, গ্রাম : ফার্মপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
আলেয়া বানু, বয়স : ৪৩ বছর, গ্রাম : বেলগাছি সিগনাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা
রবগুল, বয়স : ৬৩ বছর, গ্রাম : নুরনগর, চুয়াডাঙ্গা
আজিম শাহ, বয়স : ৫৬ বছর, গ্রাম : বহালগাছি, চুয়াডাঙ্গা
শরিফা খাতুন, বয়স : ৪৩ বছর , গ্রাম : তিওরবিলা, আলমডাঙ্গা
হায়দার আলি, বয়স : ৩২ বছর, গ্রাম : বাস্তুপ[illegible], দামুড়হুদা,
আরাফাত আলি, বয়স : ৪০ বছর, গ্রাম : চ[illegible]্রবাস, দামুড়হুদা

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

ক. তাঁত শিল্প

চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে অতি প্রাচীনকালে। এরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ পেশার অনুসারী। বর্তমানে আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর (৬০ ঘর), ইসলামপুর (৬০ ঘর), কুমারী (৭৫ ঘর), খাসকররা (৫০ ঘর), এরশাদপুর (৯০ ঘর), পার আলমডাঙ্গা-আনন্দধাম (৩০ ঘর), বাদেমাজু (৩০ ঘর), ডাউকি (৭০ ঘর), বেলগাছি (২৪ ঘর), গোবিন্দপুর (৭৫), পারকুলা-পাইকপাড়া (১০০), হাটবোয়ালিয়া (২৫ ঘর), ভাংবাড়িয়া (৪৫ ঘর), নগর-বোয়ালিয়া (৪৫), শেখপাড়া (২৫), বামানগর এবং চুয়াডাঙ্গা উপজেলার বেলেকান্দি গ্রামাঞ্চলে তাঁতি সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য একান্তভাবেই পরিবারকেন্দ্রিক। আলমডাঙ্গা অঞ্চলের তাঁতিরা প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং এঁরা নিজেদের কারিগর হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে দৈনন্দিন পরিধেয় কাপড়ের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে। তাঁতশিল্পীরা হাত ও পায়ের সাহায্যে তাঁতযন্ত্র পরিচালনা করে সুতিবস্ত্র তৈরির কারিগর। সুতিবস্ত্রের প্রধান উপাদান তুলা থেকে তৈরি সুতা। এককালে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে তুলা উৎপন্ন হওয়ার কারণে এ এলাকায় পুরোনো আমলে তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের তাঁতিরা যে কাপড় তৈরি করেন তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী আটপৌরে সাধারণ মানের কাপড়-চোপড় হলেও তার বুনন, নমনীয়তা এবং স্থায়িত্ব বিবেচনায় সুনাম আছে।

বাঁশ, কাঠ, দড়ি, সূতা, লোহা ইত্যাদির সাহায্যে নির্মিত তাঁত তুলনামূলকভাবে একটি জটিল যন্ত্র। একটি তাঁতযন্ত্র সাধারণত আট ফুট দীর্ঘ, চার ফুট প্রস্থ এবং আট ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তিন ফুট লম্বা দুটি, আড়াই ফুট লম্বা দুটি-মোট চারটি কাঠের পায়া, তাঁতযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। চারকোনা বিশিষ্ট পায়াগুলির ব্যাস দেড় ফুট। তবে আধুনিক তাঁতযন্ত্র তুলনামূলকভাবে প্রথাগত তাঁতযন্ত্রের থেকে কিছুটা আকৃতিতে ছোট। একটি তাঁতযন্ত্রে পায়ার পাশাপাশি নয়টি কাঠের পাসি সংযুক্ত করা হয়। পায়া এবং পাসির সমন্বয়ে তাঁতযন্ত্রের প্রাথমিক অবকাঠামোর সাথে অন্যান্য অংশ সংযুক্ত করা হয়। একটি তাঁতযন্ত্রে প্রায় ২০/২২টি অংশ আছে। অংশগুলো হলো চরকা, ফান্দা, নলি, ববিন, ম্যাড়া, মাকু, খালি, বিরাম, সানা, বোয়া, পাদানি, পাশা, ভ্রমর, পুচড়া, শর, আড়া, মুটো, কল, সিপ, বাঁশই প্রভৃতি।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আগে চরকা ও টাকুরের মাধ্যমে সূতা কাটা হতো। আজকাল মেশিনের তৈরি সুতা ব্যবহৃত হওয়ায় চরকা ও টাকুর ব্যবহার লোপ পেয়েছে। ব্যবহৃত

www.pathagar.com

কাঁচামাল সুতা, রং, এসিড, পানি এবং মাড়। প্রধান যন্ত্রপাতি- হস্তচালিত তাঁতযন্ত্র, চরকা। সূতা প্রয়োজন মতো ভাগ করে পানির সাথে এসিডসহ রঙ মিশিয়ে রঙিন করা হয়। রঙ শুকিয়ে গেলে কিছু সূতা চরকার সাহায্যে নলি করা হয়, আর কিছু সূতা ড্রামে পেঁচিয়ে সেখান থেকে তানা তৈরি করা হয়। সেগুলো সানার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। এভাবে সম্পন্ন করা হয় বুননের প্রস্তুতি। তারপর পা দিয়ে প্যাডেলের সাহায্যে তাঁত এবং হাত দিয়ে কপিকল পদ্ধতিতে মাকু পরিচালনা করা হয়। প্যাডেলের সাহায্যে তাঁতের উপরের সুতা নিচে এবং নিচের সুতা উপরে ওঠা-নামা করে। আর সাথে সাথে মাকু এপাশ-ওপাশ করে স্থান বদল করে। এভাবে বুনন-কর্ম সম্পাদন করা হয়।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে চরকার সাহায্যে সূতা নলি করা হচ্ছে

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে কাপড় বুননরত একজন তাঁতি

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা জেলার তাঁতিরা সাধারণত গামছা, লুঙ্গি, শাড়ি বুনে থাকে। গামছা, লুঙ্গি একই পদ্ধতিতে বোনা হয়। গামছা ও লুঙ্গির সূতা পূর্বেই রঙ করা থাকে। সবশেষে মাড় দিয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে বাজারজাত করা হয়। বাড়ি সংলগ্ন একটি ছোট ঘর কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেশিনে তৈরি কাপড়ের প্রচলন হওয়ায় তাঁত শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাঁতিরা এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার গামছার সুনাম জেলার বাইরে বিভিন্ন জেলায় এখনও শোনা যায়। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে আলমডাঙ্গা উপজেলায় তাঁতি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকায় এ অঞ্চলে বাউল মতবাদের বিস্তার এবং তাঁদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মধুপুর গ্রামে জন্ম সাধক-কবি কুবির গোঁসাই [১৭৮৭–১৮৭৯] তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেন এই গানটি :

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা।
যখন খেই যাবে ছিঁড়ে লব জুড়ে ফেলব না তার এক ফোঁটা।
সদা ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠারতি আছে আমার মন-আঁটা ॥

ভসকে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে
ভয় কি তার এত কত শত গুছাই জড়াপটা।
নাটিয়ে করব পাতা দেখব তা বাধবে না কোনো ন্যাটা ॥

যখন সুতো করব মাতি
লাগাব তায় পাতি পাতি খৈ-ভিজে মাতি
দুই এক ঘড়ি ছাড়াব জটা
শেষে কাঁড়িয়ে তানা গাঁথা সানা সানপেতে শাড়ির ছটা ॥

হয় যদি তায় কানা-ঘরে
গুটিয়ে লব শেষে দিব আলগা খেই পুরে
এক নজরে দেখব সেটা।
শেষে বোয়া গেঁথে নাচলিতে জুড়ে ফেলব তানাটা ॥

প্রথমে বিশকরম বলে
চালিয়ে মাকু আঁকুপাঁকু করব না ভুলে
তায় ঝাঁপ তুলে ঘা দিব নটা।
তবে ঝাপে-ঝোপে বুনব কাপড় দিয়ে ও সাবির কাঁটা ॥

www.pathagar.com

কলে বলে চালাব নলি
ছিঁড়বে না খেঁই খাব সে দই সাঁদ মেরে যাব।
খুব দেখার আমার গুণ যেটা।
কাপড় বুনব কিসে নরাজ ঘিঁসে রাখব না দশি কাঁটা ॥

ভালো কাপড় বুনতে জানি চিরুণ-কোটা
পালের বোঁটা ঢাকাই জামদানী
তার ঢের কানি তা বুঝে দেয় কেটা।
কুবির চরণ ভেবে বলে এবার এ দফাতে নাই ঘোঁটা ॥

তথ্যদাতা : রইস শাহ [জন্ম : ১৯৫১], গ্রাম : ফরিদপুর, উপজেলা : আলমডাঙ্গা
নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৫০], গোবিন্দপুর, উপজেলা : আলমডাঙ্গা
অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম : ডাউকি, উপজেলা : আলমডাঙ্গা

খ. মৃৎশিল্প

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের হিন্দু পাল সম্প্রদায়ের কুম্ভকার বা কুমোরগণ প্রধানত মৃৎশিল্পী। আদিম কাল থেকেই সহজ লভ্য মাটিকে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ হাঁড়ি-পাতিল, জলাধার, শষ্যাধার, দীপাধার, ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী জিনিসপত্র তৈরি করে আসছে। পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছে যুগ-সচেতন নান্দনিক রুচিসম্মত নির্মাণ শৈলী। এঁদের শিল্পের প্রধান উপাদান উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য এঁটেল মাটি। এঁরা পুরুষানুক্রমে মাটির তৈজসপত্র, খেলনা পুতুল, পুজার দেব-দেবীর মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পুজা উপলক্ষে শত শত দেব-দেবীর মূর্তি এঁরাই তৈরি করে। কালের বিবর্তনে এবং যুগের পরিবর্তনে ঘর-গৃহস্থালির বহু জিনিসপত্রের ব্যবহার বর্তমানে কমে এলেও এখনও মাটির তৈরি বহু জিনিস বহাল রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের কুমোররা মাটির যেসব জিনিসপত্র তৈরি করে যেমন, হাঁড়ি, সরা, তাওয়া, বিভিন্ন পিঠার ছাঁচঅলা তাওয়া, ভাঁড়, কলস, মালসা, ফুলের টব, ঝাঝরি, কুয়োর পাট, নান্দা ইত্যাদিই প্রধান। তবে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং মেলা বা উৎসব উপলক্ষে পুতুল, মাছ, হাতি, ঘোড়া, হাঁস, মোরগ-মুরগি, কুমির, কচ্ছপ, হরিণ, বাঘ, তাল, বেল, পেয়ারা, মাটির ব্যাংক ইত্যাদি তৈরি করে। কাদামাটির তৈরি এ সব শিল্পকর্ম ব্যবহার উপযোগী স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য ভাটিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিদিষ্ট সময় ধরে পোড়ানো হয়। প্রাচীনকাল থেকেই বংশ পরম্পরায় অসাধারণ নৈপুণ্য, দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে তাঁরা এ কাজ করে আসছে।

বর্তমানে দুর্মূল্যের বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় কুমোর সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর লোকজনকেও সে অবস্থা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মাটি কাটা শ্রমিক ও পরিবহন খরচ বাদে এঁদের ব্যবহার উপযোগী ২ থেকে ৩ ফুট স্তরের এক কাঠা পরিমাণ মাটির দাম দুই হাজার টাকা। জিনিসপত্র তৈরি ও পোড়ানো ইত্যাদি সব খরচ মিলিয়ে

www.pathagar.com

বর্তমানে এ পেশা মোটেই লাভজনক নয়। তবু কোনো রকমে এখনও টিকে আছে। উপায়ান্তর না পেয়ে অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে নানা রকম কাজকর্ম শিখে পেশা বদল করছে।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলার তালতলা, মমিনপুর, ডিঙ্গেদহ; আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর, গোবিন্দপুর, বেলগাছি, মাজু, খাসকররা, গড়গড়ি, পুঁটিমারি; দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর, পুড়োপাড়া, দামুড়হুদা, কার্পাসডাঙ্গা, জগন্নাথপুর; জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর, দেহাটি, হাসাদহ কুমোর সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

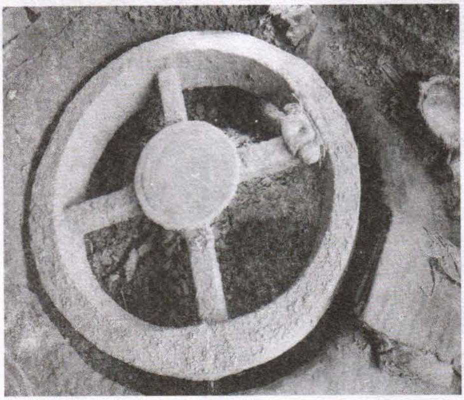

হাতে ঘুরানো চাক

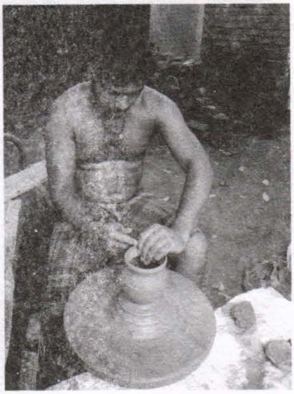

নকুলচন্দ্র পালের যন্ত্রচালিত চাক

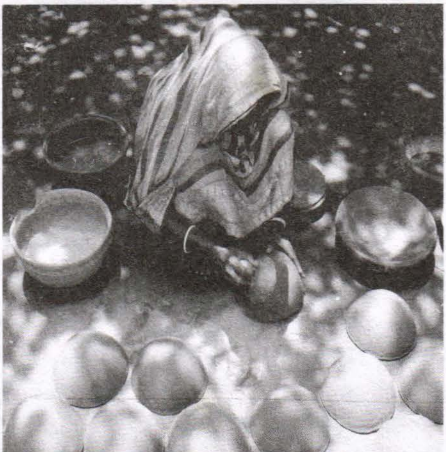

মল্লিকারাণী পাল মাটির জিনিস তৈরি করছেন

www.pathagar.com

চারা লাগানোর টব

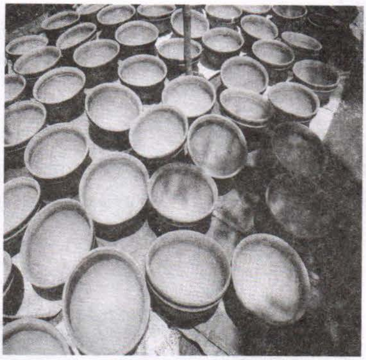

মাটির তাওয়া

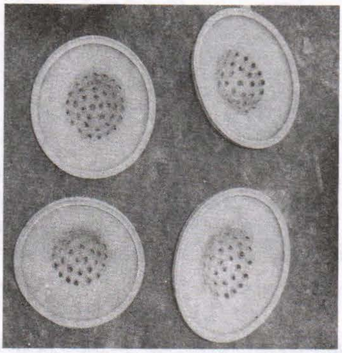

চারা লাগানোর টব

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা উপজেলার ডিঙ্গেদহ গ্রামের জয়দেবকুমার পাল [জন্ম : ১৯৮৭], তালতলা গ্রামের বাবুল শর্মা [জন্ম : ১৯৬৯], আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর গ্রামের নকুলচন্দ্র পাল [জন্ম : ১৯৮২], মন্টু পাল [জন্ম : ১৯৫৪] হারাণচন্দ্র পাল [জন্ম : ১৯৪৪], পুষ্পরাণী পাল [জন্ম : ১৯৫৪], বিশ্বনাথ পাল [জন্ম : ১৯৬৪], বিশাখারাণী পাল [জন্ম : ১৯৮২], দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের অনাথকুমার পাল, [জন্ম : ১৯৫৪], শান্তিকুমার পাল [জন্ম : ১৯৪৪], বিমলকুমার পাল [জন্ম : ১৯৫৪], মল্লিকারাণী পাল [জন্ম : ১৯৫২]।

গ. লৌহজাত শিল্প

কর্মকার বা কামার সম্প্রদায়ের লোকজনই প্রধানত পুরুষানুক্রমে। দৈনন্দিন কৃষিকাজে দা, কাস্তে, পাট-কাটা বা ঝোপঝাড় কাটার অস্ত্রপাতি, নিড়ানি, কোদাল, লাঙলের ফলা, গজাল, খুরপি, কান্দালির ফলা, এবং গৃহস্থালির কাজে বটি, খন্তি, হাতা, বেড়ি, ঢেঁকির গুলো, ঝাঁঝরি হাতা, ছুরি, চাকু, নারকেল কুরুনি, কুড়ুল, শাবল, বিভিন্ন রকম আংটা, শিকল, হাতুড়ি, বাটালি, ছেনি ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী নানাধরনের যাবতীয় লৌহজাত জিনিসপত্র তৈরি করে। তাছাড়া পুরোনো যন্ত্রপাতি মেরামত ও ধার দেওয়ার কাজও এরা করে।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গার কর্মকাররা লোহার কাজ করছে

কর্মরত দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের কর্মকাররা

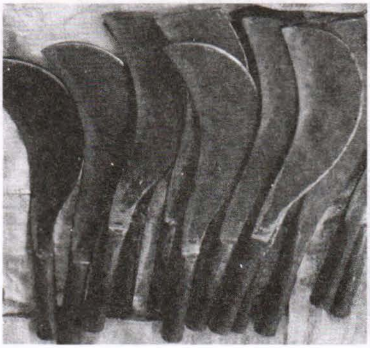

www.pathagar.com

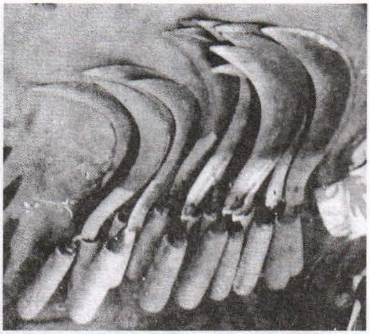

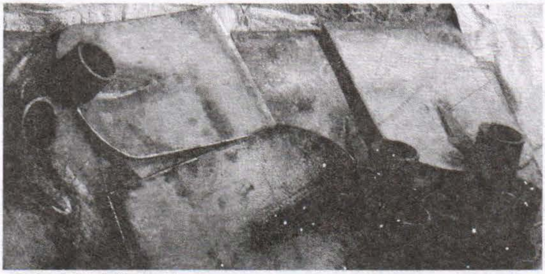

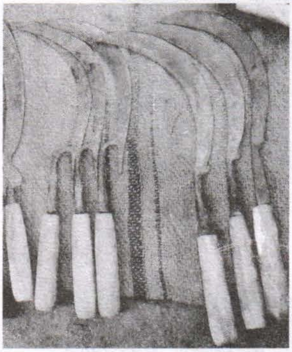

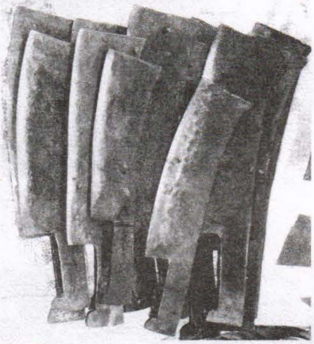

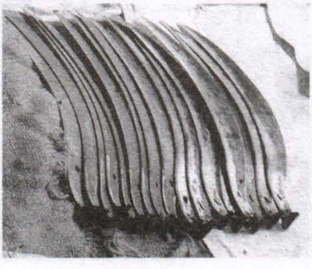

কর্মকারদের তৈরি লোহার বিভিন্ন জিনিসপত্র

www.pathagar.com

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার অসীমকুমার কর্মকার [জন্ম : ১৯৬৪], গ্রাম : নবীননগর, রঞ্জন কর্মকার [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রাম : বদরগঞ্জ, নির্মলকুমার কর্মকার [জন্ম : ১৯৬২], গ্রাম : হাসনহাটি, জটাধারী কর্মকার [জন্ম : ১৯৬৪], গ্রাম : সরোজগঞ্জ, শ্যামলকুমার কর্মকার [জন্ম] : ১৯৫৯ গ্রাম : শম্ভুনগর, দামুড়হুদা উপজেলার নিমাইকর্মার [জন্ম : ১৯৭১], যজ্ঞেশ্বর কর্মকার [জন্ম : ১৯৬৯], সুজন কর্মকার [জন্ম : ১৯৮৪], সুশান্ত কর্মকার [জন্ম : ১৯৬৯], ষষ্ঠীচরণ কর্মকার [১৯৬৬] গ্রাম : বিষ্ণুপুর।

ঘ. বাঁশ-বেতশিল্প

বাঁশ সহজলভ্য হওয়ায় গৃহস্থালির নানা রকম তৈজসপত্র তৈরিতে বাঁশ শিল্পের ব্যবহার আদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে দুই ধরনের সম্প্রদায় বাঁশ-বেতশিল্পের সাথে জড়িত। দাস বা মুচি নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত সম্প্রদায় বাঁশের কুলা, চালন, ঝুড়ি, মাথালি, মুরগি রাখার খাঁচা, মুরগির বাচ্চা ঢাকার টাপা, ডালা, ঢালন, ডোল, দরমার বেড়া, ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাড়ির নারী-পুরুষ ছোট ছেলে-মেয়ে সবাই যারা যে কাজের উপযোগী সে সেই কাজ মনোযোগ দিয়ে করে যায়। নারীরা দৈনন্দিন গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বা পাশাপাশি এ সব কাজে নিয়োজিত থাকে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাঁশ-বেত শিল্পী সম্প্রদায়ের লোকজন চুয়াডাঙ্গা উপজেলার ইসলামপাড়া চুয়াডাঙ্গা (মুচিপাড়া), বেলগাছি, আলোকদিয়া, হাড়োকান্দি, ধুতুরহাট, বড় শলুয়া; আলমডাঙ্গা উপজেলার আনন্দধাম, বাদেমাজু, গোবিন্দপুর, পাইকপাড়া, জামজামি, ওসমানপুর, আঠারোখাদা, মাদারহুদা; দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর, কালিদাসপুর (দর্শনা), আজিমপুর, চিৎলা, গোবিন্দহুদা গ্রামে বসবাস করে।

www.pathagar.com

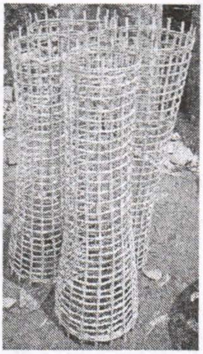
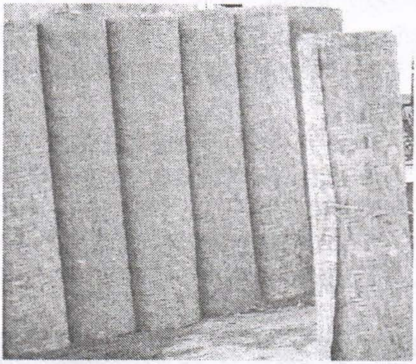

জীবননগর উপজেলার

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের নগেন্দ্রনাথ দাস [জন্ম : ১৯৪৭], চুয়াডাঙ্গা শহরের ইসলাম পাড়ার রাজকুমার দাস [জন্ম : ১৯৬৯], ধুতুরহাটের রঞ্জন দাস [জন্ম : ১৯৭৪], হাড়োকান্দির চতুর্বেদ দাস [জন্ম : ১৯৭২], বড় শলুয়ার নরেন্দ্রচন্দ্র দাস [জন্ম : ১৯৪৪], আলোকদিয়ার বিমলচন্দ্র দাস [জন্ম : ১৯৩৯], আলমডাঙ্গা উপজেলার আনন্দধাম গ্রামের নৃপেন্দ্রচন্দ্র দাস [জন্ম : ১৯৫৪], অজিতকুমার দাস [জন্ম : ১৯৪৪], বাদেমাজু গ্রামের সুকুমার দাস [জন্ম : ১৯৫৪], নিমাইপদ দাস [জন্ম : ১৯৪৪], দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরের ভরতচন্দ্র দাস [জন্ম : ১৯৭৭] দামুড়হুদার রঞ্জন দাস [জন্ম :১৯৭২], দর্শনার আজিমপুরের মোহন দাস [জন্ম : ১৯৭৯], গোবিন্দহুদার কৃষ্ণচন্দ্র দাস, [১৯৬৪]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাঁশ-বেত শিল্প

আলমডাঙ্গা উপজেলার রেললাইনপাড়া, স্টেশনপাড়া, গোডাউনপাড়া, ক্যানালপাড়া, ইটভাটাপাড়া, উপজেলাপাড়া – সব মিলিয়ে প্রায় ৬৫৫ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ রয়েছে আলমডাঙ্গায়। সময়ের অভিঘাতে এদের জীবন-জীবিকা, পেশা হারিয়ে বর্তমানে এরা বাঁশ-বেত-শিল্পকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে তার উপরই নির্ভর করে বেঁচে আছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত কর্মঠ। বাড়ির নারী-পুরুষ ছোট ছেলে মেয়ে সবাই যারা যে কাজের উপযোগী সে সেই কাজ মনোযোগ দিয়ে প্রায়

www.pathagar.com

সারাদিন ধরে নিজেদের বাড়িতেই করে যায়। নারীরা দৈনন্দিন গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বা পাশাপাশি এ সব কাজে নিয়োজিত থাকে।

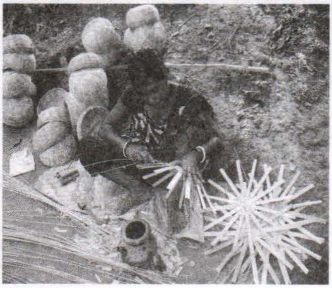

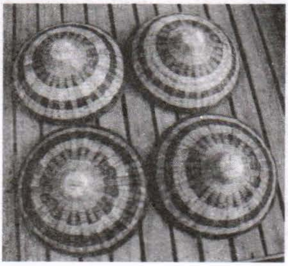

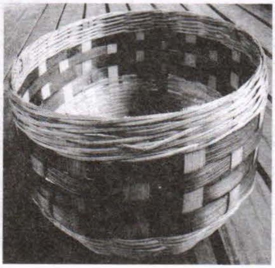

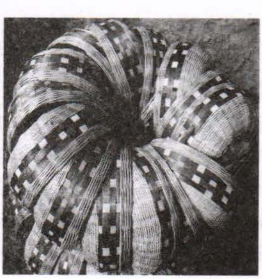

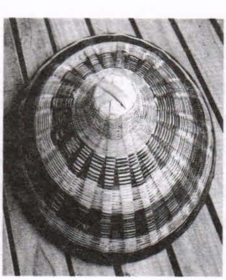

www.pathagar.com

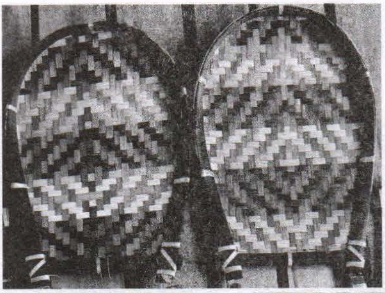

আলডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার আদিবাসীদের তৈরি বাঁশের জিনিসপত্র

তাঁরা মূলত কুলা, নকশি কুলা, ডালা, সরপোষ, ছোট ঝুড়ি,, বড় ঝুড়ি ও নানা রকম আকর্ষণীয় জিনিসপত্র তৈরি করে থাকে। এঁদের হাতের কাজ স্থানীয় দাস বা মুচি সম্প্রদায়ের চেয়ে ভিন্ন রকম এবং শিল্পমণ্ডিত। তাঁদের হাতের সুচারু কাজে সুদৃশ্য রঙের ব্যবহার তাঁদের কাজকে আরও দৃষ্টিনন্দন এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরা জিনিসপত্র হাটে-বাজারের চেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে পছন্দ করে। গ্রাম্য মেলায় বেচাকেনা এদের অপছন্দ নয়। তবে তৈরি জিনিসের প্রধান ক্রেতা ঢাকা বা দেশের বড় বড় শহরের বিপণি বিতানগুলোতে সরবরাহকারি ফড়ে বা ব্যবসাদারেরা। সে ক্ষেত্রে এঁদের তৈরি জিনিসের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও খরচ-খরচা এবং মজুরি পুষিয়ে লাভ যৎসামান্যই থাকে।

তথ্যদাতা : আলডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার পরেশ ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪৪], ঘুঘু ব্যাধ [জন্ম : ১৯৪০], ফুলমনি ব্যাধ [জন্ম : ১৯৫৯], মৌসুমী ব্যাধ [জন্ম : ১৯৯৪]। তথ্য সংগ্রহের তারিখ –২৫/০৯/২০১৪

চ. পাখাশিল্প

বাংলাদেশের সর্বত্রই পাখার ব্যবহার রয়েছে। গ্রামে পাখার কদর সবচেয়ে বেশি। চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি তাই গরমের সময় পাখার বিকল্প নেই। পাখা তৈরির উপকরণও বেশ সহজলভ্য। এক সময় বিশালকায় তালপাতার পাখা দিয়ে বিয়ের বর ও অভ্যাগতদের বাতাস করার প্রচলন ছিল। হাতপাখা আকারে ছোট এবং একহাত ঘুরিয়ে বাতাস উপভোগ করা যায়। সাধারণত ছোট তালগাছের পাতা দিয়ে এসব পাখা তৈরি করা হয়। কখনও কখনও একটা পাতা দিয়ে একটি বা মাঝখান থেকে চিরে দুটি পাখা তৈরি করা যায়। আবার পাতা ছাড়িয়ে নিয়ে আলাদা

www.pathagar.com

পাতাগুলোকে সুতা দিয়ে গেঁথে বাঁশের ডাট লাগিয়ে ভাঁজপাখা তৈরি করা হয়। এটি সহজে বহন যোগ্য। এসব পাখায় রং দিয়ে নানা মটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়।

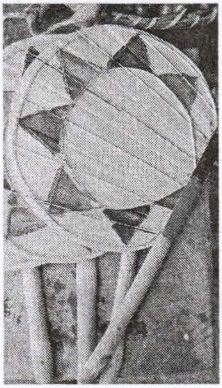

বিভিন্ন ধরনের হাতপাখা

সুতার তৈরি গোলাকার পাখা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। কাঁথা শিল্পের অনুরূপ নানা ডিজাইন এসব পাখায় ফুটিয়ে তোলা হয়। নানা ধরণের শ্লোক বা প্রবাদ পাখা সূচ-সুতার মাধ্যমে অংকিত হয়। এরুপ শ্লোক আছে, 'দিলাম উপহার/রাখিও যতনে। ভুলে গেলে ফেলে দিও/জ্বলন্ত আগুনে।' বাঁশের শলার হাতল ও চারপাশে রঙিন কাপড় দিয়ে ঝালর তৈরি করা হয়।

ছ. কাঁথাশিল্প ও নকশিকাঁথা

বৃহত্তর নদিয়া এবং যশোর অঞ্চলের কাঁথাশিল্প ও নকশিকাঁথার খ্যাতি বহু পুরোনো এবং সুনাম বিশ্বজোড়া। কাঁথাশিল্পকে সূচিশিল্প হিসেবে ধরা হয়, এটি লৌকিকধারার শিল্প এবং সুঁই-সুতো দিয়ে হাতের সাহায্যে সেলাইয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে কাঁথাকে সাধারণত 'খ্যাতা' বা 'কেথা' বলা হয়ে থাকে। দেশের সব জায়গায় কাঁথার ব্যবহার থাকলেও এ অঞ্চলের কাঁথার বুনন-নৈপুন্য ও রঙিন সুতোর বিচিত্র নকশার কারণে মূলত এর সুনাম ছড়িয়েছে। গ্রামের অতি সাধারণ নিরক্ষর নারীরা কাঁথাশিল্প ও নকশিকাঁথার রূপকার। সাধারণত বহুদিনের পুরনো ব্যবহার করা শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি বা কাপড় কাঁথার প্রথম এবং প্রধান উপাদান। এগুলোকে ৩-৪টি থেকে ৭ 'পাল্লা' বা স্তরে কাঁথার মাপ মতো সাজিয়ে একসাথে কাঠামোটাকে ধরে রাখার জন্য চারধারে এবং ভেতরে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে প্রথমে সেলাই করে নেওয়া হয়। একে বলা হয় 'কাঁথা পাড়া'। এরপরে শাদা জমিনের কাঁথায় শাদা সুতো বা শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতো অথবা কাপড়বোনার নতুন সুতো দিয়ে বুননের মতো করে ঘরোয়া পরিবেশে কাঁথা সেলাই করা হয়। এককালে মেয়েদের বিয়ের সময়ে অনেক গুণাবলির মধ্যে সূচিশিল্পে দক্ষতা অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হত। গ্রামীণ জীবনে সদ্যজাত শিশু থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে কাঁথার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার এখনও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

নকশি কাঁথায় চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে দালান পাড়, মাদারকাঁটা, আটকোটা, দোরোখা, বাঁশপাতা, কার্ফা, তাবিজ-গাঁথুনি, চিকদালান, কাজল-লতা, ষোলকোটা, ফলধাগা, সাবুদানা, লহরি, টিক্কাধাগা, মইপট্টি, পিঁপড়ের সারি, মোচড়ধাগা, খেকুরছড়ি, বাবলার ফুল, বাঁক ফোঁড়, গোটা ফোঁড়, ভাঙা ফোঁড় ইত্যাদি প্রয়োজন মতো বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের ধরন প্রচলিত আছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তালতলা, আকন্দবাড়িয়া, বোয়ালমারি, সরিষাডাঙ্গা, কুতুবপুর, বড় শলুয়া, বেগমপুর; আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর, বন্ডবিল, বেলগাছি, হাটবোয়ালিয়া, ভাঙবাড়িয়া, মহেশপুর, উত্তর লক্ষ্মীপুর, ওসমানপুর, প্রাগপুর, হারদী, কুমারী, পুলতাডাঙ্গা, নতিডাঙ্গা, নান্দবার, গাংনী [ইউনিয়ন], পশ্চিম কমলাপুর, খাদিমপুর, গড়গড়ি, বখশীপুর, জামজামি, পাঁচলিয়া, ঘোষবিলা, নাগদহ, জোড়গাছা, খাসকররা, তিওরবিলা; দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা, গোপালপুর, কলাবাড়ি, ইব্রাহিমপুর, বিষ্ণুপুর, চারুলিয়া, কোরপুর, মদনা, গাইদঘাট; জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর, ধোপাখালি, মনোহরপুর, খয়েরহুদা, সেনেরহুদা, বাঁকা ইত্যাদি গ্রামে এখনও ঐতিহ্যবাহী কাঁথা শেলাইয়ের প্রচলন আছে।

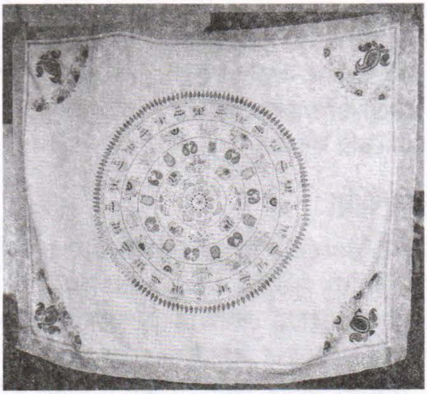

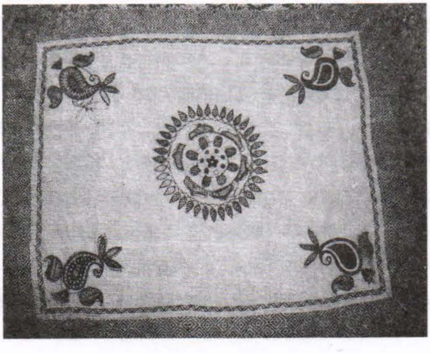

www.pathagar.com

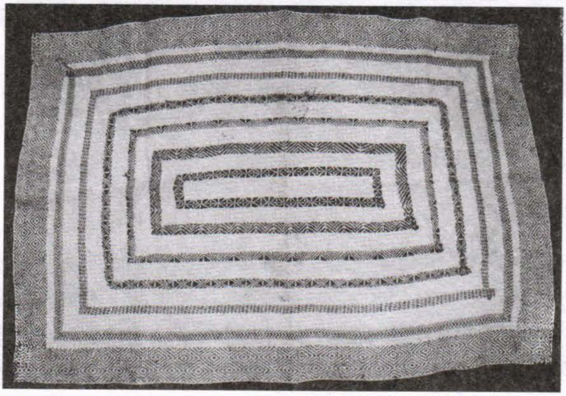

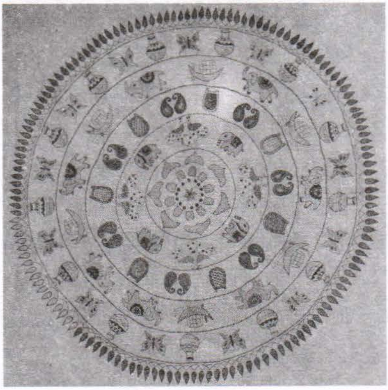

বিভিন্ন ধরনের কাঁথা

সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলায় বহু পরিবারে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে পুরুষানুক্রমে এক-দেড়শো বছরের পুরোনো শিল্পগুণ সমৃদ্ধ অপূর্ব নয়নাভিরাম নকশি কাঁথা বিশেষ যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে।

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা শহরের পোস্ট অফিস পাড়ার সাবিনা ইয়াসমিন [জন্ম : ১৯৫৮], জনাব রাশেদুল ইসলাম জোয়ার্দার [জন্ম : ১৯৪৮], মল্লিকপাড়ার ওয়ালিউল ইসলাম মালিক [জন্ম : ১৯৪৪], চুয়াডাঙ্গা ফার্মপাড়ার রুবি খাতুন [জন্ম : ১৯৫৫], চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মনোয়ারা খাতুন, [জন্ম : ১৯৫৬], ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোছাঃ চায়না খাতুন [জন্ম : ১৯৫৪], আলমডাঙ্গা উপজেলার তিওরবিলা গ্রামের শরিফা খাতুন [জন্ম : ১৯৭০]।

জ. ফুলকারি / সলমাজরির কাজ

সূচিশিল্পের একটি বিশেষ ধরন ফুলকারি বা সলমাজরির কাজ । সারাদেশের মতো চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলেও এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দক্ষ কারিগরেরা পাঞ্জাবি, শার্ট, বেডশিট, টেবিলের চাদর, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজসহ

www.pathagar.com

মেয়েদের প্রায় সবধরনের পোশাকে রুচিভেদে ফুলকারি বা ফুলবুটি, চিকনের নকশাদার ও অন্যান্য কাজের ব্যবহার দেখা যায়। মেয়েদের শাড়ি বা অন্যান্য পোশাকে নানা রঙের সলমাজুরি, চুমকি, পুঁতিদানাসহ এই জাতীয় বিভিন্ন উপাদানের শিল্পিত এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবহার অনেকেই পছন্দ করে থাকে। চুয়াডাঙ্গা এবং আলমডাঙ্গা শহরে সূচিশিল্পের এই কাজের দক্ষশিল্পী এবং কারিগর রয়েছে।

ঝ. আমসত্ত্ব

পাকা আমের রস দিয়ে আমসত্ত্ব তৈরি হয়। আমের মৌসুমে পাকা আম সহজে পাওয়া যায় বলে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আমসত্ত্বের জনপ্রিয়তা রয়েছে। পাকা আমের রস শুকনো কুলায় ঢেলে রোদের তাপে বা প্রয়োজনে চুলার সামান্য আঁচে শুকিয়ে নিলেই আমসত্ত্ব তৈরি হয়। প্রয়োজনবোধে আমের রসের সাথে সামান্য চিনিও মেশানো হয়। কুলায় রস ঢালার আগে আমসত্ত্ব যাতে কুলায় লেপ্টে না যায়, সেই জন্য ছোট পরিষ্কার ন্যাকড়ায় তেল মাখিয়ে কুলা মুছে নিতে হয়। প্রথম থেকে কুলায় অল্প করে রস দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। ভাল করে শুকিয়ে গেলে পরতে পরতে কয়েকবার আমের রস দিয়ে পছন্দ মত পুরু আমসত্ত্ব তৈরি করা যায়। আমের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে সারা বছর ভাতের সাথে দুধ ও আমসত্ত্ব আহারের মাত্রা পাল্টে দেয়। আমসত্ত্ব শুধুও খাওয়া যায়।

আমসত্ত্বের গায়ে হালকা তেলের প্রলেপ দিয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে ঢাকনাঅলা পাত্রে আমসত্ত্ব সংরক্ষণ করা যায়। তবে সারা বছর ভালভাবে সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া প্রয়োজন। আমসত্ত্ব ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রিয় খাদ্য।

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মনোয়ারা খাতুন, [জন্ম : ১৯৫৬]।

ঞ. বড়ি

বাঙালির খাদ্য তালিকায় বড়ি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নতুন কলাইয়ের ডাল এবং চাল কুমড়ো বড়ি তৈরির প্রধান উপকরণ।

তথ্যদাতা : চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মনোয়ারা খাতুন, [জন্ম : ১৯৫৬], দামুড়হুদা উপজেলার বাসতুপুর গ্রামের হায়দার আলি [জন্ম : ১৯৭৮]

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদের সবচেয়ে প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীমন্ত সওদাগরের পরিধেয় তিন খণ্ড ভদ্র পরিচ্ছদ সম্পর্কে –'একখান কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।' বাঙালিদের অভ্যাস ছিল নিত্য স্নান, পরার জন্য পরিষ্কার কাপড় আর মালিন্যহীন পরিচ্ছন্নতা। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে গত পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত গ্রামীণ সমাজে বাঙালি নারী পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা ছিল। পরনে ধুতি, গায়ে কাপড় বা শীতকালে চাদর এবং পাগড়ি ছিল পুরুষের সামাজিক ভদ্র পোশাক।

বিশ শতকের প্রথম দিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাকেও তেমন কোনো বিশেষ বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের সব বিষয়ের মতো সাধারণ মানুষের সাথে অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণির মানুষের সামর্থ ও রুচির তারতম্য দেখা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলমানদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে মধ্যে কিছু কিছু লুঙ্গির প্রচলন শুরু হয়। এ সময় রেঙ্গুন থেকে লুঙ্গি আমদানি হতো। একটু অবস্থা সম্পন্ন সৌখিন ব্যক্তিদের কাছে 'নয়ন সুখ' নামের সাদা মিহি সুতার এক রকম লুঙ্গির খুব কদর ছিল।

পেশাজীবী পুরুষেরা এক সময় অফিস আদালতে কোর্ট, প্যান্ট, চাপকান পরত। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চাপকান, রুমি টুপি এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ধুতি, প্যান্ট, চাপকান ব্যবহার করত। শীতকালে মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, শাল, আলোয়ান, দেশি চাদর ও খদ্দরের চাদর ব্যবহার করে থাকে। চুয়াডাঙ্গার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মহিলাদের প্রধান পোশাক শাড়ি। বর্তমানে শাড়ি ছাড়াও সালোয়ার, কামিজ, সেমিজসহ নানা ধরনের আধুনিক পোশাক পরে থাকে। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েরা শাড়ি বা সালোয়ার কামিজের উপর বোরখা পরার চল হয়েছে।

নানা নামের ও শ্রেণির শাড়ি স্থানীয় লোকজন ব্যবহার করে থাকে। শ্রেণি ভেদে এসব শাড়ির মূল্য কমবেশি হয়ে থাকে। পাড়ের বৈচিত্র্য ও নকশার ধরন অনুসারে শাড়ির নামের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন-গাছপেড়ে শাড়ি, ব্রিজপেড়ে শাড়ি, গোল্লাপেড়ে শাড়ি, হরতনপেড়ে শাড়ি, ক্রসপেড়ে শাড়ি ইত্যাদি। আবার পাড়ের সংখ্যার উপর ভিত্তি করেও কোনো কোনো শাড়ির নামকরণ করা হয়। যেমন-দুপেড়ে শাড়ি, পাঁচপেড়ে শাড়ি ইত্যাদি। শীতকালে গ্রামের মেয়েরা শাড়ির উপর একখণ্ড অতিরিক্ত কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখে।

বাঙালির পোশাক যুগে যুগে অনেক পাল্টেছে। বাংলাদেশে বসবাসরত এক সম্প্রদায়ের পোশাক অন্য সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। এক অঞ্চলের পোশাক অন্য অঞ্চলের পোশাকের ছাপ পড়েছে। এখন বিশ্বায়নের যুগে বাঙালির পোশাকেও বিশ্বমুখী ছাপ পড়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাঙালির চেহারা, পোশাক, বাকভঙ্গি এবং খাদ্যরুচি দিয়ে বাঙালিকে চিনে নেওয়া এখনও খুব কঠিন হবে না। চুয়াডাঙ্গা

www.pathagar.com

জেলার পেশাজীবীরা এখন কোর্ট, সার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি প্রভৃতি পোশাক পরে থাকে। মেয়েরা সালোয়ার, কামিজের পাশাপাশি, টি-শার্ট, ঘাঘরা ইত্যাদি আধুনিক পোশাকের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

অলংকার ও প্রসাধনী

বাঙালি মেয়েরা চিরকালই অলংকার প্রিয়। এ অঞ্চলের সর্বস্তরের মেয়েরাই কিছু না কিছু অলংকার পরিধান করে থাকে। তবে সাধারণ শ্রেণির মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের চেয়ে রূপা বা সিটিগোল্ডসহ নানা ধাতব অলংকার অধিক প্রচলিত। এসব অলংকার মস্তকের মধ্যমনি এবং কেশাগ্রভাগ থেকে শুরু করে পাদাঙ্গুলি পর্যন্ত রমণী অঙ্গের শোভাবর্ধন করে। প্রচলিত কিছু অলংকার হলো: ক্লিপ, টিকলি বা সিঁথেপাটি ইত্যাদি হলো মাথার অলংকার। এছাড়া রূপোর কাঁটা খোপা বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়। নানা ধরণের গলার অলংকার বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো-কেসলি, ধান তাবিজ, চন্দ্রহার প্রভৃতি প্রধান। ধান-তাবিজে ধানের মতো আকৃতির পাঁচ থেকে সাতটি পর্যন্ত তাবিজ থাকে যা সাধারণত সোনা বা পিতলের হতো। কানে সাধারণত কানমাকড়ি, কানপাশা, ঝুমকা, মাকড়ফুল ইত্যাদি গহনা পরে থাকে।

মাকড়ফুল হলো মাকড়শার জালের মতো ছোট ফুল বিশেষ। ঝুমকা দেখতে অনেকটা পলোর মতো। নাকের অলংকারের মধ্যে নাকফুলই প্রধান। এর নামের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন- ময়ুর, চাঁদতারা, বাবলাফুল, এস আকৃতির। এছাড়াও দুনাকের মাঝে ফুরফুরি, সিন্ধুবালা, বেশর বা বুলাক পরে থাকে।

হাতের অলংকারের মধ্যে কাঁটাবাজু, আমলেট, চুড়ি, চুড়, মোটা সোনপৌঁছি। লোহার খাড়ু, সধবা হিন্দু বয়স্ক মহিলারা ব্যবহারের কথা জানা যায়। স্বামীর মঙ্গলার্থে হিন্দু সধবা মেয়েরা আবহমানকাল থেকেই শাখা পরিধান করে থাকে। স্বর্ণাঙ্গুলি ছিল আঙ্গুলের অলংকার। উচ্চবিত্ত মেয়েরা সোনার অঙ্গুরি পরিধান করে। কোমরের অলংকার হলো বিছে, তারাহার যা সাধারণত রূপার তৈরি হয়ে থাকে। পায়ের অলংকার হিসেবে খারু, পঞ্চম, আঙ্গুটি বা চুটকি ব্যবহার করে। পুরুষের তেমন কোন অলংকারের প্রচলন কোনোকালেই ছিল না। তবে উচ্চবিত্ত বা অভিজাতদের মধ্যে অঙ্গুরি ও গলায় মালা পরতে দেখা যায়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তেমন কোনো প্রসাধনী ছিল না। হিন্দু বিবাহিত মেয়েরা সকলেই সিঁদুর পরতো। মেয়েরা চোখে কাজল, সুরমা এবং আলতা দিয়ে পা ও ঠোঁট রাঙাত। কপালে পরত সিঁদুর ও কাজলের টিপ।

চুল বাঁধার জন্য ছিল নানা রঙের ফিতা ও দোসি। খোঁপা বাঁধতে ব্যবহার করা হতো খোঁপার কাঁটা, সুতার তৈরি জালি ও বেড়-চিরুণী। হাড়ের তৈরি ধনুকের মতো বাঁকানো এটির গায়ে ছিদ্র থাকত যার ভেতর দিয়ে বেল কাঁটা ঢুকিয়ে খোঁপার সাথে গুঁজে দেয়া হতো। তেলের সাথে মোম গলিয়ে মাথার চুলের অগ্রভাগে লেপ্টে দেয়া হতো যাতে চুল এলামেলো না হয়। কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয় নারিকেলের তেল, কদুর তেল এবং করা হতো হাড়ের বা কাঠের চিরুণী দিয়ে। কেশ পরিষ্কারের জন্য মাটি, খৈল, কলার শুকনো বাকল পোড়ানো ছাই, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করত। পুরুষেরা চোখে সুরমা ও সুগন্ধি হিসেবে আতর ব্যবহার করত।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

চুয়াডাঙ্গা জেলার অধিবাসীগণের জীবনধারার মানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই জেলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯১.০৭ জন গ্রামে বাস করেন। গ্রামগুলো বাঁশঝাড়, আম, জাম, তাল, সুপারি এবং অন্যান্য গাছপালায় আচ্ছাদিত। গাছপালার এই আচ্ছাদন তাদের বসতভিটার বেড়া হিসেবে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করে।

এই জেলার গ্রামগুলো ঘনবসতিপূর্ণ। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি কাঁচা। তবে ইদানীং পাকা বাড়ির সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে। গ্রামের স্বচ্ছল পরিবারে চারটি বা তার অধিক ঘর দেখা যায়। একটি চতুর্ভুজ আকারের আঙিনা ঘিরে এসব ঘরের ভিটেগুলোর অবস্থান।

প্রতিটি বাড়ির সামনের দিকের ঘরটি বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার নেই এমন সব অতিথি-অভ্যাগতদের থাকার ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ঘরের একাংশ বাড়ির চাকর-বাকর, বয়ঃপ্রাপ্ত বা স্কুল-পড়ুয়া ছেলেরা এবং আশ্রয়প্রাপ্ত গৃহশিক্ষক বা মৌলভী প্রমুখরাও থাকেন। মাঝে-মাঝে গ্রামের এই ঘরে সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও পারিবারিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য ঘরগুলো বাড়ির অপরাপর সদস্যদের শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিবারের প্রধান বাড়িটির শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত ঘরটির অবস্থান বাড়ির কেন্দ্রস্থলে এবং সুনির্মিত, রান্নাঘর প্রায়ই শয়নকক্ষের সংলগ্ন। কখনো কখনো আবার পৃথক কুঁড়েঘরও রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাহির বাড়ি বা বৈঠকখানার পাশেই সাধারণত গোয়ালঘর থাকে। বাঁশের তৈরি ও কাদামাটিতে লেপা বাঁশের বেড়া ঘরের দেয়ালের কাজ করে। চালা তৈরি করা হয় ঢেউ টিন বা উলুখড়ে।

বাহির বাড়ির সম্মুখভাগের আঙ্গিনার বা ভেতর আঙিনায় নির্মিত গোলাঘরে ধান, অন্যান্য খাদ্যশস্য ও নানাপ্রকার কৃষিজাত দ্রবাদি রাখা হয়। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত বাঁশের খণ্ড দিয়ে বানানো একটিমাত্র শক্ত বেড়া দিয়ে তৈরি এবং মাটি থেকে প্রায় দুই ফুট উঁচুতে অবস্থিত ইটের থাম বা কাঠের গুঁড়ির ওপরে গোল বা চতুর্ভুজ আকারের গোলাঘরগুলো নির্মিত হয়। এ ঘরের ছাদও ঢেউ টিন বা খড়ের। গোলার ভেতরটা গোবর ও মাটি মিলিয়ে নিকানো। উপর দিকে অবস্থিত এবং নিরাপদ একটি ছোট দরজা দিয়ে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি গোলার ভেতরে বাহিরে আনা-নেওয়া করা হয়।

এই জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় গ্রামাঞ্চলেও সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে ইটের বাড়ি তুলনামূলকভাবে বেশি। এদের বাড়ির দুটি অংশ থাকে–ভেতর বাড়ি ও বাহির বাড়ি। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে বাড়ির চারদিকে– চারভিটার ঘর তৈরি করা হয়। এর ফলে বাড়ির সৌন্দর্যও বাড়ে।

অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে সাধারণত চার-পাঁচ হাত মাটি তুলে উঁচু করে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হয়। ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে একটি প্রবাদ খুবই প্রচলিত :

www.pathagar.com

'দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা
পূর্বদ্বারী তাহার প্রজা
উত্তরদ্বারীর মুখে ছাই
পশ্চিমদ্বারীর খাজনা নাই।'

এ জেলার সাধারণ অধিবাসীগণ কোনো নিয়ম মেনে বসতবাড়ি তৈরি করার সঙ্গতি রাখে না। তবে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় লাগালাগিভাবে ঘন বসতিও চোখে পড়ে। এঁরা ছন জাতীয় খড়ের তৈরি কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে।

আর্থিক অবস্থা যাদের সচ্ছল তাদের বাড়িতে শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, বৈঠকখানা, গোয়ালঘর এবং খড়ি ও ঢেকিঘর থাকে। এ জেলার পূর্বাঞ্চলে অবস্থাভেদে অধিকাংশ ঘরবাড়িতে বাঁশের খুঁটি ব্যবহার এবং বাঁশের চাটাই, পাটখড়ি, দরমা ইত্যাদি দ্বারা বেড়া তৈরি করা হয়।

সাধারণত মাটির দেয়াল তুলে তার উপর খড়ের চাল বসানো হয়। পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণ কৃষকের এই ধরনের ঘরগুলো ছোট ও নিচু হয় এবং বারান্দায় উঠতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়। তবে অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারে মজবুত করে করগেট টিন কাঠ কিংবা সম্ভব হলে ইটের ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়।

দৈন্যের ছাপ জেলাবাসিদের আসবাবপত্রে পরিস্ফুট। সাধারণ দরিদ্র লোকেরা ঘরের মেঝেতে পাটি/মাদুর বিছিয়ে শোয়। দরিদ্র লোকেরা অনেকে বাঁশের তৈরি মাচান বেঁধেও ঘুমায়। এদের আসবাবপত্র এবং তৈজসপত্র বলতে নিজের গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি কয়েকটি বাক্স, টুল, বেঞ্চি এবং মাটির তৈরি কলস, পাতিল, সরা ইত্যাদি।

হাল আমলে আর্থিক অবস্থাভেদে এলোমোনিয়ামের বাসন-কোসন, সস্তা দামের কাঁচের বাসন-কোসনও চোখে পড়ে। বিত্তশালী সচ্ছল কৃষক পরিবারে কাঠের তৈরি চৌকি, খাট/পালঙ্ক, আলনা, চেয়ার, টেবিল ব্যবহার করে।

চাষিদের প্রায় প্রতিটি পরিবারে শোবার ঘরেই বাঁশের মাচা তৈরি করে তাতে ধান, চাল ও গৃহস্থলির অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা হয়। অনেক সময় এসব মাচার খুটি মাটির তৈরি হয়। অধুনা জনসংখ্যা বিস্ফোরণজনিত চাপের মুখে চাষের জমির অভাব হওয়ায় এ জেলার জমিতে খড় বা ছন উৎপন্ন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

এ কারণে নিতান্ত দরিদ্র লোকেরা কুশার বা আখের পাতা, নদীর চরে উৎপন্ন কাশ এমনকি নারকেলের পাতা দ্বারা ঘরের চাল তৈরি করে। বর্তমানে বাঁশের দামও বেড়েছে এবং বাঁশও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এসব কারণে দরিদ্রগণের বাসগৃহ নির্মাণে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যান্য সঙ্গতিপন্ন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা, বিশেষত হিন্দু মধ্যবিত্তরা যেমন জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক ও অন্য অনেকে সাধারণত জমিদার ভবনের চারপাশে অথবা শহরে সুন্দর সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করতেন এবং নিজেদের আলাদা সমাজ গড়ে তুলতেন।

দরিদ্র কৃষক ও অপরাপর নিম্নবিত্ত জনসাধারণের বাড়িতে মাত্র দুটি কুঁড়েঘর। একটি বারান্দায় বৈঠকখানা এবং ভেতরে শয়নকক্ষ ও রান্নাঘর। দ্বিতীয়টি উক্ত ঘরের সামনে একটি আলাদা ঘরে বা একটি পৃথক চালার নিচে গরু-বাছুরের স্থান। ভূমিহীন,

www.pathagar.com

মজুর, গরীব, মেছো, বর্গাচাষী প্রভৃতি দরিদ্রতর অধিবাসীদের বাড়িতে একটি মাত্র কুঁড়েঘর। এতে একটি বারান্দা থাকে, যার একাংশ গরুর ঘর এবং অপর অংশ বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দরিদ্র অধিবাসীদের বাড়িতে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। কাঠ বা বাঁশের তৈরি মাচান হলো তাদের থাকার জায়গা। পিতল, কাঁসা, টিন ও এলোমিনিয়ামের লোটা পাত্র, থালা, বাটি ইত্যাদি এই জেলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে মাটির বা এলোমিনিয়ামের হাড়িতে রান্না হয় এবং পানি সংগ্রহের জন্য মাটির ঘড়া বা কলসি বেশি ব্যবহৃত হয়।

ধানভানার ঢেঁকি, যাঁতা ও কাঠের পিঁড়া প্রভৃতি প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা তক্তাপোষ, বেতের মোড়া, তোষক বা গদি, লেপ, মশারি এবং কাঠের সিন্দুক ব্যবহার করে। স্টিলের ট্রাঙ্কও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

দরিদ্ররা সাধারণত আলোর ব্যবহার কম করে, তারা মাটির প্রদীপ ও কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালায়। সচ্ছল ব্যক্তিরা কেরোসিন-ল্যাম্প ও হারিকেন ব্যবহার করে। মধ্যবিত্তরা কাঠের খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, আলনা এবং অন্যান্য ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করে। পিতল বা নিকেলের চামচও ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। বর্তমানে চীনা মাটির ও কাঁচের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপিত হওয়ায় মধ্যবিত্তরা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করছে।

একদা চুয়াডাঙ্গা জেলার মানুষ যৌথ পরিবারে বসবাস করত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসেছে চিন্তা-চেতনায়; দৈনন্দিন জীবনযাপনে। ফলে দ্রুত বাড়ছে একক পরিবারের সংখ্যা। অবস্থাপন্ন পরিবারে এই প্রবণতা বেশি। তবে গ্রামাঞ্চলের দিকে অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল পরিবারে এখনো যৌথভাবে বসবাস করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোক সংগীত

ক. বাউল গান

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোকসংগীতগুলোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাউল গান সবচেয়ে জনপ্রিয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার গ্রামাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল মতাদর্শের অনুসারীদের উদ্ভব। হিন্দু বৈষ্ণব ও মুসলিম সুফি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে দেহাশ্রয়ী সাধনা মিশে বাউল তত্ত্বের সৃষ্টি। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর এবং পাবনা এলাকায় এদের বেশি দেখা পাওয়া যায়। বাউল সাধু-গুর কাছে ভেক-খেলাফতের দীক্ষা নিয়ে বাউল হতে হয়, কেউ জন্মগতভাবে বাউল হয় না। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ভেকধারী এবং গৃহী এই দুই শ্রেণির বাউল রয়েছে। সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভেকধারী বাউলের সংখ্যা প্রায় ২৭৬ জন।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বাউলরা প্রধানত লালন শাহের ছেঁড়িয়ার ঘর, পাঞ্জু শাহের হরিশপুরের ঘর, উজল শাহ চৌধুরীর চৌধুরীর ঘর, মুচাই শাহের দরগাপাড়ার ঘর ও পাঁচু শাহের ঘোলদাঁড়ির ঘরের অনুসারী। এ ছাড়াও সতীমায়ের ঘর, দেলবার শাহের ঘর এবং বৈষ্ণবপন্থী কিছু অনুসারী এ অঞ্চলে আছে। তবে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোরসহ বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে লালনপন্থী বাউলদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাউল সমাজে বিভিন্ন ঘরের মধ্যে সাধন-ভজনে এবং ক্রিয়া-কলাপে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সাধুসঙ্গগুলোতে তাঁদের মিলিত হতে কোনো বাধা বা ভেদাভেদ নেই। জীবন-ভাবনা ও দর্শনে তাঁদের কাছে ঐক্য সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। 'জিন্দা দেহে মরার বসন' – কাফনের শাদা পোষাকই দীক্ষাপ্রাপ্ত লালনশাহী বাউলদের পরিধেয়। পুষদের পরনে সেলাই ছাড়া শাদা কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরে, গায়েও একই মাপের আরেক প্রস্থ শাদা কাপড় থাকে। অনেকে শাদা আলখাল্লা পরে। মহিলারা শাদা শাড়ি পরে এবং একপ্রস্থ শাদা কাপড় যা চাদরের মতো গায়ে দেয়। ভেকধারী বাউলদের কাঁধে থাকে ভিক্ষার ঝুলি এবং সে ঝুলিও শাদা কাপড়ের। ভেক-খেলাফতে দীক্ষা নেওয়ার পরপরই সমবেত বাউল সাধুগুদের সাথে আঁচলা-ঝোলাসহ মাধুকরী বা ভিক্ষায় বের হন। এই মাধুকরী বৃত্তি সাতটি বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকে। অল্পে তুষ্ট থাকার কঠোর ব্রত এই দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই শুরু হয়।

বাউল গান মূলত তত্ত্বমূলক গান এবং এই বাউল সম্প্রদায়েরই সাধনতত্ত্বের গান। অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার জন্য বাংলা লোকগীতির ক্ষেত্রে বাউল গানের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাউল গানের মধ্যে বাউল সাধকদের অধ্যাত্ম সাধনার রূপটি নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, কুবির গোঁসাই,

www.pathagar.com

গগন হরকরা প্রমুখ বাউল পদকর্তাগণ এবং পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরি শিষ্যসাধকবর্গ পাঁচু শাহ (১৮২–১৯২৮), অমূল্য শাহ (১৮৭৯-১৯৫২), শুকুর আলি শাহ (১৮৮২-১৯০৮), বেহাল শাহ (১৯০৪-৫.৯.১৯৮১), রুস্তম শাহ (১৯০৮-২০০০), ঝড়ু শাহ (২৪.২.১৯২৬ – ১৯৯৮), মতলেব শাহ (জন্ম : ১২.৬.১৯৩২-), খোদাবখশ শাহ (১৯২৮ – ১৯৯০) প্রমুখ চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বাউল সাধকরা তাঁদের আধ্যাত্মিক এবং দেহতাত্ত্বিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে অজস্র গান রচনা করে বাউল সংগীত-সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

লালন শাহের অন্যতম শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ এবং তাঁর শিষ্য খোদাবখশ শাহের অন্যতম উত্তরসুরী উচ্চাঙ্গ এবং রাগ সঙ্গীতে পারদর্শী অমূল্য শাহ সেতার, এস্রাজ, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতেও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বাউল সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে আলমডাঙ্গা অঞ্চলে অবস্থান করায়

কুবির গোঁসাই-এর গান

জন্ম : ১৭৮৭–মৃত্যু : ১৮৭৯, মধুপুর, জামজামি, আলমডাঙ্গা

১

জন্ম ছাঁদা নৌকা তার নাইক সাঁদা মারা
জল ঝরে বানে বানে নোনা বানে জীর্ণজরা
তাকে গাবকালি নাই কালা পাতি সৃষ্টিধরের গঠন করা ॥

মানব-তরীর ছিদ্র নটা টিপনে ফাঁসা মধ্যে ফাটা।
হায়রে জল উঠে ফোটা ঘোচেনা ভুলুক মারা
নায়ের ভগ্ন গুঁড়া ডালি পড়ো পেরাক নড়ো তক্তা চেরা ॥

বাঁকের গোঁড়ায় চোঁয়ায় পানি ছেঁচে মরি দিনরজনী
হায়রে গুঁজে দেই ছেঁড়া কানি তবু ডোবে ডহরা
জলে যায় রে ভেসে জলুই খসে দেখে হলাম দিশেহারা ॥

গড়ে ছিল কাটে কাটে পিলন কেটে পেরাক এঁটে
হায়রে জল উঠে রাস্তা ছুটে চারদিগেতে বয় ধারা
কুবির বলে চরণ ভেবে তরী ছেঁচতে ছেঁচতে হলাম সারা ॥

২

রসের ভিয়ান কর দেখিয়ে মন
রসে হবে নানা দিব্য উপার্জন।

সামনেতে দাওরে পেঁচে ঝিরিঝিরি সব পড়বে নিচে
পাটেতে রস যাবে চেঁছে হবে চিনির জন্ম পাকের কর্ম
ভাবী জনার সম্মিলন ॥

www.pathagar.com

জ্বেলে দাওরে তেউড়ি চুলা আর ভিতরে রসের খোলা
সাফ করবে গাদ মাটি ম'লা হবে চিনির পাকে মিছরি দানা
চর্বণ সুরস ভোজন ॥

ভিয়েন যদি করতে পারো রস মেরে রস খাঁটি কর
রসের পাত্র রসিক পুরো রসের ময়রা হয়ে দেখরে কুবির
গোঁসাই চরণের বচন ॥

পাঁচু শাহ-এর গান

১৮২৩–১৯২৮, ঘোলদাড়ি

১

মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে, হায়রে।
যে ধারার সঙ্গে আছে মানুষ, ধর সে ধারায় রে ॥

তিন শ ষাট রসের নদী বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদী
সেই নদীতে বাঁধ বাঁধিলে মানুষ ধরা যায় রে ॥

যখন নদীর হুমা ডাকে ঐহিক প'ড়ে বিষম পাঁকে
কামকুম্ভীরে এসে তাকে অমনি ধরে খায় রে ॥

রূপচাঁদ শাহ বলে পাঁচু বুদ্ধি তোর নাইরে কিছু
রসামৃত পান করিলে মৃত্যু হরণ হয় রে ॥

২

নেগা করে দেখ না নিগুম ঘরে।
অচিন মানুষ ঘুরছে কেবল সরল নদীর তীরে ॥

কামগু হয় প্রেম প্রতিমা তারে মাতৃজ্ঞানে কর ভজন।
হবে দুই আত্মায় এক উপাসনা দুই রূপেতে মিলবে একরূপ তারে ॥

কামগু যদি ক্ষীরোদ সাগর হয়
ভক্তি যোগে শক্তি জাগায় পার ঘাটে মুক্তি সে পায়।
পলকে মুদলে আঁখি দিয়ে ফাঁকি যাবে শূন্য করে ॥

পুষ প্রকৃতি দুই দরিয়া নারী ভজিবে ক্ষীরোদ দরিয়া
ক্ষীরোদ নদীর শাখা বাঁকা অচিন মানুষ ঘোরে ফেরে ॥

www.pathagar.com

যদি হবি নতুন নারী পুষকে বানা পটেশ্বরী
ফকির পাঁচু শাহ কয় মনের মানুষ সেই ঘরে ॥

তথ্যদাতা : আজিম শাহ [জন্ম : ১৯৬২],হেদায়েত শাহের খাতা থেকে সংগ্রহ। বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙগা, সংগ্রহের তারিখ : ১৫.২.২০১২

৩

সূর্যের সুসঙ্গে কমল কি রূপেতে যুগল হয়।
সে প্রেম সামান্যে কি জানা যায় ॥

সমুদ্রে নামিলে রে ভাই তারে পদ না ভিজায় ।
মায়ার সঙ্গে রবে মায়া পরশ না করিবে তায় ॥

কুম্ভীরে পতঙ্গ ধরে মাটির ঘরে লয়ে যায় ।
আল ডেমায়ে কায় চাপিয়ে আপন করে ছেড়ে দেয় ॥

যেদিন বাজিবে দুন্দুভি বাঁশি সেদিন শুনিবে ভাই।
যে জন মরিবে সেই সে যুগল চরণ পায় ॥

রূপচাঁদ শাহ বলে পাঁচু সে বড় রাগের করণ।
বাণে আর ধনুকে শিক্ষা হলেই হবে রণে জয় ॥

৪

আমার ভবে আসা মিথ্যা আশা কেবল আনাগোনা।
কেন গু পদে হয় না মতি কি করি বল না ॥

মনে বলে হেন কর্ম আর আমি করব না
আমার রিপু বাদী এই দুর্মতি ঘটায় কুঘটনা ॥

আমার কর্মদোষে কি ভুল ছিল কপালে তাই স'ল না
নইলে হতাম সোনা যেত জানা কলঙ্ক হত না ॥

পাঁচু বলে তোমার লীলা কে বোঝে ছলনা
মুর্শিদ রূপচাঁদ করো দয়া নিদয় হইও না ॥

তথ্যদাতা : জনাব নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৫০], গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা উপজেলা

www.pathagar.com

অমূল্য শাহ্-এর গান

১৮৭৯-১৯৫২ গু হরিচরণ গোঁসাই, আসাননগর, আলমডাঙ্গা

১

গুর চরণ বিনে কেরে, সহজ মানুষ পেতে পারে।
গুরূপে সহজ মানুষ, সংসারে চলে ফেরে ॥
দশ ইন্দ্রিয় ষড় রিপু, এরাই তোমায় করছে কাবু
খাচ্ছ তুমি হাবুডুবু, ভবে গু বিচার না করে ॥
গু বিশ্বাস যখন হবে, এরা সবাই শান্ত রবে
চরণ সুধা পান করিবে, থাকবে আনন্দ বিভোরে ॥
গু যাহার আছে সদয়, সমন বলে তার কিসের ভয়
হরিচরণ ভাবিয়ে কয়, অধীন অমূল্য রে ॥

২

মন তুই বুঝলি নারে খুঁজলি নারে পরশমণি সাধুর বাজারে।
কত লোহা হলো সোনা হাজার হাজারে ॥

সাধুর মুখে কৃষ্ণ-কথা অমৃত সমান
শুনিলে কাটিবে মায়া জুড়াবে পরান।

গয়া গঙ্গা তীর্থ যত তা হতে সাধু পবিত্র
প্রেমানন্দে পরশ মাত্র হৃদয় মাঝারে ॥

ভুজঙ্গের মস্তকে মণি রয়েছে ধরা
যে পেয়েছে সেই হয়েছে জ্যান্তে মরা ॥

উপসনার গহনা পরে বসে আছে রূপের ঘরে
হাকিম হয়ে হুকুম করে মদন রাজারে ॥

অমূল্য কয় হলে চিত্ত শুদ্ধ-সুধাময়
দেখতে পাবি সাধুর বাজার গুর বিদ্যালয় ॥

বসে আছে পাশাপাশি দুই আত্মা এক প্রকাশি
অধরে মধুর হাসি আহা মজারে ॥

তথ্যদাতা : আজিম শাহ [জন্ম : ১৯৬২],হেদায়েত শাহের খাতা থেকে সংগ্রহ। বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙগা,

সংগ্রহের তারিখ : ১৫.২.২০১২

www.pathagar.com

৩

গুর চরণ বিনে কেরে সহজ মানুষ পেতে পারে
গু রূপে সহজ মানুষ সংসারে চলে ফেরে ॥

দশ ইন্দ্রিয় ছয় রিপু এরা তোমায় করছে কাবু
খাচ্ছ তুমি হাবুডুবু গু বিশ্বাস না করে ॥

গু বিশ্বাস যখন হবে এরা সবাই শান্ত রবে
চরণ সুধা পান করিবে থাকবে অনন্ত ভবে রে ॥

গু যার আছে সদয় শমন ব'লে তার কিসের ভয়
হরিচরণ তারে কয় অধীন অমূল্য রে ॥

তথ্যদাতা : আসালদ্দিন ফকির [জন্ম : ১৯৪২], গ্রাম, রাধানগর চরপাড়া,
পো: মনোহরদিয়া, উপজেলা-জেলা কুষ্টিয়া,
সংগ্রহের স্থান : গোল বাগান, ফরিদপুর, আলমডাঙ্গা

শ্রীনাথ গোঁসাই-এর গান

সাধক শ্রীনাথ গোঁসাই [১৯২১–২০০৮] তত্ত্ব-জ্ঞানী বাউল গীতিকার। তাঁর জন্ম চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারনদের তীরে শ্রীরামপুর গ্রামে। পিতা- কালীচরণ বিশ্বাস। গুরু শ্রীহরিচরণ গোঁসাই, আসাননগর, আলমডাঙ্গা। তাঁর রচিত শতাধিক গানের সন্ধান মেলে। গানগুলো ভাব রসে পূর্ণ। তাঁর অসংখ্য শিষ্য রয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেছেন বলে জানা যায়।

১

সবাই বলে মুনাইবাবু হয়েছে মালদার ভাল
সোনার দরে শিশে কিনে পুঁজি-পাটা সবই গেল ॥

খরচ ওদিক নেইকো জমা বেহিসাবে হলি দেনা
বলতে কইতে হসনে কমা কুতর্কে তোর দিন যে গেল ॥

কিনলি সোনা তামা খেদে ফেল না কেন মুসা হদে
এসিডযোগে দগ্ধ করে কষ পাথরে কষ ফেল ॥

হারিয়ে ধন এত নাচন থাকলে কি না করতে রে মন
গোঁসাই হরির মধুর বচন শ্রীনাথের বোঝা দায় হল ॥

তথ্যদাতা : জনাব লতিফ শাহ [জন্ম : ১৯৫৬], গ্রাম: জাঁহাপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ৭.১০.২০১২

www.pathagar.com

২

গুরু যারে কৃপা করে
দিবসে দিবসে মানুষ দেখা যায় খোলা নজরে ॥

মানুষ মানুষ বর্ত জানগে তত্ত্ব মন্থন করে
অনন্ত রূপেতে মানুষ ত্রিজগতে ঘোরে ফেরে ॥

কাষ্ঠে আগুন পুষ্পে গন্ধ দুগ্ধে ঘৃত যে প্রকারে
বিরাজিত মানুষে মানুষ আধারে আর মূলাধারে ॥

কুতর্কে কুসঙ্গে রে মন কাল কাটালি জনম ভরে
গোঁসাই হরি বলে শ্রীনাথরে তুই মানুষ ভজে মানুষ হরে ॥

৩

ইন্দ্রিয় দমন আগে কর মন তবে হবেরে তোর মানুষের করণ।
কামাদি ছয় রিপুর বিকার প্রেমানল কর দহন ॥

ভাবাশ্রিত স্বাদ পরকিয়া রস রূপ
রসেতে বস হবে এ দেহ কাঞ্চন বরণ ॥

কর শত পাকে রতি সিদ্ধ সে মানুষ হবে বাধ্য
অধ: উর্ধ্ব ছাড়ি মণিকোঠা ধরি সামনে থাকবে দুজন ॥

প্রেমানন্দ মধুর রসে গোঁসাই হরি ডুবে ভাসে
শ্রীনাথ ঘোরে আশে পাশে হারা হয়ে দিশে
চোখ বাঁধা বলদ যেমন ॥

৪

গুরু যারে কৃপা করে
দিবসে দিব্য মানুষ দেখা যায়, খোলা নজরে ॥

মানুষে মানুষ বর্ত, জানগে তত্ত্ব মন্থন করে
অনন্ত রূপেতে মানুষ, ত্রিজগতে ঘোরে ফেরে ॥

কাষ্ঠে আগুন পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে ঘৃত যে প্রকারে,
বিরাজিত মানুষে মানুষ, আঁধারে আর আর মুলাধারে ॥

কুতর্কে কুসঙ্গে রে মন, কাল কাটালি জনম ভরে
গোঁসাই হরি বলে ওরে শ্রীনাথ, মানুষ ভজে মানুষ হরে ॥

www.pathagar.com

৫

না থাকলে ধন করলে যতন খুঁজলে সে ধন কোথায় মেলে
আমার দশা তায় মিথ্যে পাড়ায় ঘিরেছে ছয় পাগলে ॥

ভক্তি শূন্য কথায় দৈন্য আমার নাইকো ভাবের চিহ্ন
আমি পাপমতি হবে কি গতি তাই ভাবি অন্তিমকালে ॥

পুঁজিপাটা নাই বিনা সম্বলে দাও নাথ পুঁজি দিন যায় চলে
শূন্য করে তবিল ফেরার আমি হয়েছি আড়ৎদার
কি বলব নাথ ঘরে খরিদ্দার এলে ॥

গোঁসাই হরির বিল খাতাতে
শ্রীনাথের নাম কি আছে তাতে
তবে হয়ে প্রভু যদি রাজি দিতে পুঁজি
পেতাম প্রভুর কৃপা হলে ॥

তথ্যদাতা : জনাব ইউসুফ শাহ [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম : কালিদাস পুর, আলমডাঙ্গা। সংগ্রহের তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

শুকুর আলি শাহ-এর গান

১৮৬২-১৯০৮, হাতিভাঙা, মুক্তারপুর, দামুড়হুদা

সামলে যেও সিমলের ঘাটে পয়সা লাগবে না
মদন রাজার ঘাটে গেলে লাগবে রে নোনা ॥

নাটুদহের রাস্তা খাঁটি মনকে কর পরিপাটি
সামনে রতনপুরের কুঠি পুরাও মনের বাসনা ॥

মাখালের ফল দেখতে রাঙা তেমনি ধারা কার্পাসডাঙা
ডাঙায় ডাঙায় কানাইডাঙা ভুলে ওমন চাড়লে যেও না।
চাড়লে গেলে পড়বে ফেরে অধরচাঁদকে পাবে না ॥

চণ্ডীপুর আর কুড়ুলগাছি রাইসার বিলের পাশাপাশি
ধানঘড়ার মাঝামাঝি ও মন দরগা পীরের থানা ॥

সুবলপুরের তীরধারা বেসাবধানে যাবি মারা
হাতের কাছে পাটাচোরা হাত বাড়ালে পাবে না ॥

হাতিভাঙার শুকুর পাগল পাকে পাকে বাধাল গোল
হাজারি চাঁদ দয়ার সাগর তুমি নিদয় হইও না ॥

তথ্যদাতা: মহসিন আলি শাহ, [জন্ম : ১৯৪৮], মুক্তারপুর, দামুড়হুদা উপজেলা।
সংগ্রহের তারিখ : ১৮/৮/২০১৪

www.pathagar.com

বেহাল শাহ-এর গান

বেহাল শাহ ১৯৪০ সালে গৃহীত ফটো

বেহাল শাহ ১৯৬৮ সালে গৃহীত ফটো

বাউল শিল্পী ও গীতিকার বেহাল শাহের জন্ম কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আলচারা গ্রামে ১৯০৪ সালে। বাবা লালন ঘরানার সাধক ও শিল্পী বাহাদুর শাহ ও মা ময়না নেছা। ৭ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হলে নাগদহ গ্রামে খালার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। খালুজান লালন প্রশিষ্য ছমির শাহ তাঁর গু। ৩৫ বছর বয়সে বেহাল শাহ চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে এসে আখড়া গড়েন। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালা গানের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অসংখ্য মহতের প্রায় তিন হাজার গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাছাড়া তিনি নিজে ধুয়া গান লিখতেন এবং তা বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করে প্রশংসিত হন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা পাঁচশর অধিক। জীবিত অবস্থায় এই মরমী গীতিকার ও বাউল শিল্পীকে কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড 'বাউল শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ শুক্রবারে নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে নিজ বাসভবনের আখড়ায় তাঁর সমাধি আছে।

১

সাধন পথে কোন মতে বিঘ্ন বিনাশ হবে না।
গুর চরণ করলে স্মরণ ঘোচে সকল যন্ত্রণা ॥

অধর পদ্ম বলো থাকে সুষুম্নার আদ্য মূলে
গুহ্যের উর্ধ্বে মণিকোঠার অধভাগে
প্রথম চক্রে যায় জানা ॥

কুলকুণ্ডলীর আধার তাইতে নামটি হয় মূলাধার
অধঃমুখে সে রয় নিরন্তর
সাধকের উর্ধ্ব ভাগ তো উদয় হয় না ॥

ঐ পদ্মে লোহিত রূপে চার রঙে রয়েছে ঝেঁপে

www.pathagar.com

দরবেশ ছমিরচাঁদ কয়
অধম বেহাল তুমি ভেবে দেখো না ॥

২

কাজ কিরে তোর সেই দেশে।
যে দেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি বন্দি আছে ফন্দি ফাঁসে ॥

উর্ধ্ব দেশ সেখা নাই দেশাদেশ
অধঃ দেশ ভেসে যায় এক জোয়ার এসে ॥

অধঃদেশে অধঃকোটা উর্ধ্বদেশে উর্ধ্বকোটা
দোতলায় তার মণিকোঠা গন্তব্যে সে যাবে কিসে ॥

জ্বলছে বাতি দীপ্তাকার তবু কুয়ো ভারী অন্ধকার
সেখানে মুনী-মোহন্ত একাকার না পায় দিশে ॥

জন্মভূমি কর্ম-সাগর সেই যে নদীর বিষম গহ্বর
(করে) কত শত জাহাজ নোঙর জোয়ার এলে যায় ভেসে ॥

কার সাধ্য আছে পার হয়ে যায় মাঝ-দরিয়ায় গেলে খাবি খায়
চলে সে মীন সাগরে জোয়ার-ভাটা মাসে মাসে ॥

বেহালের মনে সদাই আশা উপাশ্রিত রূপ ভরসা
কবে হবে এমন দশা প্রাপ্তি হবে সেই দেশে ॥

আমার ঘুচলো নাকো দেশাদেশ গু ভক্তি হয় না লেশ
অশান্ত মন না পাই উদ্দেশ একা একা ভাবছি বসে ॥

৩

আমার মনের ব্যথা হৃদয়ে গাঁথা আছে
ব্যথা জানাবো কার কাছে ॥

ব্যথার ব্যথিত যে জন হবে বন্ধুর এনে দেখাইবে
আমার মনের বাঞ্ছা পুরাইবে যদি কালা আসে ॥

হৃদপিঞ্জিরার পোষা পাখি কোথায় গিয়ে বসলো সখি
একবার তারে দেখাও দেখি পাখি আছে কি মরেছে ॥

www.pathagar.com

বেহাল বলে ছমির পুতুল মজিয়ে গেল আমার দুকূল
এবার বুঝি ভাঙলরে ভুল সে ভুল শুধরে নিয়েছে ॥

১-৩ সংখক গান হেদায়েত শাহের [জন্ম : ১৩.২.১৯৩২-মৃত্যু : ২১.৭.২০১০] খাতা থেকে সংগ্রহ। গ্রাম: বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর, সংগ্রহের তারিখ: ২৩.১০.২০১২

৪

দ্বিদল পদ্মের ব্যাখ্যা কর ভাই আমি শুনতে চাই
অজ্ঞান নামক দ্বিদল পদ্ম কোন বর্ণে আছে কোথায় ॥
ঐ বর্ণে রয় কোন যোগিনী নামটি কি তাঁর বল শুনি
কি বর্ণেতে আছেন তিনি কি কার্য করছে তথায় ॥

ঐ পদ্ম কলিকা মাঝে কোন জনা সদা বিরাজে
সাধুগণে দেখে ভজে সেই জন্য চিত্ত স্থির হয় ॥

বলে ঘুচাও মনের ভ্রান্তি তবে জীবনে পাব শান্তি
ছমির চাঁদের চরণে স্থিতি বেহাল যেন সদা পায় ॥

জনাব নিয়ামত আলি মাস্টারের নিকট থেকে সংগ্রহ। [জন্ম : ১৯৫০],
গোবিন্দপুর আলমডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ : ৪.৫.২০১২

শুকচাঁদ শাহ-এর গান

১৯০৭-১৯৫০

শুকচাঁদ শাহ লালনের তৃতীয় প্রজন্মের শিষ্য। লালন শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ, তাঁর শিষ্য হরিয়ারঘাটার খোদাবখশ শাহ – শুকচাঁদ শাহ তাঁই শিষ্য। গুরু পরম্পরাক্রমে তিনি মনিরুদ্দিন শাহের লেখা লালনের গানের ৬টি খাতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে আখড়া করে বসবাস করতেন। চুয়াডাঙ্গার সন্নিকটে গোপীনাথপুর গ্রামে শিষ্য জাঁহাবখশ ফকিরের [জন্ম : ১৯২২, মৃত্যু : ১৯৯২] বাড়িতে এসে শুকচাঁদ শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানেই ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। গোপীনাথপুরে তাঁর কবর আছে। লালনের অনুসারী সমাজে শুকচাঁদ শাহের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

১

জান গা আগে মানুষের বেনা
মানুষ নাই জাতের বালাই
    মানুষ ভজনে যায়রে জানা ॥

বাউল-সাধক শুকচাঁদ শাহ'র সমাধি গোপীনাথপুর গ্রামে। তারিখ : ২৪.০৯.২০১২

২

গুতত্ত্ব জানরে আগে মন।
জানলে পরে মরণ হবে
পালায়রে শমন ॥

রুস্তম শাহ-এর গান

জন্ম : ১৯০৮, কুমারী, হারদী, আলমডাঙ্গা, মৃত্যু : ২৫ আগস্ট ২০০০, বড় শলুয়া , চুয়াডাঙ্গা । গুরু : দয়ালচাঁদ, রাজবাড়ি

রুস্তম শাহ

রুস্তম শাহর জন্ম ১৯০৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার কুমারী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম করিমবখশ এবং মায়ের নাম ছবিরননেছা বিবি। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ায় তাঁর শিশুকাল কেটেছে খুবই দুখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে। তিনি লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পাননি। অন্যের গরু

www.pathagar.com

চরিয়ে এবং লোকের ক্ষেতে কাজ করে নিজের চেষ্টায় রাতে কারো কারো কাছে সামান্য বাংলা লেখা পড়া শিখেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই রুস্তম শাহ লোক সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সাথেই ভিড়ে যান। ১৫/১৬ বছর বয়সে বাউল সাধকদের সাথে মেশা শুরু করেন। এক সময় রাজবাড়ির দয়ালচাঁদ নামে এক বাউল সাধকের সঙ্গী হয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁর কাছ থেকেই রুস্তম শাহ বাউল সাধনার দীক্ষা নেন।

১৯৪৩ সনে বাংলাব্যাপী মন্বন্তরের সময় জীবন বাঁচাতে তিনি বৃহত্তর নদিয়া জেলার কল্যাণী অঞ্চলে চলে যান। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে বাউল সঙ্গী-সাথীদের সাথে বড় সলুয়ায় এসে থিতু হন।

রুস্তম শাহের নিজের লেখা ২০০-র বেশি গান আছে। ২৫ আগস্ট ২০০০ সালে বড় সলুয়ার নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁর মাজার আছে। রুস্তম শাহ সম্পর্কে তথ্যাদি এবং গানগুলি তাঁর কন্যা মোছাঃ চায়না খাতুনের [বয়স: ৫৮, গ্রাম: ছয়ঘরিয়া, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা] নিকটে সংরক্ষিত খাতা থেকে সংগৃহীত।

১

লা ইলাহা ইল্লালাহ বলে ডাকরে আমার মন
জিন্দা থেকে না ডাকিলে ডাকবি রে কখন ॥

লা ইলাহা নাম সার কর ইল্ললারে ধর চিনে ধর
নুরে তাজিল্লা দেখবিরে তার বাহির ভিতর হবে রওশন ॥

জলের ভিতর আছে কত কল তাইতে জগৎ হয় চলাচল
ইঞ্জিনের পর ড্রাইভার বসে চালায় সে মনের মতন ॥

দয়ালচাঁদ কয় রুস্তম এমন মিছে কাজে করিস ভ্রমণ
ঘরে বসে সাধন ভজন গু নামটি কর স্মরণ ॥

২

কামে প্রেমে যুক্ত হলে হবে তোমার উপাসনা
কাম ছাড়া প্রেম সাধলে পরে সঙ্গী তোমার কেউ হবে না ॥

কাম থেকে হয় প্রেম উৎপত্তি কাম ছাড়া প্রেম না পায় গতি
কামে প্রেমে না হলে সতী তার সন্ধান কেউ পাবে না ॥

সে প্রেমের এমন ধারা লাইলি যেমন মজনু হারা
ফাঁকে ফাঁকে থাকে তারা প্রেম সেধেছে ওই দুইজনা ॥

রুস্তম বলে কিবা করি প্রেমের সারি কেমনে ধরি
যত দেখি ভেদ বিচারি বেদ হয় প্রেমের শেষ ঠিকানা ॥

www.pathagar.com

৩

না জেনে মানুষ তত্ত্ব যে জন মক্কায় হজে যায়
এই মানুষ তত্ত্ব যে জেনেছে ঘরে বসে হজ সে পায় ॥

কামেল মুরশিদ যে ধরেছে দিল মক্কার ভেদ সেই পেয়েছে
হজের কর্ম তার হয়েছে দরবেশ লোকে বলে তায় ॥

মক্কার ঘরে আছে পাথর তাই দেখে মন হলো কাতর
কুরবানি তুই দিবি যত ততই খোদা রাজি হয় ॥

দয়াল বলে রুস্তম হাজি হলিনে তুই কাজের কাজি
আমি দেখিরে তোর স্বভাব পাজি গেলি না মন মদিনায় ॥

৪

বলো গুরু সত্য করে কার ঘরে কে বসত করে
আমি ধরি ধরি মনে করি কি দিয়ে ধরি তারে ॥

আগুন পানি হইলে মিলন হাওয়া মটি এই চারজন
কোথায় আছে সাঁই নিরঞ্জণ খুঁজে না পাই ত্রিসংসারে ॥

দয়ালচাঁদের দয়া হলে যাই দয়ালের সঙ্গে চলে
টেনে যেন দিও না ফেলে রব না আর ভাঙা ঘরে ॥

রুস্তম বলে কাতর দিলে দেশ ছেড়ে যাই কোথায় চলে
গুরু যদি নেন আমারে রাখব চরণ মাথায় করে ॥

৫

ওরে শুকপাখি তোর সুখের সীমা নাই।
তুই সুখে সুখে সুখে দিন কাটালি
দুখের ভাবনা ভাবলি না ॥

যেদিন পাখি উড়ে যাবি এ সুখের খাঁচা কারে দিবি।
কার খাঁচায় তুই আবার যাবি আগে কেন বললি না ॥

ও পাখি অসময়ের কথা শুনে কান্নাকাটি করিস কেনে
খাঁচা ফেলে যাবি চলে আমি বুঝেও বুঝি না ॥

তুই এমন নিঠুর পাখি তোরে দেখে জুড়াই আঁখি
রুস্তম বলে দিয়ে ফাঁকি আমায় ফেলে যেও না ॥ [৯৯]

www.pathagar.com

৬

মন কেন তোর ছুটে গেল মেঘনা নদীর জলে
ভেবে বুঝে দেখলি নারে কি আছে তোর কপালে ॥

মেঘনার জলে জাহাজ চলে চালায় সব ইঞ্জিনের বলে
তেল মবিল পেট্রোল দিয়ে সারেং বসে রয় হালে ॥
সেই জলে কামকুম্ভীর আছে চলে লঞ্চের আগে পাছে
প্যাসেঞ্জার পেলে পরে অমনি তাদের নেয় তুলে ॥

সেই নদীতে গভীর পানি জীবের জীবন নিয়ে টানাটানি
রুস্তম বলে আমি জানি দয়াল আমায় নাও তুলে ॥

৭

মুনা ভাই নদী বেয়ে কোনো বা দেশে যাই
আমি উজান নাকি ভাটি যাব এ কথা কারে শুধাই ॥

তিনটি নদীর এক মোহনা নদীর তুফান দেখে ভয়ে বাঁচি না
এখন কোন সাধন সাধলে পরে নদীর তুফান থেমে যায় ॥

ভবে এসে বেড়ায় ভেসে কুল-কিনারা কে দেয় এসে
দেখলাম আমি অবশেষে গু বিনা বন্ধু নাই ॥

কেউ বলে নদীর জলে ধরব মাছ শাঙলে জালে
রুস্তম বলে কটক মাছে জালের বহর কেটে দেয় ॥

তথ্যদাতা : মোছাঃ চায়না খাতুন [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রামঃ ছয়ঘরিয়া, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা। সংগ্রহের তারিখ : ৩১.০৮.২০১২।

কার্তিক চন্দ্র-এর গান

জন্মস্থান গ্রাম লক্ষ্মীপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। গু- নিত্যগোপাল গোস্বামী এবং দাদাগু- রাখালচন্দ্র। তাঁর স্বল্প সংখ্যক গানের সন্ধান পাওয়া যায়।

দুগ্ধ তুমি ধন্য এ সংসারে
আমি তোমারি তুলনা কি দেব বলনা অতি সুখাদ্য বলে জীব গণ্য করে ॥

তোমাতে যদি কেউ না মেশায় নীর জ্বাল দিলে হও তুমি সুমধুর ক্ষীর
তুমি কখনও যাও হাটে কখনও হোটেলে কখনও যাও পাল কুরীর ঘরে ॥

জীব না জন্মাইতে মা নিজ বক্ষেতে ধারণ করে তোমায় সুধা রূপেতে
যার এক ফোঁটা পানে আনন্দ পায় মনে দেখনা ভেবে এই ভব সংসারে ॥

www.pathagar.com

তুমি আফিম খোরের বাঁচাও জীবন তোমা বিহনে সে হেরে চৌদ্দ ভুবন
তুমি দুর্বলেরই বল শিশুর সম্বল অধীন কার্ত্তিকচন্দ্র কয় বিনয় করে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২।

অজিত গোঁসাই-এর গান

জন্ম : ৩১.৩.১৯২৩ – মৃত্যু ২০০৩], গ্রাম: জেহালা, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

ওরে অধম মিলবে সুভাব গুরুর চরণ ভজিলে।
(আর) গুরুর চরণ অমৃত ধন মিলবে শুধু সাধন বলে ॥

গুরু যার কাণ্ডারী আছে ভবে গোণা-পড়া তার সব মিছে
পা ফেলে সে বেছে বেছে যোগ সাধন বলে ॥

গুরু বাক্যে যে জন চলে দয়াময়ের আশিস মেলে
গুরু বাক্য যে জন ভজে সব যাতনা যায় সে ভুলে ॥

মন রথের আশা ঘোড়া গুরু করলে আছে জোড়া
অজিতের খুব তাড়াহুড়া ঢেলে ফেলে নিমাইকে ভুলে ॥

জেহালা, মুন্সীগঞ্জ বাজারে অজিত গোঁসাইয়ের নিকট থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

গোলাম ঝড়ু শাহ-এর গান

জন্ম : **২৪.২.১৯২৬**, আলোকদিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মৃত্যু : যাদবপুর মেহেরপুর, **১০.৩.১৯৯৮**

১৯৭৮ সালে ২য় স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মেহেরপুরের যাদবপুরের কলিমুদ্দিন শাহের আখড়ায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

১

চেনা নদীতে ভাসাও তরী ও মন নাইওরী।
প্রেম নদীতে জন্মায় সোনা কাম নদীতে দিয়ে হানা
নইলে তুমি কূল পাবানা থেকো হুশিয়ারী ॥
চেনা জানা নদী হলে বেয়ে যায় অবহেলে
অবশ্য দিতে পারে পাড়ি ॥

নেহার রেখো নদী ফসল বাণিজ্যেতে হবে সফল
দেনা-পাওনায় রেখো খেয়াল আছে ছয়জন জুয়োচুরি ॥

রূপসা আর শিবসা নদী আড়মংলা বিষমভেদী
কত জাহাজ লঞ্চ গেছে মারা পড়ি ॥

সামনে নদী সমুদ্র মিলন হচ্ছে সুনাই-ভদ্র
জোয়ার খাতে মিলন সত্য বলছি বিনয় করি ॥

সামান্য নদী যদি ভেবে নাহি জেনে ঝম্প দেবে
কামটে করবে গেরেফতারি ॥

দীন ঝড়ু সেথায় গিয়েছিল কত রূপলীলা দেখতে পেল
দেখে শুনে ফিরে এল গুর আজ্ঞা শিরে ধরি ॥

২

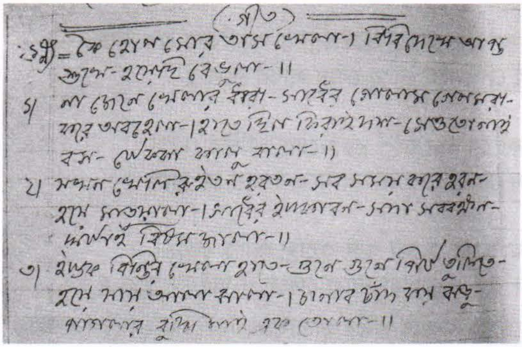

গোলাম ঝড়- শাহের নিজের হাতে লেখা গান

কই হলো মোর তাসখেলা
বিবি দেখে আপ্তসুখে হয়েছি বেভুলা ॥

না জেনে খেলার ধারা সাধের গোলাম গেল মারা করে অবহেলা
হাতে ছিল ফিরাই দশ সেও তো নাই বশ টেক্কা কালুবালা ॥

যখন খেলি ইতন হরতন সব সময় করে হরণ হয়ে মাতুয়ালা ॥
সাধের ইসকাপন সদা সর্বক্ষণ ঘটায় বিষম জ্বালা ॥

ইস্তক বিন্তির খেলা হাতে গুণে গুণে পিট তুলিতে
প্রাণ হয়ে যায় আলাজালা॥
জনাব চাঁদ কয় ঝড়ু পাগলার বুদ্ধি নাই এক তোলা ॥

গান দুটি গোলাম ঝড়ু শাহের নিকট থেকে নিজস্ব সংগৃহ। যাদবপুর, মেহেরপুর

www.pathagar.com

হেদায়েত শাহ্-এর গান

[জন্ম : ১৩.২.১৯৩২– মৃত্যু ২১.৭.২০১০], বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙগা

আমি কেন বা এলাম এই ভবের হাটে
আমি হারালাম সব পুঁজি-পাটা
কাম ক্রোধাদির সঙ্গে জুটে ॥

হাট বসালাম শনির শেষে
মঙ্গল এসে বসল পাশে
পেলাম না বাজারের দিশে
তাই বৃহস্পতি যায় অস্তপাটে ॥

যদি সহায় হতো চিন্তামনি
তবে উদয় হতো দিনমনি
করণ-কারণ হতো সিদ্ধি
সুফল ফলত এই ললাটে ॥

হাতে পেয়ে অমূল্য ধন
রাখতে নারি দিলাম বিসর্জন
দরবেশ খোদা বখশের দুটি চরণ
হেদায়েত কি পাবে ঘোর সংকটে ॥

তথ্যদাতা : আজিম শাহ, [জন্ম : ১৯৬২], বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ ১৫. ২. ২০১২

মতলেব শাহ্-এর গান

মোর্তজাপুর, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা

১

নিজ পরিচয় যার হয়েছে সে চিনেছে সেই জনা।
আসল মানুষ এই ভবেতে আছে বলো কয় জনা ॥

যে হরিণের কস্তুরী হয় মনের মতন তখন সে দৌড়ায়
নাসিকায় তার গন্ধ ছড়ায় বাড়ে মনের যাতনা ॥

আপন কাঁধে লাঙল থুয়ে খুঁজে মরে মাঠে যেয়ে
নিকটের ধন না চিনে সে পরের খোঁজে গুণপনা ॥

আপন দেহে আছে রে ধন সময় থাকতে থির করো মন
তোরাব সাঁই কয় মতলেব এখন হলিরে তুই দিন কানা ॥

www.pathagar.com

২

গুরু রূপে নয়ন দিয়াছে সে কি বসে রইতে পারে।
সকল জ্বালা দূরে ফেলে মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ॥

হারা হলে যার পরান কান্দে ভোলে না সে পরনিন্দে
পড়ে না সে কোন ফান্দে ছোঁবে না তার বিষয় বিষে
থাকে সদাই রূপ নিহারে ॥

গু রূপে আলজিভের ঘরে অন্তর্মন যার রয় যে ভরে
গু বাক্য যার অন্তরে সে সদাই ঐ রূপ নিহার করে ॥

আত্মসমর্পণ যে জন করে জিন্দা মরা সেই তো মরে
তোরাব সাঁই কয় আপন মনে মতলেব তুই ভেবে দেখরে ॥

মতলেব শাহের নিকট থেকে সংগৃহীত। [জন্ম : ১২.৬.১৯৩২], মোর্তজাপুর, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ : ৮.৮.২০১২

দুলাল শাহ, ১৯২৫-১৯৮৫, ফরিদপুর বেলগাছি, আলমডাঙ্গা

দুলাল শাহের জন্ম চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে। পিতা এবং দীক্ষাগু বাউল সাধক বনমালী শাহ। তিনি একাধারে বাউল শিল্পী ও গীতিকার। তিনি বেহালা বাজিয়ে গান করতেন। দুলাল শাহের রচিত গানের সংখ্যা সাড়ে চারশরও অধিক। ফরিদপুর গ্রামে তাঁর বাবার কবরের পাশে তাঁর মাজার আছে।

১

ঘর বেঁধে কি থাকবি ঘরে চিরদিন
ও তার অনলকোঠায় আগুন জ্বলে
দিনে দিনে হবিরে ক্ষীণ ॥

আটকুঠুরি নয় দরজা ঘরে
রূপ সনাতন রূপের কিরণ সেথায় বিরাজ করে
তারে ধরতে হলে কল-কৌশলে হবিরে গুর অধীন ॥

আঠারো মোকাম চৌদ্দতলা
তার ভেতরে মণিকোঠায় আছে বাতি জ্বালা
তাতে নিরিখ দিলে অবহেলে দেখবিরে সেই অচিনের চিন ॥

দশ ইন্দ্রিয় ছয় রিপু ঘরে বিনা করে বসত করে দেখি নাই তারে
তারে ধরবি যদি নিরবধি উপসনায় হবি স্বাধীন ॥

www.pathagar.com

ঘরে চন্দ্র-সূর্য উদয়-অস্ত যায় যোগ জোয়ারে অমাবস্যায়
পূর্ণিমায় হয় উদয় দ্বিদলেতে হেলেদুলে ভেবে কয় দুলালউদ্দিন ॥

২

কেন বাঁশি নিরলে বসি ডাকলিরে নাম ধরিয়া
ও তুই অবলার প্রাণ করে হরণ না চাইলি বারেক ফিরিয়া ॥

যার তরে হয়ে হারা হলাম এ গৃহ ছাড়া গেল না মোরে দেখিয়া
আমি একাকিনী দীন-দুখিনী কত রব পথ চাহিয়া ॥

মনচোরা বলো নাম হরে নিলে দুখিনীর প্রাণ সুজন সেজে বুকে বসিয়া ॥
সেই সুজনারে পেলে তারে দিতাম বাঁশি চুরিয়া ॥

দুলাল শুধু একা নয় জগৎ বাঁশি তারই আশায় আছেরে চাহিয়া
ওরে কারে হাসায় আর কারে কাঁদায় বলতে নারে বিবরিয়া ॥

৩

কেন বা তারে প্রাণ সঁপিলাম সখিরে কালার বাঁশির গানে
ও সে বাঁশির সুরে মন কেড়ে নেয় আর সহে না এ প্রাণে ॥

বাজায় বাঁশি যমুনার কূলে মন উচাটন ঘরের কলস কাঁখে নেয় তুলে
আমি জল ভরিতে যাই সে পথে জল ভরিতে নাই মনে ॥

ছয় ছিদ্র তার ছয়টি রাগে ছত্রিশ রাগিনী আপনি জাগে
(সখিরে) শুনলে পরাণ সেই বিরাগে ছুটে যাই যমুনা পানে ॥

দুলাল বলে কালার বাঁশিতে অবলারে পাগল করে উঠাইল পথে
খুঁজি যারে পাই না তারে একা ঘরে রই কেমনে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

তারাচাঁদ শাহ

তারাচাঁদ শাহের জন্ম ১৯২৭ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কেদারনগর গ্রামে। গু বেহাল শাহ। যৌবনে তিনি পালা গানের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দুরারোগ্য হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৫ বছর বয়সে বর্তমানে শয্যাশায়ী। তিনি কিছু ভাবসঙ্গীত রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

আমি ভুল করেছি লাঙল চষে
অসময়ে করে কৃষি পাপ ঘাসে খেল চুষে ॥

বিরকিনি আর শামা কেশে পানি পেয়ে উঠল ভেসে
না চিনে বিদেরি জো এখন মলাম নিড়েন ঠেসে ॥

তারাচাঁদ কেঁদে বলে সাধু গুর চরণতলে
বেহাল সাঁইজির চরণ ভুলে হাঁপায় জমির কুনায় বসে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

দিদার শাহ্-এর গান

বাউল গীতিকার ও গায়ক দিদার শাহের জন্ম ১৯২৮ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বকসীপুর গ্রামে। পিতা মৃত বিলায়েত আলী। গু বনমালী শাহ। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা একশর অধিক। বর্তমানে সাধুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। বাদেমাজু গ্রামে আখড়াবাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করছেন।

মেয়ে জগৎ জোড়া
মেয়ে দুষে মরবি তোরা খেতে হবে কচু পোড়া ॥

মেয়ে হলো ভবের রাজা তুমি তার হয়ে প্রজা
খাচ্ছ বসে পাচ্ছ মজা আছে কত সাজা
মড়ির লোভে শকুন যেমন বচ্ছ ভূতের বোঝা
মেয়ের চরণ না ভজলে পাবিনে ধর্মের গোড়া ॥

ও ভাই মেয়ে হলো চার জাতি খোঁজ তুমি দিবারাতি
হস্তিনী আর শঙ্খিনী পদ্মিনী আর চিন্তামনি
মন্দ বলে ভালকে দোষো হবে তোমার ক্ষতি
মেয়ের মন পেতে হলে কাটো মানের গোড়া ॥

মেয়ের আছে চারগুণ ভালো মন্দ আর একটি গুণ
আর একটি প্রেমের ধারা সাঁই বনমালীর চরণ ভুলে ভাবছে দিদার ছোঁড়া
এধার ওধার ঘুরে ম'ল পেলনা ধর্মের গোড়া ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

www.pathagar.com

ইউনুস শাহ (উদাস বাউল)-এর গান

ইউনুস শাহের জন্ম ১৯৪৫ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচলিয়া গ্রামে। উদাস বাউল ছদ্মনামে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। পিতা মৃত খোদা বখশ। জাঁহাপুরের বাউল সাধক খোদা বখশ শাহ তাঁর গু। তিনি একাধারে বাউল শিল্পী ও গীতিকার। তিনি ২০০০ সালে দেহ ত্যাগ করেছেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা চারশর বেশি। তাঁর অন্যতম শিষ্য ইউসুফ শাহের নিকট থেকে গানগুলো সংগৃহীত।

১

উঠে সাত সকালে খালে বিলে মরলিরে হুঁচা ঠেলে
মাছ ধরবিরে ছলে-বলে উজোনের খালে ॥

একেতো ছিঁড়াছুটো জাল তাতে মাছেরই আকাল
মাছ ধরে তো পেট বাঁচে না গিন্নী রয় বদ হালে
হুঁচা ঠেলে খুকসি মেলে বিষ বেদনায় মরি বেহালে ॥

আছে চিংড়ি তিতপুঁটি কথা কই মোটামুটি
পুঁটি হলেই হয় না পুঁটি নামে সরপুঁটি
ধেপো খলসে ভেদা আলসে জোটে মিন্‌সে তোর কপালে ॥

একে তো অমাবস্যার দিন মাছ ধরবিরে তিনদিন
তিন দিনে না হলে পরে জানবিরে কু-দিন
ইউনুসের যায় না কু-দিন ওরে সুদিন হবে কোন কালে ॥

২

পাঁচকানার এক উর্ধ্বে ঘর নিচেয় দরজা
রয়না পানি দিন রজনী তার বিন্দু খেলে কি মজা ॥

বিন্দুতে সিন্ধু হয় আকার আবার উজোনে বয় জোয়ার
নামলে নিচে না পায় তড়া যে না জানে সাঁতার
ঘরের চতুর্দ্বারে ঘুরে মরে আপনি পায় আপন সাজা ॥

ঘরের চারি কোণেতে বায়ুর শক্তির জোরেতে
উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম ঘুরায় ঠিক মতে
তার মধ্যিখানে সিংহাসনে বসে আছে মদন রাজা ॥

ঘরের উপর দিকে তিনটি নল একমুখে
উদাস বলে সামলে যেও ওরে হাড়পেকে
শুধু কপাট ফেলে ঘরে গেলেই একজনকে চিনগে যা ॥

www.pathagar.com

৩

সত্যধর্মের বাতাসা দরগাতলাতে
এই লুটুরে-পুটুরে না পারে হাঁটিতে
কর জাতি রক্ষা পায় যাহাতে ॥

হিন্দু কি মুসলমান সবে খ্রিস্ট কি বৌদ্ধ হবে
যাগ-যজ্ঞ ব্রত মেনে লবে বিধি অনুসারেতে ॥

সর্ব জাতির দয়াময় আকার চিহ্ন কিছুই নাই
কি করে সিন্নি খায় লোক সমাজেতে ॥

অহিংসা পরমধর্ম এই জাতির শ্রেষ্ঠ কর্ম
উদাস কয় জানলে মর্ম প্রমাণ বস্তুতে ॥

৪

হরি নাম যত্ন করে হৃদয় মাঝে রাখরে মন
ও নাম সদর করলে হারিয়ে যাবে হরি বলা অকারণ ॥

নিস হরিনাম করে খাঁটি হিংসা নিন্দা করে মাটি
হবা নিজ বেগারী পরিপাটি পাবা হরির দরশন ॥

হরির সঙ্গে কর যদি ভাব দিওনা নাকো কথার জবাব
থাকবে না আর পারের অভাব গোলকপুরে হয় গমন ॥

লোক দেখা এ হরি বলা ভজন সাধন হবে ধুলা
কেন রঙ মাখা এ মালা ঝুলা গলায় রাখ কি কারণ ॥

উদাসের মন সদা ভুলা তাই হলো না হরি বলা
হরি দিয়েছে মোর শতেক জ্বালা তাই হল মতিভ্রম ॥

তথ্যদাতা : জনাব ইউসুফ শাহ [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম: কালিদাসপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা।
সংগ্রহের তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

আবুবক্কর শাহ (বাক্কা ফকির)-এর গান

১৯৫২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার এরশাদপুর গ্রামে আবুবক্কর শাহের জন্ম। স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি বাক্কা ফকির নামে পরিচিত। তাঁর গু দিদার শাহ। তিনি একাধারে শিল্পী ও গীতিকার। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা একশ পঞ্চাশটির অধিক।

মন মানুষের কররে করণ জেনে শুনে
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ প্রত্যক্ষ হয় মনে ॥

www.pathagar.com

তিনে নেত্র আদি অন্ত বেদ-বেদান্ত লও জেনে
চারি বেদে করেছে হৃদপদ্মে পাবি যেয়ে তিনে ॥

পাঁচে পঞ্চবান জানো তার বিধান আছে পঞ্চগুণে
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে থরে থরে রিপু ছয় গুণে ॥

সাত সাগরের জল করছে টলমল প্রবল বৃন্দাবনে
কাটিলে অক্টোপাস পাবি তার আশ বিন্দু ব্রহ্মগুণে ॥

নয়েতে নবগ্রহ দশে ইন্দ্রগণে
আবুবক্কার উক্তি পাবিনে মুক্তি দিদার শার চরণ বিনে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

ছানোয়ার শাহ্-এর গান

ছানোয়ার শাহের জন্ম ১৯৫২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বকশীপুর গ্রামে। পিতা মৃত হামের বিশ্বাস। তাঁর গু কররা জাঁহাপুরের খোদা বকশ শাহ্। ফকির ছানোয়ার শাহ্ মূলত পালা গানের শিল্পী হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত। ছানোয়ার শাহ কিছু বাউল গানের পদ রচনা করেছেন।

করি কি উক্তি বল যুক্তি করা দায়।
মনের কথা মনে জানে কারেও বলা উচিত নয় ॥

ভবে এসে কি করিলাম সুধা ত্যেজে গরল খেলাম
বিষে অঙ্গ জ্বরাইলাম ঠেকলাম বিষম দায় ॥

দেহ তরী বাগ মানেনা কাম কুম্ভীরে দিচ্ছে হানা
ছিঁড়ে খায় পালের কোণা ডাঙায় খাবি খায় ॥

খোদা বখশের মুখের বাক্য ছানোয়ারের বিশ্বাস মুখ্য
জ্যান্তে মরার প্রেম সাক্ষ্য সাধনার কি করি উপায় ॥

তথ্যদাতা : ছানোয়ার শাহ [জন্ম: ১৯৫০], গ্রাম: বখশীপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ৪.৫.২০১২

আজগর শাহ্-এর গান

আজগর শাহের জন্ম ১৯৫৫ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বকশীপুর গ্রামে। তাঁর গুরু রফিক শাহ্।

www.pathagar.com

পদে পদে অপরাধী কর হে ক্ষমা
তুমি হে দয়ার ভাণ্ডার তোমার দয়ার নাই সীমা ॥

পতিত পাষণ্ড আমি এই না ভবের পর
পাহাড় সমান পাপের ভার খণ্ডাও হে আমার
দয়াল তুমি পাবন আমি পামর করি দয়ার ভরসা ॥

তুমি হে পতিত পাবন আমার নাইকো ভজন সাধন
নিজ গুণে দিলে চরণ দয়াল নাম যাবে জানা ॥

রফিক শার চরণ তলে অধীন আজগর কেন্দে বলে
আমি তোমার অবোধ ছেলে ফেলে যেন দিও না ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

আহমদ শাহ্-এর গান

১৯৫৬ সালে আলমডাঙ্গা উপজেলার বকশীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর গু এজাহার শাহ্। তিনি বেশ কিছু বাউল গানের পদ রচনা করেছেন।

দেখা দাও হে প্রাণ বন্ধু দেখি তোমায় নয়ন ভরে
আমি তোমার অযোগ্য বলে তাইতে দেখা দাও না মোরে ॥

জন্ম দিলে হয় জন্মদাতা পালন করলে হয় পালনকর্তা
শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাদাতা দীন ভিখারি বানালো মোরে ॥

স্বর্গ কি নরকের বর্ণন শুনে মোর নাই প্রয়োজন
শুধু তোমার মুখের বচন ভব জ্বালা যায় গো দূরে ॥

এজাহারের রাঙা চরণ আহামদের হয় না স্মরণ
তাইতে কাঁদে এ অভাজন দাও হে দেখা দেখি তোমারে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

ইউসুফ শাহ-এর গান

ইউসুফ শাহের জন্ম ১৯৬০ সালে আলমডাঙ্গার পোলতাডাঙ্গা গ্রামে। পিতা মৃত ফয়েজ উদ্দীন গায়েন গু ইউনুস শাহ ওরফে উদাস বাউল। ইউসুফ শাহ গীতিকার ও পালা গানের শিল্পী হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত।

www.pathagar.com

তুমি গু আমার পারের কাণ্ডারি
এ ভব কারাগার করিতে পারাপার বিপাকে পড়ে যেন ডুবে না মরি ॥

নদীর কূলেতে যায়, কত ঢেউ লাগে গায় লাজে মরি হায়, কি করি উপায়
কাম কুম্ভির যারা আমায় করে তাড়া প্রাণে যায় মারা, বাঁচেনা তরী ॥

চড়ে নৌকার পরে হালটি ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে চল নদীর ওপারে
তুমি হলে নির্দয় ওপারে না যাওয়া যায় বসে আছি সে আশায় আর করোনা দেরি ॥

আমার মতো কতজন বসে সারা জীবন পায় না পারের সন্ধান গু বিহনে
ইউনুস হয়ে বন্ধু পার কর ভব সিন্ধু ইউসুফ হয়ে অন্ধ জনম ভরি ॥

তথ্যদাতা : জনাব ইউসুফ শাহ [জন্ম: ১৯৬০], গ্রাম: কালিদাসপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা।
সংগ্রহের তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

কাশেম শাহ-এর গান

কাশেম শাহের জন্ম ১৯৬৪ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বকশীপুর গ্রামে। গু জবেদ শাহ। বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। যার একটি হল :

পারে যাওয়া আমার হলো না
রিপুর বশে হারাই দিশে বুঝালে মন বোঝে না ॥

গাঙে যখন জোয়ার আসে অপার হয়ে ভাবি বসে
ঝাঁপ দিলে যায় গো ভেসে ধড়েতে প্রাণ থাকেনা ॥

সেই যে নদীর বাঁকে বাঁকে কতজন পড়েছে পাকে
সাধন ভজন বল বুদ্ধি সব হয়ে যায় রে তা-না-না ॥

জবেদ সাঁইজির চরণ তলে অধম কাশেম কেন্দে বলে
নিজ গুণে নিও পারে অবহেলা কর না ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

খ. মারফতি গান

বহুকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা লোকগীতির একটি সমৃদ্ধ ধারা মারফতি গান প্রচলিত রয়েছে। আরবি মারেফত শব্দ থেকে মারফতি শব্দটি এসেছে। মারেফত অর্থ অধ্যাত্ম অথবা গুপ্ত জ্ঞান। ইসলামি মরমি ভাবধারার অধ্যাত্ম সাধনার কথা আছে। মারফতি গান সুফিবাদ আশ্রিত ভক্তিমূলক গান। মারফতি গানের মধ্যে আল্লাহর মহিমা, ক্ষমতা, নূরতত্ত্ব,

www.pathagar.com

বাতুনি বা গোপনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে রচিত। এক কথায় মারফতি গান সুফিবাদ আশ্রিত ভক্তিমূলক গান। মারফতি গানে আল্লাহর কাছে ভক্তের আবেদন নিবেদন পরম নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ পেয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে লোকায়ত সাধকদের মধ্যে মারফতি গানের নিবিড় চর্চা এখনও বহমান। আলমডাঙ্গা জামজামির মধুপুর কুবির গোঁসাই [১৭৮৭-১৮৭৯], ঘোলদাড়ির পাঁচু শাহ [১৮২৩-১৯২৮], অমূল্য শাহ [১৮৭৯-১৯৫২], শ্রীরামপুরের শ্রীনাথ গোঁসাই [১৯২১-২০০৮], ফরিদপুর গ্রামের বেহাল শাহ [১৯০৪-১৯৮১], দুলাল শাহ [১৯২৫-১৯৮৫], জাঁহাপুবেব খোদাবখশ শাহ [১৯২৮-১৯৯০], চুয়াডাঙ্গা বড় শলুয়ার স্তম শাহ [১৯০৮-২০০০], গোপীনাথপুরের হোসেন আলি শাহ [জন্ম : ১৯২৮], আলোকদিয়ার গোলাম ঝড়ু শাহ [১৯২৬-১৯৯৮], মোর্তজাপুরের মতলেব শাহ [জন্মঃ ১৯৩২] প্রমুখ সাধক ও গীতিকারগণের মারফতি গান রচনার মাধ্যমে এ ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

কুবির গোঁসাই-এর গান

১

এই ধড়ের বিচার কররে মন ভাই
চোদ্দ পোয়ার মাঝে কোথা কোন খানেতে বিরাজে সাঁই
ঘরের মধ্যে বা কে বাইরে বা কে অধরচাঁদকে খুঁজে না পাই ॥

ঘরের মাঝে হিন্দু যবন কোনখানে কোন জগৎ নিরূপণ
কোনখানে ব্রহ্মার আসন সেই কথা তোমারে শুধাই
কর বর্ণ বিচার মন রে আমার কোথা উত্তম অধমের ঠাঁই ॥

ধড়ের কোথা গয়া কাশী কোনখানেতে বারাণসী
কোনখানেতে পুর্ণমাসী হেরে মনের আজ্ঞা পুরাই
আছে কোনোখানে অযোধ্যাবাসী দিতেছে রাম সীতার দোহাই ॥

কোথা দোজখ ভেস্তখানা ধড়ের কোনখানে মক্কা মদিনা
কোনখানে কাফের বেদিনা কোনখানে কারবালা কসাই
ধড়ের কোনখানেতে সহিদ হলেন হাসান হোসেন দুটি ভাই ॥

কোনখানে বৈকুণ্ঠপুরী গোলোকনাথ গোলোকবিহারী
কোনখানেতে গোর্বর্ধনগিরি হেরে দুটি নয়ন জুড়াই ॥

ধড়ে কোথা সপ্তসাগর ভাসিছে কোথা মৎস মকর
কোনখানেতে সিংহ শুকর ইহার সকল ঠিকানা চাই
ধড়ের কোন গাছে কোন পক্ষী বসে কৃষ্ণ গুণ গাইছে সদাই ॥

www.pathagar.com

স্বর্গমর্ত পাতাল আদি কোনখানে পুলছেরাত নদী
কোনখানেতে আল্লাহাদি হবেন সেই আখেরি কাজী
কুবির বলে আমি চরণ ভেবে অতি সংক্ষেপেতে বুঝাই ॥

২

হায় ঘরামী ঘর করেছে ছাঁচে ঢেলে।
গোড়াট নাই দেখতে পাই
হাওয়ার জোরে আগে চলে।
নাইক চাটন-পাটন ঢালা
গঠন গঠেছে শনি শুক্র কূলে ॥

সৃষ্টিকর্তা ঘরামির সৃজন
তার দীঘেতে আসমানি গঠন
ছাঁচ পাড়ন নাইক তার চালে।
সঞ্চে সঞ্চে জোড়া করলে
খাড়া চামের বেড়া কামের কলে॥

রজে বীজে করে সম্ভোগ
কড়ায় কড়ায় মিলাইয়ে দাগ
ঘরের রাগ মরকোচায় খুলে।
নাই খুঁটি-খাঁটা পাড়ন-আটন
মধ্যে কোটায় আগুন জ্বলে ॥

পূর্ব পশ্চিম উত্তর আর দক্ষিণ
ঘরের নবদ্বারে খোলা রাত্র দিন
সাড়ে তিন হাত গঠন সকলে।
কুবির বলে সেই ঘরামির
চরণ পাই যেন অন্তিমকালে ॥

৩

সেই সৃষ্টিধর করেছেন সৃষ্টি
সহজ মানুষ পরম পুষ হয়নাকো তায় দৃষ্টি।
আছে রসে ঢাকা রসে মাখা রসে রতি পুষ্টি ॥

তিন রতিতে গঠন হয় সারা
চন্দ্রপক্ষ নেত্র তারা ত্রিধারা বহিছে সুসৃষ্টি ॥

www.pathagar.com

আরো স্বত্ত্ব রজ তমো তিনে রতি বৃদ্ধি শতগুণে
বায়ু পিত্তি কফে টানে প্রলয় অনাসৃষ্টি ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারে রতিখণ্ড নয় মূলাধার
ক্রীড়াগুণে লিখেছেন কৃষ্টি ॥

যারে দেবতারা করে আরাধ্য হয় না চারিযুগে
সে জরা বৃদ্ধ, বয়স তার চৌদ্ধ কথা মধুর মিষ্টি ॥

কুবির বলে সত্য কথা, আছে মন তোমার চরণে গাঁথা
যে হয়েছে অবতার দশটি ॥

তথ্যদাতা : মোঃ নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৫], গ্রামঃ গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা

অমূল্য শাহ-এর গান

সেই অবতারের বাড়ি কোথা, জন্ম কোথা
কোথা তার পিতামাতা কোথায় গোনাগুষ্টি ॥
বৈতরণীর খেয়া ঘাট
এই ঘাট পার হতে হবে ভাঙবে যে দিন ভবের হাট ॥

যে দিন মন তুই সব হারাবি স্ত্রী পুত্র ঘরের দাবি
মায়ায় ভরা এই পৃথিবী শস্যভরা সোনার মাঠ ॥

সেই ঘাটের নাই জাতের বিচার ঢুলি চামার মেথর কামার
কত কাঙাল মুচি হচ্ছে রে পার ঘাটের মাঝি প্রাণনাথ ॥

ঘাটের মাঝি প্রাণগোবিন্দ যার সাথে তার নাই সম্বন্ধ
পারঘাটার মুদারা বন্ধ হোক না সে রাজাধিরাজ ॥

মুরশিদ চান্দের ভজন ছাড়া হই না কারও পারের ভারা
অমূল্যের কপালপোড়া যাওয়া আসা হবে সার ॥

তথ্যদাতা : মোঃ নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৩], গ্রামঃ গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

পাঁচু শাহ-এর গান

খোদা মানুষের ভেতরে আছে নীরের রূপ ধরে
ও সে নিগুমের ঘরে।
ও সে এমনি নিগুম ঘর হাওয়ার নাইরে অধিকারে ॥

অমৃত লহরে নিগুম ঘরে আপনার রূপ ধরে
সুফিরা বলে ওরে আল্লা থাকে নিরাকারে

www.pathagar.com

পারা লাগাও হিমদর্পণে রূপ দেখিবে নয়নে
মহব্বতের ঘরে ছাড়া পাবি না তারে ॥

মোকাম মাহমুদের ঘরে নজর করে দেখ তারে
বীণা বাজে গুনগুন সুরে কী মধুর লীলা করে
ভক্তি ছাড়া পাবি না তারে সেই মহব্বতের ঘরে ॥

মানুষের সঙ্গে থাকে চিৎপুরের চিতের পর
আহাদে আহমদের বিলায়েতের খবর কর
লাম আলেফের খবর পাবি তৌহিদের ঘরে ॥

বিলায়েতে মালের কোঠা সেই রংপুরের শহর
ধনির ধনি মিলতে পারে যদি ভাগ্যে থাকে তোর
রূপচাঁদ শাহর বুলি পাঁচু পড়লি ভুলির পরে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

বেহাল শাহ-এর গান

দ্বিদল পদ্মের ব্যাখ্যা কর ভাই আমি শুনতে চাই
অজ্ঞান নামক দ্বিদল পদ্ম কোন বর্ণে আছে কোথায় ॥

ঐ বর্ণে রয় কোন যোগিনী নামটি কি তাঁর বল শুনি
কি বর্ণেতে আছেন তিনি কি কার্য করছে তথায় ॥

ঐ পদ্ম কলিকা মাঝে কোন জনা সদা বিরাজে
সাধুগণে দেখে ভজে সেই জন্য চিত্ত স্থির হয় ॥

বলে ঘুচাও মনের ভ্রান্তি তবে জীবনে পাব শান্তি
ছমির চাঁদের চরণে স্থিতি বেহাল যেন সদা পায় ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা, সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

দীনু শাহ-এর গান

আমার মন হলনা এমন কি করি ভাবি এখন
কোন সময় বেন্দে লয়, শিহরে কাল শমন ॥

দশে ছয়ে ষোলজন থাকিতে, আমি কেন্দে বেড়াই পথে পথে
যেতে দেয় না সরল পথে, কুপথে করায় গমন ॥

www.pathagar.com

রান্দা ভাত ঘরে থাকিতে আমি কেন পাইনা খেতে
যদি কোন সুবুদ্ধিতে স্ব-ইচ্ছায় করায় ভোজন ॥

মুখ থাকিতে হত মূর্খ জ্ঞান থাকিতে পাই যে দুঃখ
দীনুর তাতে হয় না সুক্ষ্ম উদয়চাঁদ দেয়না চরণ ॥

তথ্যদাতা ঃ মো: গোলাম রসুল সর্দার [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম: দূর্লভপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : তারিখ: ২৪.০৭.২০১২।

শ্রীনাথ গোঁসাই-এর গান

সে মানুষ কি খুঁজলে মেলে
আঁধারে কে আলো দিলে ॥

কত আগে মনে জাগে মিশে ছিলে ঝোপজঙ্গলে
হলো লালন ভবন সোনার অঙ্গন থাকবে কীর্তি কতকালে ॥

গোপনে ছিল সমাধি কজন জানে এ অবধি
দয়ার সাগর দয়ালনিধি এ সমাধি জাগাইলে ॥

লালন সাঁইজির ভক্ত রবি ঠাকুর মশাই বিশ্বকবি
শ্রীনাথ বলে বসে ভাবি কবে হরির চরণ মেলে ॥

তথ্যদাতা : জনাব ইউসুফ শাহ [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম: কালিদাসপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা।
সংগ্রহের তারিখ : ০২.০৮.২০১৩

হোসেন আলি শাহ-এর গান

মিছে ভবের মায়ায় ভুলে তোমার আর হুঁশ হলো না
কয়বার এসে কয়বার গেলে আসা যাওয়া দূর করলে না ॥

পড়েছ চুরাশির ফেরে মরছ ঘুরে অন্ধকারে
কবে যাবে সাগর পারে হিসাব করে দেখলে না ॥

নেশার ঘুমে মাতাল রইলে দিনে দিনে সব খোয়াইলে
একদিন এসে ধরবে কালে বিনয় করলেও ছাড়বে না ॥

আলি শাহ কয় খাটবে না আর ফাঁকি-জুকি
হোসেন শাহ তুই থাকবি সুখী তোমার মনে এই ভাবনা ॥

তথ্যদাতা : হোসেন আলি শাহ, গ্রাম: গোপীনাথপুর, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,
সংগ্রহের তারিখ : ২৪.০৯.২০১২

www.pathagar.com

দুলাল শাহ-এর গান

কোন অপরাধে গো দয়াল ফেলেছ এ ঘোর পাথারে
আমি অতি মূঢ়মতি তাইতে দিলে দুঃখ প্রচারে ॥
না হলো ভজন সাধন সব হল অকারণ মিছে আশা এ সংসারে
যেতে নিকটে রাজার কোর্টে আমি কি বলিব ঐ হুজুরে ॥

তোমা বিনে নিজ গুণে কে তরাবে আছে দয়াল এ ভূবনে
দয়ার শিরোমনি নাম যে শুনি মুক্তি দিতে গুনাগারে ॥

দুলাল বলে কাতর হালে সাঁই বনমালীর চরণ ভুলে
যদি চরণে থাকত মতি হতো গতি পড়তাম না আর কদাচারে ॥

তথ্যদাতা : মোঃ নিয়ামত আলী মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৫], গ্রামঃ গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা

গ. জারি গান

জারি গান বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। মুসলিম সমাজে মহররম উপলক্ষে কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ ঘটনা নিয়ে রচিত গানই জারি গান। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোক সংগীতের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হচ্ছে জারি গান। জারি শব্দটি এসেছে আহাজারি থেকে। জারি ফার্সি শব্দ। জারিগান খেদ বা বিলাপের গান। ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন ও তাঁর পরিবারবর্গের নির্মম কণ মৃত্যুর কাহিনী জারি গানের বিষয়। কণ রসের সাথে বীর রস যুক্ত হয়ে জারি গানকে প্রাণস্পর্শী করেছে। হিজরি সনের প্রথম মাস মহররমের চাঁদ দেখার দিন থেকে জারি গান ও জারি নাচের মাধ্যমে শু হয়ে আশুরার ১০ তারিখ পর্যন্ত চলে।

জারি গান দলীয় সংগীত। দুই বা অধিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিষয় নিয়ে জারি গান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দলে একজন মূল গায়ক বা বয়াতি এবং তাঁর সাথে দোহার থাকে বেশ কয়েক জন। মঞ্চে মূল গায়ক ঘুরে ঘুরে গান পরিবেশন করেন, দোহাররা বসে বসে তাঁর সাথে সুর মেলান। গানের সাথে ৪/৫ জন ঢোল, বাঁশি, মন্দিরাসহ নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জারি আসরকে উন্মাদনায় ভরে তোলে।

জারিগান ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব সমাজের চিরন্তন বীরত্ব কণ রসে পরিপুষ্ট হয়ে শ্বাশত মানবিক অনুভূতি প্রকাশ করেছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে মহররমের জারি, কারবালার জারি, হানিফা এজিদের জারি, কাসেদনামা, মক্কানামার জারি, কুলসুমের জারি, সুলতান বাদশার জারি, হাজেরার জারি, হাজেরার বনবাস, খৎনামা, মসলেম নামা, শহীদে কারবালা, জহরনামা, মেজমানী, জানচুরি, গহরমতির জারি, রঙ্গপতির জারি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জারিগানের আঙ্গিক ব্যবহার করে বর্তমানে জোলানামার জারি, নূহ নবীর জারি, দর্জালের জারি, মনসুর হাল্লাজের জারি, বাপ-বেটার জারি, নিমকহারামের জারি, পরিবার পরিকল্পনার জারি, গু-শিষ্যের জারি, নারী-পুরুষের জারি রচিত এবং আসরে গাওয়া হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোকসমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এসব জারিগান এখনও পছন্দ করেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে জারিগানের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পেরোচখালি গ্রামের মো: আব্দুস সাত্তার, পিতা: কলম আলী মন্ডল, জন্ম: ১৯৫০, শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণি, পেশা: কৃষিকাজ। ৪৫ বছর যাবৎ জারি গান পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর গু চুয়াডাঙ্গা সদরের গোপালনগর গ্রামের মোঃ তাহাজ উদ্দিন। তিনি বায়না বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে থাকেন। যে সমস্ত জারি পালা সংগ্রহে রয়েছে খৎগিরি, হাজেরার বনবাস, মোসলেম নামা, কারবালার কাহিনী ইত্যাদি। গোপালনগর গ্রামের মো: তাহাজ উদ্দিন, পিতা: মৃত খোকাই মালিতা, জন্ম: ১৯৪৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণি, পেশা: কৃষিকাজ। ৪৩ বছর জারি গান গেয়ে আসছেন। দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের আমজাদ আলী এবং চুয়াডাঙ্গা সদরের গোপীনাথপুর গ্রামের মোহর আলি তাঁর গু। বোয়ালমারী গ্রামের ঠান্ডু মিয়া, পিতা: মৃত রহমান মণ্ডল, জন্ম: ১৯৬৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাক্ষর, পেশা: কৃষিকাজ। ২২ বছর যাবত গানের সাথে সম্পৃক্ত। গু মোঃ গোলাম মোস্তফা (হাজরাহাটি) ও দামুগহুদা উপজেলার পীরপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন। যেসব পালা তাঁর সংগ্রহে আছে তা হলো: হাজেরার বনবাস, শহীদে কারবালা, বিবি কুলসুমের জারি, এজিদ বধ, জঙ্গনামা ইত্যাদি। হাজরাহাটি (শেখপাড়া) নিবাসী মোঃ নূর ইসলাম, পিতা: গোলাম মোস্তফা, জন্ম: ১৯৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাক্ষর, পেশা: কৃষিকাজ। তাঁর গু চুয়াডাঙ্গা সদরের জাফরপুর গ্রামের মোঃ হায়দার আলী ও হাজরাহাটি গ্রামের মনসুর আলী। বিবি হাজেরার বনবাস, শহীদে কারবালা, রংপতির জারি, মোসলেম নামা ইত্যাদি তাঁর সংগ্রহে আছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মোঃ আব্দুল লতিফ, পিতা: মৃত মওলা বকশ মণ্ডল, জন্ম : ১৯৫৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ। তিনি ২৬ বছর জারি গান পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর গু আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোজাম্মেল হক ও চুয়াডাঙ্গা সদরের খাদিমপুর গ্রামের মৃত দিদার বকশ। ভাই মোঃ নাসির উদ্দিনও জারি গানের শিল্পী। যেসব পালা তাঁর সংগ্রহে আছে তা হলো : খৎনামা, বিবি হাজেরার বনবাস, মোসলেম নামা, শহীদে কারবালা, জহরনামা, বিবি কুলসুমের জারি (মেজমানী), জানচুরি, গহরমতি ইত্যাদি।

জীবননগর উপজেলার রাজনগর পাড়ার মোঃ হায়দার আলী, পিতা : মৃত তুষ্ট মন্ডল, জন্ম : ১৯৩৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণি, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী। তিনি ৪০ বছর যাবত গান গেয়ে আসছেন। তাঁর গু মৃত ফয়েজ উদ্দিন। মোঃ হায়দার আলীর আদি নিবাস চুয়াডাঙ্গার জাফরপুর গ্রামে।

এক সময়ে জারি গানের কুশলী শিল্পী হিসাবে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাদিমপুরের সারোয়ার গায়েন, কুলচারার আহাদ আলি গায়েন, হানুরবাড়াদির শুকুর আলি, সুমিরদিয়ার আজিবর রহমান, নিমতলা গ্রামের সুলতান আলি ও কালুব্বারি, হাজরাহাটির ফলেহার, আলমডাঙ্গা উপজেলার নতিডাঙ্গা গ্রামের দিদার বখশ, নাগদহের হোসেন গায়েন, হোগলবগাদির মাতু গায়েন, দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুরের মোহর আলি, নবীন মণ্ডল, আমজাদ আলি। এ ছাড়াও আবু মুছা, রহম আলি, মোসলেম উদ্দিন, ফজলুল হক, সবেদ আলি, ভেলু, শাজাহান, শামসুদ্দিন মণ্ডল, হোসেন আলি মণ্ডল, মতলেব আলি, কাতব আলি বয়াতি প্রমুখ সুনাম অর্জন করেন।

www.pathagar.com

নাগদহের হোসেন গায়েন নিজেই গান রচনা করতেন। জারি গানের শিল্পী হিসেবে তাঁর সুনাম সুদূর উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

রংপতির জারি

ও দিনের রাসুল এসে এ মদিনায় বাতি জ্বেলেছে
বাতি জ্বেলেছে হায়রে বাতি জ্বেলেছে
আমি প্রথমে বন্দনা করি
আল্লাজীরও চরণে সালাম হাজারে হাজার।
আমি তারপরে বন্দনা করি
হযরত নবীর চরণ ধরি
তিনারও চরণে সালাম হাজারে হাজার।
আমি তারপরে বন্দনা করি
মা ফাতেমার চরণ ধরি
তিনারও চরণে সালাম হাজারে হাজার।
আমি তারপরে বন্দনা করি
হযরত আলীর চরণ ধরি
তিনারও চরণে সালাম হাজারে হাজার।
আমি তারপরে বন্দনা করি
উস্তাদ গুর চরণ ধরি
তিনারও চরণে সালাম হাজারে হাজার।
আমি তারপরে বন্দনা করি
পিতা মাতার চরণ ধরি
তোমাদের চরণে সালাম হাজারে হাজার।
কোন বা জারি জানি আমি
কোন বা জারি ধরি
রংপতি লয়ে জারি
খানিক মাত্র বলি।
সুষম্ম রাজারই কন্যা নামটি রংপতি
মার্কিন শহরে ঘর তার আমবাজের পশ্চিমি
দন্ত চোরা মাজা দোলা চরণে নেপুর
দুঃখের দুর্গতি ঘোচে দেখে তাহার রূপ।
যেমন কেশ তেমন বেশ সুপেছে মাথায়
আকাশেরও চন্দ্র যেন পূর্ণিমা উদয়
ষোল বছর বয়স নারীর না হয়েছে বিয়ে
রাত্রি যোগে বলতে লাগল দাসী-বাদী লয়ে।
শোন দাসী সর্বনাসী কি বলিব আর
এই বয়সে বাপ মা মশায় বিয়ে দেয় না কেন?

www.pathagar.com

হাস কথা করছি দাসী তোমাদেরও সাথে
সেও কথাটি মিথ্যা নাই একলা থাকি শুয়ে।
সিংগুর করিয়া ঘরে শুয়ে থাকি যদি
কতজনা এসে আমার হয় যেন মোর পতি
মুখ ভরা দাঁড়ি বেটা পালংকের উপরে
বাটা ভরা পান সুপারি দিচ্ছি থরে থরে।
সরে এসে কাছে বসে বলছে বিয়ের কথা
ঘোমটা টেনে আমি হেট করেছি মাথা
ঘটকও সাজিয়া মোরে বিয়ের কথা কয়
ছেলেমেয়ের বিয়ের কথা মা বাপের কাছে কয়।
কি করিব লাজে মরি উঠে কোথায় যাব
আপনারই বিয়ের কথা কেমন করে কব
এই কথা বলে বিবি ধন্দ হয়ে ছিল
সেই রাত্রে হানিফ তখন খোয়াবে দেখিল।
হানিফ ছিল নিদ্রাগত পালংকের উপরে
ছটফট করিয়া উঠল কুমঙ্গল দেখিয়ে
জয়বন বলছে সাহেব আমার কথা লও
তুমি ছিলে ডানের দিকে সেতো ছিল বায়
তুমি একা চলে এল সে গেল কোথায়।
হানিফ বলে জয়বনও মনে দাও মোর কালি
তোমার সম্পর্কে আমার হয় যে ছোট শালী
তোমরা ছয় বিবি ঘোর দেখ ঝগড়া করো না
আমি রংপতির তল্লাশে যাব বারণ করো না।
যে মোরে বারণ করিবে বারণ সেই হবে বরী
আমি এখনি মরিব গলায় দিয়ে ছুরি
এই কথা বলিয়ে হানিফ করিল গমন
বিরামখানায় যেয়ে হানিফ দিলেন দরশন।
ডাকিয়া হুকুম করে শহিদের তরে
জ্বিন বন্দী করে ঘোড়া এনে দাও আমারে
শহিদও শুনিয়া ঘোড়া করিলে তৈয়ার
জরদের সোনার অঙ্গেনার সোনার জ্বিন।
সোনার লাগাম এনে ঘোড়ার মুখেতে ধরিল
ঘোড়ার সাজন দেখে হানিফ খুশি অন্তরে।
ঘোড়ার গলা ধরে হানিফ করছে যে মিনতি
হানিফ বলছে নীলকম ঘোড়া নেমক টি খাও
কহর দরিয়া আমার পার করিয়া দাও
যদি সাহেব যেতে চাও মার্কিন শহরে।

www.pathagar.com

আল্লাহ রসুলের নাম হৃদয়েতে জপ
বিসমিল্লাহ বলে তুমি আমার পৃষ্ঠে উঠ
ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠে হানিফ কষিলে বাগডোর
আজ উঠিল হানিফের ঘোড়া শূন্যের উপর।
শূন্যের উপর উঠে ঘোড়া চলছে গজাগজ
ছয় ঘণ্টাতে ধরিয়ে চলব দরিয়া করব পার
ওরে বার মাসের পথ আমি ছয় ঘণ্টায় পৌঁছাব
কহর দরিয়া কহর পানি উঠছে পাকে পাকে।
পর ভক্তি লেখেছে ঢেউ যখন তুফান আসে
দরিয়ারও ঢেউ দেখে হানিফ কেন্দে উঠে
ঘোড়া মিটে গিয়েছে বিয়ের সাধ দেশে চল ঘুরে
নীলকম ঘোড়া বলছে হানিফ একি কভু হয়
তবে নাকি আসছে খোদা সামনে আমার
ধ্যানে ছিল খোয়াজ খিজির দেখিতে পাইল
তাড়াতাড়ি যেয়ে হানিফের তুলে নিল।
বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘোড়া দরিয়া পার করল
নীলকম ঘোড়া বলছে হানিফ আমার কথা লও
শুকুরানা নামাজ তুমি হৃদয়েতে জপ
বিসমিল্লাহ বলে তুমি আমার পৃষ্ঠে উঠ
শুকুরানা নামাজ হানিফ হৃদয়েতে জপে
বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠে
ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠে হানিফ কষিলে বাগডোর
উঠিল হানিফের ঘোড়া শূন্যের উপর
সেরেস্তা আর তসবি গলে হাতে হাতে লয়ে আশা
আলীর দোস্ত হচ্ছে মোর খেয়ে মোর পেয়ালা
পুবন ভরে ঘোড়া উঠে আলীর মতন হয়
উপস্থিত হইল ঘোড়া পরীর দরজায়
সাতশত পরীর দেড়ি ছিলেন দারোয়ান
হানিফকে দেখিয়া তারা নামিলেন জমিনে
কেউ খায় মোর পায়ের ধুলা কেউ জমিনেতে পড়ে
কেউ বলে খুনকার সাহেব বাড়ি কোন শহরে।
হানিফা বলে গো তোমরা পরিচয় জানো না
বাপের নামাটি শাহা আলী আমার নাম হানিফা
মার্কিন শহরে যাব আমি বিদায় দাও আমার।
যদি সাহেব যেতে চাও মার্কিন শহরে
গোটা তিনেক পরী এনে দিচ্ছি তোমার সাথে
পহেলা সাজিল পরী নামে প্রিয়নিশি

www.pathagar.com

খানিক বেশে আউলা কেশে বসল নদীর কূলি
তারপরে সাজিল পরী নামেতে বিজয়া
পর পুষের ঘরে যাতি করে কত মায়া।
তারপরে সাজিল পরী আল্লাদীর জারি
দশ কাঠা ভূই জুড়ে বসল মর্দ এইচা ভারি
তিন পরী সেজে আসল হানিফা দরবারে
উঠিল হানিফার ঘোড়া শূন্যের উপরে
শূন্যের উপর উঠে ঘোড়া চলছে গজাগজ
ছয় ঘণ্টা ধরিয়া করব দরিয়া পার
এই নদীর তুফান ভারী বার মাসের পথ
সেই দরিয়ার উপর উড়তে পারে না পাখি
পড়ে দরিয়ার উপর
নদী বেন্দে ঢেউ বেন্দে গঙ্গা করে খেলে
তুফানে বরযাত্রীর ঘোড়া কানে লাগে তালা
কানে তালা লেগে ঘোড়া হারাইল বুদ্ধি
বেহুশ হয়ে হানিফ পলো নিহাল দরিয়ার মধ্যি
খোদার বান্দা নবীর উম্মত যে খোনে আছে
হানিফ মর্দ দরিয়ায় পলো আল্লাহ বলে ডাকো
ধ্যানে ছিল খোয়াজ খিজির দেখিতে পাইল
তাড়াতাড়ি যেয়ে হানিফের বুকে তুলে নিল।
বিসমিল্লাহ বলিয়া ঘোড়া দরিয়া পার করল
ময়দানের উপরে হানিফ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
শহরের গলিতে যেয়ে হানিফ হলো খাড়া
পানি ভর্তি আসছে কত রংপতির দাসী
দেলে ভেবে দেখছি তোমাদের নাই যেন কেরো পতি
এই কথা শুনে হানিফের জোরেতে ধরিল
সে সময়তে হানিফ মর্দ তলায় পড়েছিল
তলায় পড়ে থেকে হানিফ ধরল চুলের ঝুটো
চুলের ঝুটো ধরে যেমন জমিনায় ফেলিল
দাসীরা সব কেন্দে বলে ভূইকম্প এল
চুলের খোপা উঁচু করে জুড়ে দিল কিল
এমন পড়া পড়ছে দেখ জ্যেষ্ঠ মাসের শিল
মারধোর খেয়ে দাসীরা সব পলাইয়া গেল
রংপতি বলছে দাসী দেরি হলো কেন
আগে খানিক জিরিয়ে নিই বাঁচে না আর প্রাণ
কোথা থেকে এয়েছে যেন ভেড়োর মুসলমান।
ঘাট জুড়ে বসে আছে মর্দ এইচা জোর

www.pathagar.com

তোমার এই কথা শুনে দুই আখি করল ঘোর
এই কথা শুনে রংপতি কাঁপছে থরেথর
হুমো দেওকে ডেকে বলছে সমাচার
দেও দেও বলে দেখ ডাকিতে লাগিল
দূরে ছিল হুমো দেও শুমরও পাইল
আসমান জমিন হা করে দেও বলছে বিবির কাছে
কি জন্যেতে ডেকেছেন মাতা তাই বল আমারে
রংপতি বলছে ও দেও আমার কথা নাও
ওরে ঘাট পাড়ে বসে কিডা দেখে এসো তার
এই কথা শুনে হুমো দেও করিল গমন
ঘাট পাড়ে যেয়ে পৌছালো তখন
আগে আসি আমি চান করে
ঐ বিটাকে ধরে খাব পানির সাথে চাল
এই কথা বলে হুমো দেও গোসল করতে গেল
গোসল করে হুমো দেও হানিফের কাছে গেল
চার হাত পা ধরে হানিফার খেয়ে ফেলে দিল
এক চুল করে বিশ মন পানি তার পরেতে খেল।
হানিফ ছিলেন নিদ্রাগত আল্লাহ্ ছিলেন বাম
যাত্রাকালে ভূলে ছিলেন আল্লাহ নবীর নাম
নীলকম ঘোড়া বান্ধা ছিল ইরাকেরও তলে।
কান্দিয়া বলতে লাগল আল্লাজীর দরবারে
হানিফকে দেখ আল্লাহ ও দেও খেয়ে ফেলেছিল
তোমরা যেয়ে উদ্ধার কর হানিফকে দোহায় তোমার
অশেষ শক্তি আল্লাহ তায়ালা হানিফকে দিয়েছিল
শক্তি পেয়ে হানিফ মিরে পায়ের গুতন মেরেছিল।
এই আঘাত দেও তখন না সহ্য করতে পারল
হানিফকে তখন উগরিয়ে ফেলিল
সেই সময় উঠে হানিফ রংপতির কাছে গেল
ঢাল-তলোয়ার নিয়ে হানিফ তখন রংপতির সাথে যুদ্ধ করেছিল
রংপতির লয়ে হানিফ আপনার মহলে পৌছাল
এই পর্যন্ত জারি আমার সাঙ্গ হয়ে গেল
ভুলক্রটি হলে আমার ক্ষমা করে দিও
নামটি আমার নূর ইসলাম মিয়া
চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাড়ি।
পিতার নামটি গোলাম মোস্তফা
হাজরাহাটি বাড়ি।
তাঁর মুখে গাওনা শিখে গান করিতে আসি।

www.pathagar.com

তাঁর মুখে গান শিখিয়া কি করিলাম কাম
আমি মরলে দোজখে যাব তাতে নাইকো বাধা
উস্তাদ বেটা মরলে যেন বেহেশতে জায়গা পায়।

কথক ও শিল্পী : মোঃ নূর ইসলাম মিয়া [জন্ম : ১৯৭৫], গ্রাম: হাজরাহাটি (শেখপাড়া), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা; সংগ্রহের তারিখ : ০৮.১২.২০১৩

গ্রামের নামের জারি

আল্লা বলে শুরু করি শোনেন গ্রামের ভাই
গ্রামের নামের জারি আমি মুখে বলে যাই।
কালুপোল গ্রামে যত ফকির-ফকরা আছে
একতারা ডুগডুগি বাজায় তারা মিথ্যে কথা নয়।
মুটেগিরির কাজ করে খায় কিরণগাছিরা
আর মেয়েলোকে গাঁয়ে-ঘরে ভিক্ষে করে খায়।
কসাইগিরি করে খায় যাদবপুরের লোকে
সরোজগঞ্জের হাটে করে গাবিন-ছাগল জবাই।
ছাগলের ব্যবসা করে নবীননগরের লোকে
যুগীরহুদারা খায়রে ভাই সরোজগঞ্জের কামাই।
গাইগরুতে লাঙল চষে বেড়েরমাঠের লোকে
ফকির মেরে জেল খাটল বুড়োপাড়ারা।
ভাণ্ডারদোয়ার মেয়েমর্দে ডোঙা চালায় ভাই
যত শিক্ষিত আর চুগোলখোর আছে ছয়ঘরিয়ায়।
পরের মাথায় লাঠি মারে বড়সলোর লোকে
রামচুদু থাকতি হলি আছে বাইনেপাড়ায়।
তামুক বেচে চাল কিনে খায় ছোটসলোর লোকে
বেগমপুরের লোকেরে ভাই শুটকি কিনে খায়।
ফুলবাড়ির মেয়েলোকে ঘর দেখতি যায়
কালো কালো বউ পোষে সুবলপুরের লোকে।
কয়লা বেচে জুয়ো খেলে হঠাৎপাড়ারা
দোস্তের বাঙালরা ভাই আলছাল বেচে খায়।
হাড়ি-কলসি বেচে খায় কুন্দিপুরের লোকে
বিত্তি বেচে শোলমারীরা সংসার চালায়।
কুটুম গেলে ল্যাম্পো নিভায় উজলপুরের লোকে
শ্যামপুরের মেয়েমর্দে ব্ল্যাক করে খায়।
কাঁঠাল বেচে বড়লোক হল জয়রামপুরের লোকে।
চানপুরের মেয়েলোকে কাপড় বেচে খায়।
মেয়েমরদ চাল বেচে খায় মদনা গ্রামের লোকে
মধুপুরের মেয়েলোকে দেওয়াল দিয়ে বেড়ায়।
কুমড়ো বেচে আটা কেনে উকতো গ্রামের লোকে

www.pathagar.com

দামুড়হুদারা ডোঙা চালায় গেড়ে-গর্তে ভাই
চা ঘুটে সংসার চালায় ডুগডুগির লোকে
নেহালপুরে ঘরে ঘরে দেখো ঘর-জামাই।
ডাল থাকতে কুমড়ো ঘোঁটে মানিকদির লোকে
কাঁচা রস বেচে খায় ঠাকুরপুরে ভাই।
বোঁটা [পান] বেচে কোঠা দিল হাজরাহাটির লোকে
তালতলার লোকেরা ভাই মিস্ত্রি সবাই।
বারো বাপের তেরো ছেলে দৌলৎদিয়াড় গ্রামে
বেস্টোপুরে নান্দা বেচে চাল কিনে খায়।
মাথা কেটে জাওলি দেয় ইব্রাহিমপুরের লোকে
মানুষ মেরে ইটভাটায় দেয় কয়রাডাঙায়।
লুটতরাজ করে খায় বোয়ালমারির লোকে
হায়দারপুরে বালি বেচে তাড়ি কিনে খায়।
ট্রেন ফেলে বড় লোক হলো গাইদঘাটের লোকে
গাড়াবেড়েয় কাপড় পরে ভাই হাগাপুঙায়।
বউ আনতে গাড়ি পায় না মাখালডাঙার লোকে
খাজুরায় বাঁশ বেচে ভাই মাছ কিনে খায়।
রাস্তার উপর তাস খেলে শঙ্করচন্দ্রের লোকে
পচা কাঁঠাল কিনে খায় ভাণ্ডারদোয়ায়।
রাস্তার উপর হাগেমোতে হুলোমারির লোকে
গোবিন্দপুরে মেয়েলোকে দাইনে খেদায়।
বউ থাকতে নিকে করে খাড়াগোদার লোকে
বেলেদাড়ি বড়লোক হল হকারির ব্যবসায়।
পরের টাকায় বিদেশ যায় জীবনে গ্রামের লোকে
তাল খেয়ে বেতাল হল রাঙেরপোতায়।
বোরিং নিয়ে মামলা করে সড়াবেড়ের লোকে
বোড়াগ্রামে কুড়নো কলা লোকে বেচে খায়
বিনা তেলে তরকারি রান্দে বোয়ালে গ্রামের লোকে
ভুলটের লোকে ভাত রান্দে উন্দো পুঙায়।
বিয়ে করতে গিয়ে মার খেয়েছে খেজুরতলার লোকে
কুটুম গেলে ভাত দেয় না গোষ্ঠবিহারে।
গোবরগাড়ার লোকেরা মৌ আলু বেচে খায়।
এই পর্যন্ত গ্রামের জারি ক্ষান্ত দিলাম ভাই।
গ্রামের নামের জারি শুনে কেউ ব্যথা পেলে মনে
করজোড়ে সকল গ্রামের কাছে ক্ষমা চাই ॥

গান রচনা এবং গায়ক : মোঃ মুক্তার আলি [জন্ম : ১৯৫১], গ্রাম : ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, সংগ্রহের তারিখ : ১২.০৩.২০১৩

www.pathagar.com

ঘ. ধুয়োগান

বাংলাদেশের লোকসংগীতে ধুয়োগান বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ধুয়োগান খণ্ড খণ্ড গানের সমষ্টি হলেও জারিগানের অংশ হিসাবে জারির আসরেই ধুয়োগান গাওয়া হয়। তাই ধুয়ো এবং জারিগান পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। জারি গানের একটি প্রসঙ্গ শেষ করে গায়ক তার প্রতিপক্ষ দলকে গানের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন করে সাময়িক বিরতি নেন। সেই অনুসঙ্গেই আসে ধুয়োগান।

আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামাঞ্চলে আসরের মাধ্যমে ধুয়োগান গান গীত হয়। এ ছাড়া মাঠে বা ক্ষেতে খামারে কাজ করার সময়ে ক্লান্ত চাষিরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে মনের আনন্দে বিনোদনের জন্য ধুয়োগানও গেয়ে থাকে। এ জন্য একে 'ছুটগান'ও বলা হয়ে থাকে। ধর্মীয় তত্ত্বমূলক কথা কিংবা বিচারমূলক বিষয়াদিসহ গ্রামীণ সমাজে লোকমনে নানা আক্ষেপ, খেদ, অনাচার, অবিচার, ব্যাভিচার এবং বিভিন্ন ঘটনাবলি অবলম্বনে ধুয়োগান রচিত হয়। জনসম্পৃক্ততাই ধুয়োগানের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। ধুয়োগানের অনুষ্ঠানে বয়াতিরা সাধারণত গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি বা পায়জামা এবং মাথায় গামছা পেঁচিয়ে রাখেন। এই সাধারণ পোষাকেই বয়াতিদের গান কৌশল এবং গানের বিষয়বস্তু দর্শক-শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে রাখে। ধুয়োগানে দোতরা, সারিন্দা, খুঞ্জরি, ঢোল বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ গানে দোহাররা বসে বসে এবং বয়াতি দাঁড়িয়ে সমস্ত মঞ্চ ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে থাকেন। বয়ানের সময়ে লম্ফ-ঝম্প এবং উচ্চগ্রামে নাটকীয় উপস্থাপনা, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি সক্ষম হন। ধুয়োগান জনপ্রিয়তার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলাব্যাপী ধুয়োগানের বিশেষ প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ জেলার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড় শলুয়া গ্রামের স্তম শাহ [১৯০৮- ২০০০], মুর্তজাপুর গ্রামের মতলেব শাহ [জন্ম : ১৯৩২], আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি মধুপুরের কুবির গোঁসাই [১৭৮৭–১৮৭৯], ফরিদপুর গ্রামের বেহাল শাহ [১৯০৪-৫.৯.১৯৮১], বাড়াদি গ্রামের রহমান শাহ [১৯৩৮-২০০৮], গোবিন্দপুর গ্রামের আরজেদ শাহ [জন্ম : ১৯৫২], ফরিদপুর গ্রামের রবিউল শাহ [জন্ম : ১৯৬০], গোবিন্দপুর গ্রামের কলিমুদ্দিন শাহ [জন্ম : ১৯৬১] ও মঈনুদ্দীন শাহ [জন্ম : ১৯৬১], এরশাদপুর গ্রামের চান্দু শাহ [জন্ম : ১৯৬২] প্রমুখ ধুয়োগান রচয়িতা এবং গায়ক। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলাব্যাপী আরও অনেক ধুয়োগানের খ্যাতনামা শিল্পী রয়েছেন।

কুবির গোঁসাই-এর গান

১

আবাদ করে চোদ্দপোয়া জমি লয়ে
থাকরে মন খাটো কৃষাণ হয়ে ॥

দীক্ষা-গুরু বর্তমানে হয়ে অধিষ্ঠান
জমির অতীত-পতিত কিছু নাহিরে।

www.pathagar.com

প্রেম ধীবরে তিনি উলুবনে গেছেন বীজ ছিটায়ে ॥

আমি হলাম হতভোম্বা জমি হলো অজন্মা
মন তুমি রে কৃতকর্মা কৃষি জন্ম সুমন দিয়ে
মন রে জোড়ো ধর্ম-হাল প্রবর্তক-ফাল
সাধক-মুড়ায় সিদ্ধ-ইষ লাগায়ে ॥

জোড়ান দিয়ে রিপুর স্কন্ধে লাঙ্গল জোড়া সাবন্ধে
প্রেমানন্দে যাওরে বেয়ে।
অনুরাগ-পাঁচুনি লয়ে মন রে কর ভক্তি-চাষ
উঠাও বিঘ্ন-ঘাস জমি সমান কর ধৈর্য মইয়ে ॥

নেত্র বারি কর সিঞ্চন রূপ রসানে দেহ মার্জন
প্রকাশিবে বীজ কাঞ্চন অঙ্কুর হবে প্রেমোদয়ে।
দেহ হবে সুনির্মল ধরিবে সুফল
কুবির কয় চরণের ধূলা খেয়ে ॥
হও দেখি আমার শিক্ষা ষোল আনা
এবার আসলে খাদ মিশালে কমি বলে কেউ ছোবে না ॥

পরখদারের হাতে প'লে বাজিয়ে নেবে নখে তুলে
সুরভাঙা গরদা হলে বাটা লইলে তা চলে না।
রং চাঁদি হলে রূপঝলকে ফিটে ফাঁটার ভাঁজ থাকে না ॥

২

হও দেখি আমার শিক্ষা ষোল আনা
এবার আসলে খাদ মিশালে কমি বলে কেউ ছোবে না ॥

পরখদারের হাতে প'লে বাজিয়ে নেবে নখে তুলে
সুরভাঙা গরদা হলে বাটা লইলে তা চলে না।
রং চাঁদি হলে রূপঝলকে ফিটে ফাঁটার ভাঁজ থাকে না ॥

শিক্ষার নাই ওজন করা যেমন টাকশালেতে মার্কামারা
সনসনেতে হরপ করা হাতে প'লে যায় চেনা
অতি যত্ন করে রেখো তারে ঘুর ফিরো কর্জ করবে না।

রাং তামা দস্তা মিশে গিলটি করা পাকা কষে
দেখলে পর লাগবে দিশে ঝকমেরে যায় রূপোসোনা।

www.pathagar.com

কুবির বলে মজে বিষয়-বিষে অবিশ্বাসে অঙ্গে সং সাজাওনা ॥

৩

তোরাই কি রসিক মেয়ে দয়া নাই ধর্ম নাই জীর্ণ করিল পুরুষ খেয়ে
শ্যামা সতী হয়ে পতির বক্ষে নৃত্য করে ন্যাংটা হয়ে ॥

আদ্যাশক্তিরূপা মেয়ে ত্রিদেবতা প্রসবিয়ে
খট্টাঙ্গ পরে বসিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরী
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দ্র আদ্য আছেন বোঝা বয়ে ॥

মান গৌরবে ছিলে প্যারী পায়ে ধরে তায় সাধলেন হরি
হয়ে ছিলেন জটাধারী করে শিঙে ডম্বুরু লয়ে
তবু রাই তারে করলে না দয়া পাষাণ কায়া কঠিন হিয়ে ॥

সংসারেতে মেয়ের জারি মেয়ের গুণ কি বুঝাতে পারি
মেয়ে এক রাজকুমারী কুলের প্রদীপ কুল মজায়ে
মেয়ে নিজ পতির মাথা কেটে বেরিয়ে গেছে কোটাল লয়ে ॥

অন্তে পতি বাহ্য পতি পুত্র পতি পশুপতি
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি আছেন মেয়ের ঋণী হয়ে
মেয়েরে লুকায়ে রেখেছেন পতি রূপেতে রূপ আশ্রয় দিয়ে ॥

জন্মদাতা পিতা হতে জন্ম মায়ের উদরেতে
পড়ে সেই মেয়ের হাতে দায়ে পড়ে হয় করতে বিয়ে
মেয়ে কোম্পানী ভিকটোরিয়া রাণী বসেছে বাদশাহী পেয়ে ॥

মেয়ে জগৎ কর্তা বটে সবাই মেয়ের বেগার খাটে
মেয়ে নিলে মুলুক লুটে হটে বেড়ায় পুষ ভয়ে
খেদে চরণ ভেবে কুবির বলে কাজ কি মেয়ের কথা কয়ে ॥

৪

এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে ব্রহ্মাণ্ড বশ করে নিলে
নীলের জ্বালায় যাব কোথায় নীলে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে নিলে ॥

নীলের অনুষঙ্গী যারা শমনের দূত যেমন ধারা
পায় যারে তায় করে সারা ডুবায়ে মারে হাত বেঁধে গলে ॥

প্রথমে নীল বিছনবেশে প্রবেশি সর্বদেশে

এই কররে সর্বনেশে সকলকে মজালে
আড়াই সের ওজনে নীল ফি বিঘায় ছিটিয়ে নিলে ॥

নীলমণির দাদনের কালে দেওয়ানজী তার অর্ধেক নিলে
আমিন জরিপের ছলে বিঘেতে তিন বিঘা নিলে
কিছু কিছু নিলে চারিদিকে বগচরের সীমানা ফেলে ॥

নীলমণি রোপণের সময় বড় ঢেলা বেচে ফেলায়
শেষ কালে মই ফেলায়ে চাষ করে খুব নিলে
বেদামীতে লাঙ্গল নিলে নীলে সব কাঙাল গরীব জ্বালিয়ে দিলে ॥

ছোট চাষ নিড়ানি বিদে দিতে সবাই নাকে কাঁদে
না দিলে মারে বেঁধে এই করে শেষকালে
আচট হতে গরু ঘিরে আমিন আর তাগিদদার বেচে নিলে ॥

দেওয়ানজী নীলমণির খুড়া তার কিছু পার্বণী বাড়া
মুহুরী অঙ্ক ছাড়া তঙ্কা কিছু নিলে
ইস্টেটের মুহুরি যে জন ইস্টদেব হয়ে বার্ষিক সেধে নিলে ॥

এবার এই নীলমণির কাছে মান গেছে অপমান আছে
একথা নয়কো মিছে জানাবে কি বলে
উত্তমে অধমে সমান হয়েছে বিচারশূন্য কলিকালে ॥

নীলমণিকে কসনদারে নেয় কিছু হার বেশি করে
আমদানির মুহুরি ভুট করে বাণ্ডিলে
তঙ্কাতে কি তঙ্কা দিয়ে করে ঠিক হরণ পূরণ গোলমালে ॥

সদয় হলেন দমের রাজা দমেতে মজালে প্রজা
আমলাদের দিলে সাজা নিকাশী দায় ফেলে
হাউজের ঘরে করলে ফৌত এই কথা চরণ ভেবে কুবির বলে ॥

৫

ভুট করেছে ১২৭১ সনের ঝড়ে
আবার এই বাহাত্তর সালে ঘোর অকালে লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে
হ'ল অন্ন বিনে ছন্নছাড়া ধান্য গেছে পুড়ে ॥

নাইক মুগ মশুরি মসনে ছোলা তেউড়ে মটর কাপাস তুলা

www.pathagar.com

জমির মধ্যে শুধুই ঢেলা রয়েছে পড়ে ॥

অতি অল্পবিস্তর শণ ছিল তাও মেলেনা হয়ে সবই গেল
হিতে বিপরীত হল মাঘ ফাগুনের জাড়ে ॥

মুল্লুক হল লক্ষ্মীছাড়া আট আনা চাউলের ধাড়া
এমনি লোকের কপালপোড়া মেলে না তা ঢুঁড়ে।

হ'ল বিচারকর্তার উল্টো দাঁড়া সদা মড়ার উপর ঢোকায় খাঁড়া
টেকস করেছে বাড়া জমির অঙ্ক তেঁড়ে ॥

ভিক্ষেবাদীর প্রমাদ হল তারা যে ফেরে প'ল কই আর নেও বলে না
কি করি আর দিন চলে না বেড়াই দ্বারে দ্বারে ॥

আর পথে যেতে শঙ্কা করে লোকে পেটের জ্বালায় মানুষ মারে
ধর্মভয় করে না চোরে পুঁটুলি নেয় কেড়ে ॥

হায় আর শুনি দিনদোপর বেলা নেয় ভেঙে মহাজনের গোলা
কুবির কয় গেল বেলা চরণ ভাবি পরে ॥

৬

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা
যখন খেই যাবে ছিড়ে লব জুড়ে ফেলব না তার এক ফোঁটা
সদা ইস্ট প্রতি নিষ্ঠে রতি আছে আমার মন আঁটা ॥

ভসকে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে
ভয় কি তার এতো কতশত গুছাই জড়াপটা।
নাটিয়ে করব পাতা দেখব তা বাধবে না কোন নেটা ॥

যখন সুতো করব মাতি লাগাব তায় পাতায় পাতায় খৈ-ভিজে মাতি
দুই এক ঘড়ি ছাড়াব জটা
শেষে কাড়িয়ে তানা গাঁথা সানা সানপেতে শাড়ির ছটা।

হয় যদি তায় কানা ঘরে গুটিয়ে লব শেষে দিব আলগা খেই পুরে
এক নজরে দেখাব সেটা
শেষে বোয়া গেঁথে নাচলিতে জুড়ে ফেলব তানাটা।

প্রথমে বিশকরম বলে চালিয়ে মাকু আঁকুপাঁকু করব না ভুলে
তায় ঝাঁপ তুলে ঘা দিব নটা।
তবে ঝাপে-ঝোপে বুনব কাপড় দিয়ে ও সাবির কাঁটা ॥

www.pathagar.com

কলে বলে নলি চালাব। ছিঁড়বে না খেঁই খাব সে দেই সাঁদ মেরে যাব
খুব দেখার আমার গুণ যেটা
কাপড় বুনব কষে নরাজ ঘিঁসে রাখব না দশি কাঁটা ॥

ভাল কাপড় বুনতে জানি চিরুণ কোটা পানের বোঁটা ঢাকাই জামদানী
তার ঢের কানি তা বুঝে দেয় কেটা
কুবির চরণ ভেবে বলে এবার এ দফাতে নাই ঘোঁটা ॥

৭

মন পিড়াও রে মানব-ইক্ষু শিক্ষা কলের চরকি পেতে।
গুরু নামামৃত সুধারস নির্গত হবে তাতে ॥

দয়াধর্মের পোয়াগাড়া, প্রবর্তক সাধকের ডাঁড়া
গুরু সিদ্ধরসের গোড়া, জাল দেয় বিষামৃতে।
রসে নয়ন ধরবে গুচি, হয়ে শুদ্ধ শুচি, রসের পাত্র হবে পঞ্চভূতে ॥

শ্রবণ করবি পেতে নিচে, বস রে মন তারই কাছে,
পূর্ণ হলে তোল ছেঁচে, রাখো অন্য বাসনেতে।
শেষে কারুয়ে বলে, জালে দিও তুলে চেতন হয়ে থাকা সম্মুখেতে ॥

ছয়জন ভালো টানের মুনিষ কেউ বা কুড়ি কেউ বা উনিশ
মন তাদের স্মরণ রাখিল পরমার্থ জানাইতে।
কুবির বলে ওরে মন আমার কথা শোন যুগল চরণ রেখো হৃদয়েতে ॥

৮

চাষা নইলে মানীর মান থাকে না কোন কালে
চাষার হলেরে ভাই খেয়ে সবাই কোঁচা দুলিয়ে চলে ॥

চাষা নইলে চাষ চলে না ভদ্রলোকের দিন চলে না
চাষা নইলে ভদ্র কেউ বলে না।
চাষায় না দিলে পর মহাজনকে মহাজন কে বলে ॥

চাষা হতে রাজার রাজা দেবতাদের সেবা মর্ম বুঝবে কেবা
চাষার দিব্য হাল শোভা জীবনরক্ষে মনলোভা
চাষার গুণ সুদুর্লভা যদি চাষার ফলে ॥

চাষার হলে উত্তম অধম সকলে বাঁচে টপ্‌পা ছাড়ে আর নাচে

www.pathagar.com

চাষার মান্য রাজার কাছে "এসো" বলে বসায় কাছে
এ কথা নয়কো মিছে প্রাণ চাষার ফসলে ॥

চাষাতে চালাচ্ছে মুলুক কৃষাণী করে উত্তম অধমের তরে
চাষার ক্ষেতে হলে পরে সবাই বাবুগিরি করে
চাষার না হলে পরে শিকেয় হাঁড়ি দোলে ॥

চাষার ক্ষেতে নাইক ফসল হয়েছে আকাল লোকের ভেঙেছে কপাল
উত্তম অধম হ'ল কাঙাল বাবু কাঙাল কাঙাল ভূপাল
মহাজন দিচ্ছেন দোশাল ধান ফুরালো বলে ॥

এই চাষের যে রাখে না মান ঈশ্বর করে তার অপমান
কুবির বলে চাষাকে দিবেন স্থান শ্রীচরণকোলে ॥

৯

পাকা রাস্তা রেলের উপর চলে যায় কলের গাড়ি।
হাবড়া আর হুগলী জেলা যেতে বেলা হয় না পুরো একঘড়ি।
সদা হুড় হুড় হুড় শব্দ করে হাওয়া ভরে দেয় পাড়ি ॥

কমে গরীবের পয়সা ভাড়া বাবুলোকের নিরিখ বাড়া
হায়রে জায়গা পায় তাকিয়া পাড়া তোফা কোটা ঘর বাড়ি
তাতে চড়তে চড়তে নামতে বলে হাঁই তোলে ঠিক দেয় তুড়ি ॥

রেলের গাড়ি ডেঙায় চলে ধোমার জাহাজ চালায় জলে
হায়রে আসমানে ফনাস জলে উড়ে পতঙ্গ ঘুড়ি
বাঙালি রেখে বশ করে কলে লুটে নিল ধন কড়ি ॥

তার-টাঙানো বাঙলা জুড়ে বসে খবর নিচ্ছে ঢুঁড়ে
হায়রে অন্যলোক ভাবছে পড়ে হার মেনেছে চৌপাড়ি
তারে হাত বুলায় জানে যেমন কবিরাজ ধরে নাড়ি ॥

কলের সুতায় কাপড় বুনে কলেতে জল তুলেছে টেনে
হায়রে কলেতে ধান্য ভানে গম পিষে কলে গুড়ি
কলে টাকা পয়সা কাগজ তৈয়ার কলেতে পাকায় দড়ি ॥

কলে করলে জব্দজমি নদনদী পুষ্করিণী ভূমি
হায়রে রাখলে না বেশি কমি এমনি ইংরেজের খড়ি
কলে নিশানেতে কয়লা পুতি বসে করলে ঝাণ্ডা গাড়ি ॥

www.pathagar.com

চোদ্দ পোয়া ধড়ের মাঝে বিচার করে বুঝে-সুঝে
হায়রে একি কল করেছে ইংরাজ ঘুরতেছে বত্রিশ নাড়ি
কুবির বলে সত্যি কলের কীর্তি চরণ নাই ছাড়াছাড়ি ॥

১০

সত্য মিথ্যা জেনে কর বিবেচনা রাং কি সোনা
হয় রাখো না হয় ফেলাও টেনে
পরের ধন কি হয় নিজের কোন ও তা বিচার কর দিব্য জ্ঞানে ॥

ব্রত বাগিশ জেলের মেয়ে তার ভাগ্যে এক মানিক পেয়ে
শুকনো ধাতু কঠিন বলে টান মারিয়ে ফেলায় বনে ॥

আর এক মানিক পেয়ে শ্যাকরানি আঁচলে বাঁধে তাও তো জানি
মানিক কে যে ছিল মন গুমানে ॥

গাধা পিটলে কি হয় রে ঘোড়া ঘোড়া কভু হয় না ভেড়া
শালগ্রাম হয় কি নোড়া থাকরে হেঁসেল ঘরের কোণে ॥

ঢেঁকির তাতে কি অপমান স্বর্গে গিয়েও ভানে রে ধান
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী পঞ্চ গুণে ॥

চন্দ্র কি হয় জোনাকি পোকা পণ্ডিত কি হয় মূর্খ বোকা
এ সকল মিথ্যা ধোঁকা ভেবো না মনে মনে ॥

রাজহংস কি হয় কানা বক ময়ুর কি হয় মুরগীর ঢক
হয় না কুবির বলে চরণ বিনে ॥

১১

সোনার সঙ্গেতে যে সোনকুঁচ থাকে
কখন সমতুল্য হয় না মূল্য টান মেরে ফেলায় তাকে
কেবল ওজনেতে এক রতি হয় এই কথা কয় সব লোকে ॥

চাঁদির সঙ্গে দস্তা চলে ফিটে ফাটা সিকি বাটা মিশায় আসলে।
যার যেমন গুণ তাই বলে তাকে যেমন দুগ্ধে বারি
পিরিত ভারি বিষম ঘোলা চারিদিকে ॥

মহৎ সঙ্গে অসতের চলন ধানের চিটে ফলের মিঠে

www.pathagar.com

মাকাল ফল যেমন সিন্দুরবরণ গঠন রংচঙে আছে
ভিতরেতে গোবর পোরা ভুলবে কে সে রূপ দেখে ॥

সর্পের মাথায় মাণিক রে ভাই ঢোঁড়ার মাথায় মাণিক কি পাই
আছে জোনাক পোকার ফুটকি আলো কি হবে তাতে কোন মুলুকে
কুবির কয় সেই আলোয় কি চাঁদ ঢাকে ॥

বেহাল শাহ্-এর গান

১

সর্ব প্রদাতা পরম দয়ালু খোদাতায়ালার নাম শু করতেছি।
হে এলাহি শয়তানেরও হস্ত হইতে যেন বাঁচি॥

পীর-পয়গম্বর ওলি-আওলিয়া যে পথে গেছেন চলিয়া
সেই পথ আমায় দাও দেখাইয়া দেখিয়া আনন্দে নাচি ॥

সমস্ত প্রশংসা খোদার যিনি সমস্ত জীব-জগতের সার
বিচার দিনের করতার আমি তাই কাছে আরজ জানাইতেছি ॥

যারা আছে বিপথগামী তাদের পরে ষ্ট স্বামী
বেহাল বলে শুনে আমি সর্বক্ষণ চিন্তাতে আছি ॥

তথ্যদাতা : সবজেল শাহ্, গ্রাম : কালুপোল, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা।
সংগ্রহের তারিখ : ১৮.১০.২০১১

২

আল্লার কুদরত বুঝিবে কে ভুবনে সকলি করিতে পারে আপনার মনে
মাতৃগর্ভে খারে দর্জাল ছিল তার গর্ভেতে দাড়ি উঠিল
হয়ে একটা গাধা রাখিল, চড়বার কারণে ॥

তার কপালে মুস্তাকিন লেখা, মুখ ছিল কাল যেত দেখা
বামের দুই পায় ধলা রেখে, রেখা বলে আইনে ॥

সবুজবর্ণ শরীর তাহার, ছমির চাঁদ সাঁই করেন প্রস্তাব
বেহাল শুনে হয়ে চমৎকার, পড়ে চরণে ॥

৩

প্রথমে আসরে আ'সে আমি মারফতের গান গালাম
সারা দিগর ঘুরে আলাম, মর্মকথা না পালাম
মর্মকথা পাতাম যদি গো নামাজ পড়িতাম আমিও হায়॥

www.pathagar.com

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজরে ভাই কেবা আনলো দুনিয়ায়
আবার কোন কোন ওয়াক্তে তসবি তেলোয়াত পড়ো
শুনাও আজ আমায়
পড়ে না শুনাতি পারলে গো আমি ছাড়ব না তোমায় ॥ ও হায়

ফজর জোহর আছর মাগরেব এশা দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত হয়
অধম বেহাল বলে আছরের নামাজ আছেরে আট রাকাত
আছেরের নামাজ পড়লে পরে তোর সুন্নত গোপন রয়॥ ও হায়

তথ্যদাতা : ২ ও ৩ সংখ্যক গান, আজিম শাহ, [জন্ম : ১৯৬২], বহালগাছি, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা। সংগ্রহের তারিখ: ১৫.২.২০১২

৪

আজব কথা শুনে মরি
বুঝিতে না পেরে তোমায় জিজ্ঞেস করি ॥

মায়ের গর্ভেতে ছেলে ছিল তার গর্ভেতে দাড়ি উঠিল
এমন ছেলে কে হয় বল আইনও ধরি ॥

সেই ছেলে এক গাধা রাখে তার কপালেতে কি নাম লেখে
বল কি রং ছিল গাধার মুখে বুঝতে না পারি ॥

দুই বাম পায়ের রং ছিল কেমন দয়া করে বল এখন
কি রূপ ছিল দেহের বরণ করে দেও জারি ॥

বেহাল বলে, ছমির চাঁদ সাঁই তোমার লীলার অন্ত বুঝা না যায়
এ সকল সৃষ্টি দুনিয়ায় করিলেন বারি ॥

৫

কে তুমি কারে নিতে এলে, পরিচয় দেও আমারে
পরিচয় না দিলে পরে, চিনব তোমায় কেমন করে ॥

দেখতেছি নবীন সুন্দরী, কথায় তেজ অতিশয় ভারী
সন্ধি করে বুঝতে নারী, কি বলতেছ কাহারে ॥

বাড়ি তোমার কোনখানেতে, বল আমার রাজসভাতে
কি নাম তোমার শুনব এবার, বল তোমার ভিতরে ॥

www.pathagar.com

তোমার ঐ ভাব দেখে, কত নিন্দা করবে লোকে
মেয়ে প্রাণী একাকিনী, বেহাল পড়ল কি ঘোরতরে ॥

৬

বৃন্দে নামে উদয় হলে, আমার এই মথুরাতে
মেয়ের মতো মেয়ে কত, রয়েছে এই জগতে ॥

আমার একটা কথা শুন, বৃন্দে তুমি সকল জান
আয়ানের স্ত্রী রাধা কেন, হইল কি জন্যেতে ॥

তুমি কোন যুগেতে কি নাম ধরে, জন্মিয়াছ এ সংসারে
তার আদি অন্ত বল মোরে, চিনি তোমায় ভাল মতে ॥

বৃন্দাবনের বৃন্দে যিনি, আমার প্রেমের গু তিনি
বেহাল বলে সত্য ইনি, চেনো কথার ভাবেতে ॥

৭

মান ছেড়ে দাও ওগো রাধে কৃষ্ণ কেন্দে যায়
কৃষ্ণ গেলে এহি কালে তোমার গতি হবে নাই ॥

কৃষ্ণের তরে মান করেছ কোনটুকু মনে ভেবে আছ
তোমার কাছে সেটুক শুনতে চাই।
তোমার মানের গোড়া যায় না ছেঁড়া নিজ গুণে কাট রাই ॥

যত কথা বলি আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি
ভালোর জন্য বলি সর্বদাই।
তুমি আমার কথা রদ কর না, বারে বারে কয়ে যাই ॥

তুমি ধনি মান ছেড়ে দাও, কৃষ্ণ পানে স্বচক্ষে চাও
ভাল তোমার হইবে নিশ্চয়।
কেবল দাসীর বেহাল, দাও চিরকাল খুশী হই সদাই ॥

৪-৭ সংখ্যক গান: জনাব মো: নিয়ামত আলী মাস্টার সাহেবের নিকট থেকে সংগৃহীত।
গ্রাম: গোবিন্দপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, জন্ম : ১৯৪৩। তারিখ : ০৪.০৫.২০১২।

রুস্তম শাহ্-এর গান

১

বারে বারে করি মানা যেও না ভাই ঢাকা শহরে
যাবি ঢাকা দেখবি ফাঁকা মুক্তা মানিক নেবে কেড়ে ॥

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে সিলেট যাবি আখাউড়া দেখতে পাবি
কিশোরগঞ্জের কি ছবি দেখবি রে তুই নয়ন ভরে ॥

সেই এলাকা পাহাড়ে ঢাকা কিছুমাত্র আছে ফাঁকা
গেলে পরে পাবি দেখা রাঙামাটি আর ঝিলপাথরে ॥

দুই পাইপে আগুন দিয়ে দয়াল বসে কোথায় গিয়ে
চিটাগাঙে গেলে পরে রুস্তম ফিরে আসবি নারে ॥

২

চেষ্টা করে কুষ্টা বুনে কষ্ট পেলাম বাজার দরে
কুষ্টা নিয়ে কতজনার গেড়ে গর্তে মলাম ঘুরে ॥

গেড়ে গর্তে পাট পচানো তাদের মাল হলো কাল
সস্তা দরে বেচে এল মারল মজা আড়তদারে ॥

বিল বাওড়ে যাদের ছিল তাদের পাটে রঙ ছড়াল
সে মাল কিনে ফড়ের পালে ধনীরা নেয় ব্যবসা করে ॥

এবার সবাই বলে আঁখ লাগাব দর্শনায় চিনি পাব
রুস্তম বলে ভালই হলো মারবে তোরে সারের দরে ॥

৩

চাষিরা চাষ করে লাগায় কত পটল ঝিঙে
কত জন মালা গলে রাস্তায় চলে চিমটে হাতে বাজায় শিঙে ॥

কত জন লাগিয়ে কুমড়ো হল ধুমড়ো কেউ মরল চিনে বুনে
কত জন লাগিয়ে শশা মারে মশা সাধু হল কেউ সিদ্ধি টেনে ॥

কত জন লাগিয়ে বাদাম পেয়ে সুনাম অচল জমি ফসল ফলায়
ঢাকাতে চালান দিল এইবার মরল তেল পেল না ঘানি টেনে ॥

অবশেষে তিনকানি ভুঁই আঁখ লাগিয়ে অধম রুস্তম আছে বসে
আঁখ না পেল ভেবে মরল নয় মণ হল টেনেটুনে ॥

তথ্যদাতা : মোছাঃ চায়না খাতুন [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রাম: ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ : ৩১.০৮.২০১২।

www.pathagar.com

মতলেব শাহ-এর গান

১

অজাত গাঁয়ের বেজাত বাছুর মেলে না সে এলে পালে।
হক্কা মেরে মাটি খোঁড়ে চলে সে তাল-বেতালে ॥

কানার পথ দেখালে পরে কানা গিয়ে খানায় পড়ে
কানা কি ভাই চিনতে পারে লাল কি হলুদ কোন কালে ॥

গর্ভকানার এমনি ধারা জ্ঞান-কানা হয় শতেক ধারা
যার দেলে মোহর মারা তার ভাগ্যে কি ধন মেলে ॥

তোরাপ সাঁইজি মহাজ্ঞানী অবুঝ মতলেব হয় অজ্ঞানী
বাঁয়ে বললে যায় সে ডানি কানা কি পথ চিনতে পারে ॥

২

অসম্ভব এক কথা শুনে লাগল মনে ভয়।
শূন্য-কারে এক মরা মরিল গোর দিল কোথায়॥

যখন সেই মরা মরিল সত্য করে আমারে বল
কয় জন লোক সেখানে ছিল দাফন কে করায় ॥

কোন কলেমায় জানাজা করল কোন ছুরা তখন পড়িল
বেউরা ভেঙে আমায় বল ওগো সাধু মহাশয় ॥

অধম মতলেব ভেবে বলে তোরাব সাঁইজির চরণতলে
আর দুটি তারা ছিল এখন তারা কোথায় রয় ॥

www.pathagar.com

৩

কলাগাছের কষ লেগেছে শাদা কাপড়েতে।
সাবান দিলেও ওঠে না কষ কাপড় নেব ধোপা বাড়িতে ৷৷

জানতাম যদি হয় গো এমন যেতাম না কলা বাগানে কখন
কিনে খাতাম মনের মতন যেয়ে ঐ বাজারেতে ৷৷

চাঁপা সবরী কলা ছিল মর্তমান ভাই জানা গেল
ঠটেকলার ছড়াছড়ি আর খুশি সবাই বাইশ ছড়াতে ৷৷

মতলেব কান্দে জারেজারে তোরাব সাঁইজির চরণ ধরে
চানাচুর যায় বাহার মেরে আমি পড়লাম ফেরে বিচে কলাতে ৷৷

৪

সব হারিয়ে ঘুরে মরি মনের মানুষ নাই।
একা বসে ভাবি আমি কি করি হায় হায় ৷৷

কি যে করি ভেবে মরি যাব বা কোন উদ্দেশ্যে
আমার দেখে যত মানুষ সবাই এখন হাসে
আমার এই কপাল দোষে কত দুঃখ পাই ৷৷

কূল হারানো পথিক আমি পথের পাই না দিশে
সর্ব অঙ্গ জ্বলে পুড়ে মলাম আমি দুঃখের বিষে
কেউ যদি মোর কাছে এসে পথের দিশা দেয় ৷৷

ঘর সন্ধানে জীবন বরবাদ জ্ঞানী লোকে কয়
মনের মানুষ ঠিক না হলে দুঃখে জনম যায়
অধম মতলেব শেষ কালে দেয় তোরাপ শার দোহাই ৷৷

৫

এখন আমি ভাবছি বসে ভাসি আঁখি নীরে।
আমার বন্ধু গেছে পরবাসে আসবে না আর ফিরে ৷৷

বড় আশা করে ঘর বান্ধিলাম ভাঙ্গা নদীর ধারে
সে ঘর আমার ভেঙে নিল কাল বোশেখী ঝড়ে
সেই হইতে দুঃখে মন আমার উথাল-পাথাল করে ৷৷

কত আদর সোহাগ করে গান শুনাইত মোরে

www.pathagar.com

আর কোন দিন শুনবো না গান সেই না মধুর সুরে
সে যে অচিন কোন দেশে গেছে
আমার কথা মনে নাহি পড়ে ॥

জ্ঞানী আর গুণীজনা সান্ত্বনা দেয় মোরে
তবু আমার অবুঝ মনকে বুঝাব কি করে
অধম মতলেব বিনয় করে তোরাব শার চরণ ধরে॥

৬

সোনা বন্ধুরে তুমি অমন করে মনে ব্যথা দিও না।
ব্যথা দিলে অন্তরে মোর সইবার শক্তি কেন দিলে না ॥

যুগে যুগে মোরে কান্দাও অমন করে
সে কথা বল না কেন মোরে
তোমার ভাল লাগে বলে কান্দালে আমারে
সে কথা তো বল না ॥

চন্দ্র হলেম হারা কি করিবে তারা অন্ধকারে
ডুবে গেল ভারা পাইলাম না তোমারে জনমের তরে
যুগে যুগে তোমায় যেন ভুলি না ॥

চুরাশির ফেরে কান্দালে আমারে
মায়া দয়া নেই বুঝি তোমার অন্তরে
অধম মতলেব বসে তোরাব শার আশে
যেন পাই তোমার চরণখানা ॥

৭

বাংলার বাউল হয়ে আমার জ্বালা হয়েছে
রাতে জ্বালা দিনে জ্বালা ঘরে জ্বালা দিতেছে ॥

এরশাদ সরকার দিল কষ্ট ঘোষণা করল ইসলাম রাষ্ট্র
বাউলের হল জীবন নষ্ট ফকিরের আস্তানা ভেঙেছে ॥

তের শো পঁচানব্বই বাংলা তারিখ হয়
ফকিরের আস্তানা ভাঙল মিথ্যা কথা নয়
সবাই মিলে যুক্তি করে বাউলদের হিন্দু ভেবেছে ॥

মাদরাসার ছাত্র এসে কুতুবপীরের দরগা ভাঙল মিথ্যা কথায়

www.pathagar.com

মর্তুজাপুরের কিতাবদ্দি পাঁচপীরের আস্তানা ভাঙল মিথ্যা কল্পনায় ॥

অধম মতলেব ভেবে বলে তোরাব সাঁইজির চরণতলে
বিচার চাই কাতর হালে আর সরকারের কাছে ॥

তথ্যদাতা : মতলেব শাহ, মোর্তজাপুর, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা,
সংগ্রহের তারিখ : ৮.৮.২০১২

রহমান শাহ-এর গান

১

বন্দেগী হীন বান্দা তোমার কি দিয়ে পাই খবর।
শুধু তোমার নাম শুনেছি জানিনে তার জের জবর ॥

জের জবরের খবর শুনি জেরে কি জবরে তুমি
কোন হরফে থাক তুমি নাম শুনি সাঁই নিরাকার ॥

তুমি আল্লাহ পরোয়ারে মহব্বতের আদমেরে
দোজখ যদি দাও আমারে রূপটি দেখাও এক নজর ॥

তুমি নিরঞ্জন কৃপা করে তোমার রূপের আলো দেখাও মোরে
রহমান পাগলে বলে ভক্তির শক্তি নাই আমার ॥

২

রহমান রহিম গো আল্লাহ জলিল জব্বার
শূন্যের উপর পরোয়ারে, রাগের আশ্রয়ে করে ভর ॥

শুনি সর্ব ধুমোময়, ধুমো ছাড়া আর কিছুই নয়
ধুমোকারের মধ্য থেকে আপনি হলেন দীপ্তকার ॥

নয় সিতারায় কর দৃষ্টি দশ লতিফা খোদার সৃষ্টি
মায়ের হুঙ্কারে ঝংকার সৃষ্টি চেতন হন সাঁই পরোয়ার ॥

নছিম শাহ দরবেশের বাণী দেল-কেতাবের খবর শুনি
বলো সবে আল্লাহ গনি রহমান করে প্রচার ॥

৩

আগে দেহের কথা বলগো আমায়
কয় চিজ দিয়ে দেহের গঠন করিয়েছেন দয়াময় ॥

কোন দিনেতে দেহের গঠন কোন দিনেতে কমল হয়

www.pathagar.com

কোন দিনেতে নাভি পয়দা মুখ পয়দা কোন দিনে হয় ॥

কোন দিনেতে পিঠ বুক পয়দা কোন দিনেতে চক্ষু হয়
কোন দিনেতে কর্ণ মগজ পয়দা করলেন মালেক সাঁই ॥

দলিলের ভেদ দেখে শুনে রহমান শা ভাবে মনে
যুক্ত হল বাবার বীজে জান পয়দা কোন দিনে হয় ॥

তথ্যদাতা : সালাম শাহ [জন্ম : ১৯৫৮], গ্রাম : কুমারী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।
সংগ্রহের তারিখ : ২৬. ৪. ২০১৩

আরজেদ শাহ-এর গান

রহিম রহমান তোমার গুণ গান গাইতে কি পারি আমি।
ওহে দয়াল ডাকে কাঙাল সাড়া দাও হে তুমি ॥

যখন ইব্রাহিমকে নমদ আগুনে দিলে তখন তুমি এই কালাম পড়েছিলে
ইয়া নাকুনি বারদাও ওয়াছালামান আলা ইব্রাহিমা আগুনকে দিলে না শক্তি ॥

রাসুলের হাতের উপর হাত তার উপর নুরের তাক
ফাচ্ছাম্মা অজহুল্লা দেখ মুখে আছে আঁকা ছুরা বাকারা চৌদ্দ কুতে প্রমাণ পাকাপাকি ॥

আরজেদ বলে ওহে সখা দয়া করে দাও হে দেখা
আর কি থাকতে পারি একা মিলনের আর কয়দিন আছে বাকি ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৩], গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

রবিউল শাহ-এর গান

হায় গো আল্লা বারি তালা কুদরত বুঝা হলো ভার
তোমার কুদরত তুমি বোঝ বোঝার শক্তি আছে কার ॥

লুত নামে পয়গম্বর ছয়দন শহরে ঘর
দ্বীন জারী কুদরত তারি আদেশ দিলেন পরোয়ার
বহুদিন ধরে নব্য ঈমান আনলেন তার বিবি দেখ সেই শহরের মাঝার ॥

সাজ্জাদ যেই দরজায় মল কোথায় তার জন্ম হলো
কতদিন পর বাদশাহী পেল তক্তের পরে দিল বাঁধ
শহরে যখন প্রলয় হলো লুত পয়গম্বর কোথায় গেল
বিবির কি হইল জানাও গু তার সমাচার ॥

www.pathagar.com

সাজ্জাদের মনে ছিল বাসনা দেখবে সে বেহেস্ত খানা
আজাজিল সামনে খাড়া দেখতে ভয়ঙ্কর
অধীন রবিউল কেন্দে বলে নুরালী শার চরণ তলে
আমি ডুবে মলাম ঘোর সাগরে দয়া করে কর পার ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৩], গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

কলিমুদ্দিন শাহ্-এর গান

জানিনা কখন ঘটিয়ে অঘটন ছয়টা ইঁদুর ঘরে ঢুকেছে
ইঁদুরের যন্ত্রণা প্রাণেতে সহেনা ঘরের মালামাল সব নষ্ট করছে ॥

সদর ঘরের ডুয়া ছিল পরিপাটি নয়টা ছিদ্রে ঠেলে দিল মালমাটি
সেও তো আমায় করল নষ্টটি আওড়ির মালামাল সব খেয়েছে ॥

বড় মাহাত্ম গুণ আছে মানকচুর ছিদ্রের মুখে দিয়ে দিলাম প্রচুর
সেও তো বড় শক্ত ইঁদুর এখন তেনার টুপলা কাটতেছে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৩], গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

মঈনুদ্দীন শাহ্-এর গান

যাত্রা দিলাম সাধুর দলে
জেলা কুষ্টিয়ায় বাবা লালন সাঁই সাধু সঙ্গ হয় পূর্ণিমার দোলে ॥

হল বৈকাল এল নড়বড়ে লোকাল প্রচণ্ড ভীড়ে সাধুদের কি হাল
সাধু মহাজনে ভেবে মনে মনে উঠল ট্রেনে বিষম ঠেলেঠুলে ॥

এসে হালসায় গমের বস্তায় যেয়ে পোড়াদায় গাঁট চাপা খায়
এলে জগতি কি যে দুর্গতি নামি কুষ্টিয়াতে হক নাম বলে ॥

লালন সাঁইজির আখড়াবাড়ি কালিগাঙ পাড়ে গ্রাম ছেঁউড়ি
কত পাগলা পাগলি ভাই গড়াগড়ি যায় ঐ না সাধুর চরণ তলে ॥

বেলা ডুবে সন্ধ্যা হলো যোগের মেলা লেগে গেল
একতারার সুর বাজে সুমধুর ডুগি বাজে দেখ জুড়ির তালে ॥

আফছার আলীর ভক্তির বলে এলাম লালন শার পূর্ণ দোলে
কৃপা কর সাঁই যেন চরণ পাই কাঙাল মঈনুদ্দীন রয় বেহালে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম: ১৯৪৩], গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

www.pathagar.com

চান্দু শাহ্-এর গান

পা ফাটা বিষম ল্যাঠা যার ফাটে সে জানে
কাঁঠালের আঠা দিলে তাতে কি আর মানে ॥

এক ফাটা দেখে এলাম মদিনারই মাঠে
কত জীব খাচ্ছে খাবি তাহারই তটে
গাউস কুতুব হারিয়ে গেল আরাফাতের ময়দানে ॥

এই ফাটার কি যন্ত্রণা জানেন সাঁই বারি তালা
হিসাব দিতে বাধবে ঠেলা তাহার দরশনে ॥

মতলেব শা বলছে ভালো পাগল চান্দু কেমন হলো
মালামাল সব হারিয়ে গেল ফাটা ত্রিভুবনে ॥

তথ্যদাতা : মো: নিয়ামত আলি মাস্টার [জন্ম : ১৯৪৩], গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা
সংগ্রহের তারিখ : ০৪.০৫.২০১২

মসলেম উদ্দিন-এর গান

১

মন একবার নিরিখ করে ধেয়ান করো
    সাধন ছাড়া মিলবে না ধন।
ও জ্ঞান চক্ষু দিয়ে নিরিখ করো
    বিরাজ করছে সাঁই নিরঞ্জণ ॥

কামের ঘরে তালা মারে
ছাড়ো মন বদখেয়াল।
অনুরাগের বাদাম ধরো
সুখে থাকবা চিরকাল।
যদি জানতে চাও মরণ
গুকে করো স্মরণ।
ফতোয়াবাজ মোল্লার কাছে
পাবে কি অমূল্য রতন ॥

যে ধন তোর হাতে দিল
    আসল খোদ মহাজন
রিপুর দোষে কামের বসে
    হারালিরে সেই রতন ॥

অধীন মসলেমউদ্দিন বলে
    খালি হাতে গেলে

খাল খেচে ছাল তুলে দেবে
বুঝবি শেষে আপন কোন জন ॥

২

কোন দেশের ঘরামি তুমি
এলে ভাই ঘর ছাতি।
ঘরের জুত না বুঝে মটকায় উঠে
পড়ে গেলে চানচেতে।

ঘরের পাড়ির উপর পাড় উঠেছে
কোণে লাগাবি কুনাচে খুঁটি ॥

শোনো বলি ও ঘরামি ভাই জিজ্ঞাসি তোমায়
ঘরের মাটি ধরে ছাঁইচ না কেটে
কয় বাতাড়ে মটকায় গেলি
ঘরের বাতাড় সেরে মটকা মেরে
কোন জাগায় বল নেমে আলি ॥

ঘরের মটকা ফুঁড়ে পানি পড়ে
মসলেম বলে কি হলো কি
আমি খুঁজে খুঁজে হলাম ধন্ধ
না পেলাম সেই ঘরামি।
যদি তার সন্ধান পেতাম
আটন-সাটন সেরে নিতাম
মটকায় লাগাতাম একটা ভাল পট্টি ॥

তথ্যদাতা : মসলেম উদ্দিন [জন্ম :১৯৩৮–মৃত্যু :২০১৩], গ্রাম : ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর,
সংগ্রহের তারিখ : ১৬.১০.২০১২

ঙ. বিচার গান

কোনো তত্ত্বমূলক বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে দিয়ে বিতর্কমূলক গানকে বিচার গান বলা হয়। জীবাত্মা-পরমাত্মা, শরিয়ত-মারেফত, নবুয়ত-বেলায়েত, রোজহাসর-কেয়ামত, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ, গু-শিষ্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বিতর্কে বিচারের অবতারণা করা হয়। কোনো একটি বিষয়কে নির্ধারণ করে তার পক্ষের দল প্রথমে প্রশ্ন করে যায়, বিপক্ষের দল ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে আবার একটি প্রশ্ন রেখে আসর ছেড়ে যায়। প্রতিপক্ষের দল আসরে এসে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার একটি প্রশ্ন করে। এভাবে একের পর এক প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে দিয়ে গান এগিয়ে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে বহুকাল ধরেই বিচার গানের প্রচলন রয়েছে এবং এ গানের একটি সমৃদ্ধ জম-জমাট ধারা এখনও চালু রয়েছে। শ্রোতা-দর্শক যেমন এ ধরণের গান উপভোগ করে, তেমনি পরিবেশনকারী গায়ক-বাদকরাও এ গান পরিবেশন করে উৎসাহের সাথে। এ ধরণের গান সারারাত ধরে বা তারচেয়েও বেশি সময় নিয়ে পরিবেশিত হয়। এখানে গু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর মূলক গানের সামান্য নমুনা দেওয়া হল।

প্রশ্ন

গুরু বলে যারে ডাকি সেই মানুষটি কে
যাঁর জন্য শিব যোগী হয়ে শ্মশানে থাকে ॥

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু পিতা-মাতা বর্তমান
মনে মনে কানে শুনে নয়নেতে দেয় প্রমাণ।
কানে শুনে জিহ্বায় কয় সাক্ষীতে হয় মামলার জয়
শতকোটি জীব উদ্ধার হয় চোখের একটি পলকে ॥

কোন গুরুর শ্রীপাদপদ্মে গয়াকাশী বৃন্দাবন
কোন গুরুর নাম করিলে ভয়ে পালায় কাল শমন।
কোন গুরুর পাতের ভাত সব কালে খায় সকল জাত
চণ্ডালের রাঁধা অন্ন ব্রাহ্মণে দেয় মুখে ॥

কোন গুরুর শ্রীপাদপদ্মে রঘুমণির দরশন
গোলোকে পুলকে হয় গুরু শিষ্যের সম্মিলন।
পূর্ণ চন্দ্র ভগবান যাঁর হৃদয়ে বর্তমান
চাঁদ ধরা চাঁদ বলাই বলে দয়া করো রুপোইকে ॥

হাজার হাজার কর্ম করি হাজার হাজার কর ঘুরাই
বীজের উদ্ধার না করিলে জীবের উদ্ধার নাইরে নাই।
বীজের উদ্ধার করে যে দীক্ষা-শিক্ষার গুরু সে
না জেনে ভাই ভজি আমরা বুড়ো ঠাকুর ভেড়াকে ॥

উত্তর

মন চেয়ে দেখলি নারে তারে
কারে দেখে ভুলে রইলি কোন আশে রসের পরে ॥

না চিনে বলো চিনি এ কিরে অসাধ্য শুনি
যখন পালায় সে মণি তুমি কন্দো উচ্চ স্বরে।
তোর চেনা জানা মানুষ হলে পালিয়ে সে কি যেতে পারে ॥

কৃষ্ণের বাক্য ভাগবতে আমি ভিন্ন নাই জগতে

www.pathagar.com

এখন দেখি সাথে সাথে জিজ্ঞাসিবে তুমি যারে।
আমি আমি সবাই বলে আমি কি কেউ চিনতে পারে ॥

যে বলে আমি কিছু নয় সে কি জানে কৃষ্ণ কোথায়
কৃষ্ণ কয় আমি প্রেমময় এ আমিকে ধারণ করে।
এও আমি এও আমি একাকী এ ত্রিসংসারে ॥

নিত্য অঙ্গে এসে লীলায় এ আমি দুভাগে মিলায়
সে আর আমি কোন ভিন্ন নয় একাত্মায় মিশতে পারে।
কাজ এবার একান্ত মনে চিনে ধরো রাজ্যেশ্বরে ॥

প্রশ্ন

গুরু বীজ হলো না অঙ্কুর সাধের মানবজমিতে।
এক নোনা লাগা উষর ভূমি পুড়ে গেল পাপ-ধূপেতে ॥

থাকতে জমি লাটের খাজনা জোটে না আমার
হলো বাকি খাজনায় নিলামজারি
মূল খতেনের পর হলাম সদর কাছারির ইন্তেজারি
সাজা পায় নানা মতে ॥

পিতা ছিল পতি বীজ করিতে যতন
পতিদ্রোহী পাতকেতে হারালাম সে ধন
অনাদিকাল তোমায় ভুলে পড়ে আছি কুকাপেতে ॥

শ্রীনাথ বলে পূর্ব আজ্ঞায় জুড়েছিলাম হাল
কাল্টা ভেঙে বেহাল হলাম হাল হয়েছে কাল
এখন হয়ে অনুপায় সকল বিকায় গোঁসাই হরির পদেতে ॥

উত্তর

চাষ না জেনে গেলি কেবল জংলা জমিতে
একে আনাংলা এঁড়ে বলদ কুড়ে ফ্যালে কুপথেতে ॥

চাষির কাছে চাষ শিখতে হয় মনরে অবোধ
নইলে ফাল মেরে খোঁড়া করবি দুইটা বলদ
হবে বতর খোঁড়া বাধাবি হাগড়া
নিবি মরণ ফাঁস কপালেতে ॥

গু নামে থুবনা গেড়ে আড় মারো কসে

www.pathagar.com

লোভী কামী হিংসা পশু না যেন প্রবেশে
গু বীজ গজায়ে ফেলবে কুশি
সেচবারি রূপ রসেতে ॥

শ্রীনাথ বলে গোঁসাই হরি দিয়ে ধর্ম জয়
যেমন এঁড়ে ব'চ্ছো তেড়ে ভাবনা কিছু নাই।
করে প্রেমের দেওয়া ফলায় মেওয়া
যাবে চতুর্বর্গের ফল দূরেতে ॥

প্রশ্ন

আমার হয় নারে সেই মনের মতো মন
কিসে জানব সেই রাগের করণ ॥

ষড়রিপু ইন্দ্রিয়ে ভুলে মন বেড়ায় রে ডালে ডালে
দুই মন এক মন হলে এড়ায় রে শমন ॥

রশিক ও ভক্ত যারা মনে মন মিশাল তারা
শাসন করে তিনটি ধারা পেল রে রতন ॥

কবে কাল নাগিনী হবে রে বশ সাধব কবে অমৃত রস
বিষেতে নাশ সিরাজ সাঁই কয় হলি রে লালন ॥

উত্তর

আপন মনের দোষে সতের সঙ্গ ভঙ্গ হলো।
তাতে কিছু হলো না বাকি রইল না
শুকনো ডাঙায় যেমন মীন পড়ে ম'লো ॥

মন হয়েছে কর্মকানা দিনের করণ তাও হলো না
কাঁচা রসে হয় আনাগোনা
কাঁচা রস তোর ট'কে যাবে তাতে আর ভিয়ান হবে
তাতে হয়না চিনি মিছরি দানা সাধুর মুখে শুনি কথা
জ্বাল দিতে দিতে দিনটা গেল ॥

মন যদি আপনার হত রত্ন মানিক চিনে নিত
কর্মে সে হতো না বিরত।
সাধন করে হতো সিদ্ধ হয়ে থাকত সতের বাধ্য
তাতে ফলত মেওয়া খাসা তুই বুঝলি নারে চাষা
তাতে দুর্দশা তোর ঘটে গেল ॥

www.pathagar.com

মন হয়েছে জন্ম কানা দিনের করণ তাও করো না
মন তুমি তার খোঁজ রাখো না।
দিনে দিনে দিন যেতেছে তোর পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হতেছে
একদিন হবে অন্ধকার চোখে দেখবে নাকে আর
পদ্মলোচন বলে গুরু সত্য জানা গেল ॥

তথ্যদাতা : ইউসুফ শাহ [জন্ম : ১৯৬০], গ্রাম: কালিদাসপুর, আলমডাঙ্গা উপজেলা।

চ. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বর এবং কনের বাড়িতে আলাদা আলাদাভাবে গ্রামাঞ্চলে বিয়ে উপলক্ষ্যে মেয়েলি গীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া বধূজীবনের নানা সুখ-দুঃখ, যৌতুক ও পণ-প্রথা, বিনোদনমূলক কৌতূক গীত, কনে বিদায়ের গান, বর-কনের কথোপকথনের গীত, শাশুড়ি-ননদের জ্বালাতন বিষয়ে কনের মর্ম-বেদনার গীত ও নাইওর প্রসঙ্গে গীতই মেয়েলি গানের অন্যতম বিষয়। মেয়েলি গীতের গায়িকা মূলত গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর মেয়েরা এবং তাঁরাই এর রচয়িতা। সুতরাং মেয়েলি গানগুলো যে মৌখিক সৃষ্টি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নারী মনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-হতাশা, অবারিত প্রকাশের কারণে মেয়েলি গীতের আবেদন বড়ই করুণ,মধুর, একান্ত মর্মস্পর্শী এবং স্পন্দনমুখর। হাসান হাফিজুর রহমানের ভাষায়, "মেয়েলি মনের উৎসভূমি থেকে মেয়েলি সংগীতের জন্মও এমনি সহজাত বলে মনে হয়। এ সংগীতে কোন পরিকর্ষণ নেই, পরিমার্জনা নেই, পরিকল্পনা নেই। শুধু বিশেষ কোনো ঘটনা-তাড়নায় মেয়েলি মনের স্মৃতি-আশা-হতাশা উন্মীলিত হয়ে প্রবাহ পেয়েছে এতে। এই মন খাঁটি, নিখুঁত, নিখাদ মেয়েলি মন, এই অনুভূতি সবকিছুকে ছাড়িয়ে একেবারেই মেয়েলি অনুভূতি।" [উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৩, ভূমিকা, পৃ. ক]

ভাষা রীতির প্রয়োগ কৌশল এবং বিষয় বস্তুর অনুষঙ্গ অনুধাবন করলে বোঝা যায় অন্তত তিন চারশো বছরের ভাষা রীতি এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতা মেয়েলি গীতে বজায় রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মেয়েলি গীতের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মেয়েলি গীতে শুধু চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলেরই নয় বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলের নারী মানসের পরিচয় বহন করে চলেছে। বিশ্বায়নের দ্রুত অভিঘাতে লোকসংস্কৃতির এসব সম্পদ দ্রুত বিলীন হতে বসেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার নিভৃত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক শিকড়-সন্ধানী মেয়েলি গানের এসব সম্পদ রক্ষার উদ্যোগ এখনই গ্রহণ করা দরকার।

১

কাঁঠাল পাতা জোড়া জোড়া পাতা আমের স
তোমাদের আল্লাদের কমলা দেখ তেল হলুদ মাখে।

www.pathagar.com

দুই চোখের পানিতে মাগো তেলের বাটি ভাসে
কমনি গেল নবীন বাদশা তেলের বাটি সাঁতার দিয়ে ধরো।

আমের পাতা জোড়া জোড়া কাঁঠাল পাতা স
তোমাদের আল্লাদের কমলা দেখ ক্ষীর খাতি বসে।
দুই চোখের পানিতে মাগো ক্ষীরির থালা ভাসে
কমনি গেল নবীন বাদশা ক্ষীরির থালা সাঁতার দিয়ে ধরো।

আমের পাতা জোড়া জোড়া কাঁঠাল পাতা স
তোমাদের আল্লাদের কমলা দেখো ক্ষীর খাতি বসে।
দুই চোখের পানিতে মাগো ক্ষীরির থালা ভাসে
কমনি গেল নবীন বাদশা ক্ষীরির থালা সাঁতার দিয়ে ধরো।

২

যে না ঘাটে সাধু গোছল করে
সেই না ঘাটে মেন্দির পাতা ভাসে।
কও দিনি মেন্দির পাতা মা'র বাড়ির খবর।

মা কান্দে খায় না ভাত পানি।
বুবু কান্দে যায় না শ্বশুর বাড়ি।

মা'র আমি কিনে দেব পরনে ঢাকাই শাড়ি।
বুবুর হাতে কিনে দেব লাল রেশমি চুড়ি।
ভাবির কিনে দেব আমি সিঁথির সিঁদুর।
শাড়ি পরে মা রাঁধতে যাবে হেঁশেল ঘরে।
শ্বশুর বাড়ি যাবে বুবু লাল চুড়ি পরে।
সিঁদুর পরে হাসি মুখে ভাবি যাবে শ্রীঘরে।
মা'র শাড়ি ছিঁড়ে যাবে বুবুর চুড়ি ভেঙে যাবে
ভাবির সিঁদুর কুলুঙ্গিতে কৌটোয় তোলা রবে।

৩

ভাবি লো পাটার উপর নোড়া থুয়ে
কন্যা লো পাটার উপর নোড়া থুয়ে
হলুদ বাটো ধীরে ॥

তোরা আয় সকালে বউ সকলে দুলালরে নাওয়াইতে
ভাবি লো ধীরে ধীরে ভাবি লো ঢালো পানি দুলালের অঙ্গেতে ॥

www.pathagar.com

তোরা আয় সকালে বউ সকলে দুলালরে নাওয়াইতে
ভাবি লো ধীরে ধীরে ভাবি লো মাখাও তেল দুলালের অঙ্গেতে ॥

তোরা আয় সকালে বউ সকলে দুলালরে নাওয়াইতে
ভাবি লো ধীরে ধীরে বউ লো ধীরে ধীরে
মাখাও হলুদ দুলালের অঙ্গেতে ॥

তোরা আয় সকালে বউ সকলে দুলালরে নাওয়াইতে
বউ লো ধীরে ধীরে ভাবি লো ধীরে ধীরে
মাখাও মেহেন্দি দুলালের অঙ্গেতে ॥

তোরা আয় সকালে বউ সকলে দুলালরে নাওয়াইতে
ভাবি লো ধীরে ধীরে ভাবি লো ধীরে ধীরে
মাখাও চন্দন দুলালের অঙ্গেতে ॥

ভাবি লো পাটার উপর ভাবি লো পাটার উপর নোড়া থুয়ে
হলুদ বাটো ধীরে
ওরে আয় তোরা আয় সকলে দুলালরে নাওয়াইতে ॥

৪

নদীর কূলে ঘাটে বান্ধা ওরে ষোল দাঁড়ীর পানসী।
কোন বা দেশের সাধু তুমি কোন বা দেশে থাকো।
হারে মন কোকিলে ॥
সারি সারি বান্ধা গো পানসী আমি কলস ভরে উঠি।
হারে মন কোকিলে ॥

এমন সুন্দরী কন্যা তুমি ও তোমার নাকও দেখি খালি ।
কোন বা দেশের সাধু তুমি কোন বা দেশে থাকো
সারি সারি বাঁধা গো পানসী আমি কলস ভরে উঠি ।
হারে মন কোকিলে ॥

আমার সাথে কহরে কথা হারে মন কোকিলে
তোমার নাকও মানায়ে নথনী দেব হারে মন কোকিলে ॥

কোন বা দেশের সাধু তুমি কোন বা দেশে থাকো
তোমার সাথে কথারে ক'লে আমার ভাইয়ের সম্মান যাবে।
হারে মন কোকিলে ॥

www.pathagar.com

তোমার ভাইয়ের সম্মান আমি সালামে তুলে নেব।
হারে মন কোকিলে ॥

কোন বা দেশের সাধু তুমি কোন বা দেশে থাকো
তোমার সাথে কথারে ক'লে আমার চাচার সম্মান যাবে।
হারে মন কোকিলে ॥
তোমার চাচার সম্মান আমি সালামে তুলে নেবো।
হারে মন কোকিলে ॥

কোন বা দেশের সাধু তুমি কোন বা দেশে থাকো
তোমার সাথে কথা ক'লে আমার বাপের সম্মান যাবে।
হারে মন কোকিলে ॥
তোমার বাপের সম্মান আমি সালামে তুলে নেবো।
হারে মন কোকিলে ॥

সারি সারি বান্ধা গো পানসী আমি কলস ভরে উঠি।
কোন বা দেশের সাধু তুমি পথ ছেড়ে দাও আগে।
বাপজানের মান রেখে আমি গো আগে ফিরি ঘরে।
হারে মন কোকিলে ॥

সারি সারি বান্ধা গো পানসী আমি কলস ভরে উঠি।
কোন বা দেশের সাধু তুমি পথ ছেড়ে দাও আগে।
চাচাজানের মান রেখে আমি গো আগে ফিরি ঘরে।
হারে মন কোকিলে ॥

সারি সারি বান্ধা গো পানসী আমি কলস ভরে উঠি।
কোন বা দেশের সাধু তুমি পথ ছেড়ে দাও আগে।
ভাইজানের মান রেখে আমি গো আগে ফিরি ঘরে।
হারে মন কোকিলে ॥

৫

পঞ্চকন্যা ওলো আমার পঞ্চ মুখ
ফুলকুমারের বাপের যেন হনুমানের মুখ।
সেই হনুমান খাইয়ে গেল আমার কলাবাগানের কলা ॥

উড়ো যন্তর পেতে এবার হনুমান বাধাবো
আদায় করব রে আমার কলাবাগানের কলা ॥

www.pathagar.com

পঞ্চকন্যা ওলো আমার পঞ্চ মুখ
খেয়ে গেলরে আমার কচুবাগানের কচু ॥

উড়ো যন্তর পেতে আমি না আমি শুয়োর বাধাবো
আদায় করব রে আমার কচুবাগানের কচু ॥

পঞ্চকন্যা ওলো আমার পঞ্চ মুখ
খাইয়ে গেল আমার কাটান দেওয়া মোরগ ॥

উড়ো যন্তর পা'তে এবার শিয়েল বাধাবো
আদায় করব রে আমার কাটান দেওয়া মোরগ ॥

৬

ঘুমের না জাদু আমার আমার ঘুমের না জাদু
সেই না জাদুরে ডুলিতে তুলে দিলাম
আদ্দেক পথে যাইয়ে জাদু ঠোঁট ফুলিয়ে কান্দে ॥

কিসের দুঃখে কান্দো ভানু বলো আমার কাছে
এই না দুঃখে কান্দি সাধু বাপজান নাইকো সাথে ॥

ডুলির কাপড় তুলে দেখ ভানু বাপজান সামনে আছে
ঘুমেরও না জাদু আমার ডুলির কাপড় তুলে দিলাম ॥

আদ্দেক পথে যাইয়ে জাদু কান্দে অভিমানে
কিসের দুঃখে কান্দো ভানু বলো আমার কাছে ॥

এই না দুঃখে কান্দি সাধু চাচাজান নেই সাথে
ডুলির কাপড় তুলে দেখো চাচাজান আছে পাছে ॥

৭

আইয়ে জলে ঘিরিলাম ও ছেলের মা জননী গো
হাজার টাকা ফেলে তোমার ছেলে খালাস করো।

আইয়ে জলে ঘিরিলাম ছেলের চাচিজান গো
পাঁচশ টাকা ফেলে এবার ছেলে খালাস করো।

আইয়ে জলে ঘিরিলাম ও ছেলের খালামনি গো
তিনশ টাকা ফেলে এবার ছেলে খালাস করো।

www.pathagar.com

আইয়ে জলে ঘিরিলাম ও ছেলের দাদি গো
দুশো টাকা ফেলে এবার নাতি খালাস করো।

আইয়ে জলে ঘিরিলাম ও ছেলের নানি গো
একশ টাকা ফেলে এবার নাতি খালাস করো।

৮

ময়নার মা'র মহলে ঘন ঘন চৌকিদারে হাঁকে
ও তার লাঠিতে বাজে ঝুমুর ঝুমুর
ওরে কালো ভোমরা রে ॥

ময়নার মা'র মহলে ঘন ঘন চৌকিদারে হাঁকে
ও তার চেকন সিঁথি দেখে পাগল হই
ওরে কালো ভোমরা রে ॥

ময়নার চাচির মহলে কেন গোমস্তা ডাক ছাড়ে
ও তার হাইলকো কোমর দেখে হই পাগল
ওরে কালো ভোমরা রে ॥

ময়নার ভাইবোন মহলে গেরামের মাতব্বর ডাক ছাড়ে
ওরে কালো ভোমরা রে ॥

ও তোর চেকোন নাক দেখে রে পথের মানুষ পাগল হলো
ওরে কালো ভোমরা রে ॥

৯

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না মারে থুয়ে যেও বান্দা।
এমন দেশের এমন বিচার মারে থুয়ে গেলাম বান্দা
হাতের ঘড়ি বন্দক থুয়ে মারে নিয়ে যাব দেশে ॥

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না খালারে থুয়ে যেও বান্দা।
এমন দেশের এমন বিচার খালারে থুয়ে গেলাম বান্দা
হাতের মাল বন্দক থুয়ে খালারে নিয়ে যাব দেশে ॥

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না চাচিরে থুয়ে যেও বান্দা।

www.pathagar.com

এমন দেশের এমন বিচার চাচিরে থুয়ে গেলাম বান্দা
মুখের বাঁশি বন্দক থুয়ে চাচিরে নিয়ে যাব দেশে ॥

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না দাদিরে থুয়ে যেও বান্দা।
এমন দেশের এমন বিচার দাদিরে থুয়ে গেলাম বান্দা
মাথার টুপি বন্দক থুয়ে দাদিরে নিয়ে যাব দেশে ॥

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না নানিরে থুয়ে যেও বান্দা।
এমন দেশের এমন বিচার নানিরে থুয়ে গেলাম বান্দা
পায়ের জুতো বন্দক থুয়ে নানিরে নিয়ে যাব দেশে ॥

গোয়াল দুয়োরে সাজে-না-সোজে ঘরে তোতা ময়না
পালায় যদি হায় গো ময়না ফুফুরে থুয়ে যেও বান্দা।
এমন দেশের এমন বিচার ফুফুরে থুয়ে গেলাম বান্দা
হাতের আংটি বন্দক থুয়ে ফুফুরে নিয়ে যাব দেশে ॥

১০

খড়ি খুটতি গিয়েরে ভানু বাঁশঝাড়ের গোড়ে
কি সাপে দংশালো ভানুর অমনি ঢুলে পড়ে।
জাত সাপে দংশালো ভানুর কি উপায় গো হবে।
কমনে গেলো শ্বশুর আমার ওঝা ডেকে আনো
ভাল করে ঝাড়ো ওঝা আমার চানভানুর বিষ।
কানের দুল খুলে আমি দেব ওঝার হাতে।

খড়ি খুটতি গিয়েরে ভানু বাঁশঝাড়ের গোড়ে
কি সাপে দংশালো ভানুর অমনি ঢুলে পড়ে।
জাত সাপে দংশালো ভানুর কি উপায় গো হবে।
কমনে গেল ভাসুর আমার ওঝা ডেকে আনো
ভাল করে ঝাড়ো ওঝা আমার চানভানুর বিষ।
গলার হার খুলে আমি দেব ওঝার হাতে।

খড়ি খুটতি গিয়েরে ভানু বাঁশঝাড়ের গোড়ে
কি সাপে দংশালো ভানুর অমনি ঢুলে প'লো।
জাত সাপে দংশালো ভানুর কি উপায় গো হবে।
কমনে গেল বাপজান আমার ওঝা ডেকে আনো

www.pathagar.com

ভাল করে ঝাড়ো ওঝা আমার চানভানুর বিষ।
হাতের চুড়ি খুলে আমি দেব ওঝার হাতে।

১১

বলি ও দরদের চাচা তুমি
ভালো করে ঘেরো সোনার বাড়ি রে
ওরে শনিবারের দিন সাজেগুজে
ওরে আসপে রাজার বেটা রে ॥

বলি ও দরদের মামুজান রে
তারকাটা দে ঘেরো সোনার বাড়ি রে
রাজার বেটা শনিবারের দিন
ওরে আসপে সেজেগুজে রে ॥

বলি ও দরদের ভাইজান রে
তারকাটা দে ঘেরো সোনার বাড়ি রে
রাজার বেটা শনিবারের দিন
আ'সে নিয়ে যাবে তোমার আদরের বুনিরে ॥

বলি ও বাপজান আমার খেলাঘর ভা'ঙে
নিয়ে যাবে রাজার বেটার দেশে রে
ও দরদের বাপজান তুমি চোখের পানি মোছোরে ॥

১২

কলা লাগালাম সারি নলা লাগালাম সারি
ও সারি রে আমার ডা'গোয় ঘিরল বাড়ি
আমার মোচায় ঘিরল বাড়ি ॥

আমার আবাল বিয়ে ও শিশু বেলুনার বিয়ে
ও রে আমার ঘর হয়ে গেল খালি রে
ও রে আমার বাড়ি হয়ে গেল খালি রে ॥

বেলুনার মা সে কান্দে বলে আমার বাড়ির মানান গেল
আহা আমার ঘরের মানান রে গেল।
দামাদের মা সে হেসে বলে আমার ঘরের মানান রে এল
আহা আমার বাড়ির মানান রে এল ॥

১৩

সাধু থাকে বিদেশেরে তাই ভানু কানছে মনে মনে
কিসের জন্য কানছ রে ভানু তাই বল আমার কাছে। ও কি নাহারে

www.pathagar.com

তোমার সাথে বললে রে ভাবিজান মিটপে নাহারে জ্বালা। ও কি নাহারে
আমার সাথে বললে রে ভানু মিটপে তোমার জ্বালারে। ও কি নাহারে
সেই না কথা শুনেরে ভানু শাড়ির অঞ্চল কাটে। ও কি নাহারে
শাড়ির অঞ্চল কেটেরে ভানু বানায় একটি পত্র। ও কি নাহারে
হাতের আঙুল কেটেরে ভানু বানায় একটি কলম। ও কি নাহারে
চোখের জলও দিয়েরে ভানু পত্রখানি লেখে। ও কি নাহারে
পত্রখানি লিখেরে ভানু কাউওর ঠোঁটে দেয়। ও কি নাহারে
আমার সাধু গোছলরে করে সামনেতে উড়ো রে। ও কি নাহারে
আমার সাধু খাতি বসে আড়ায় বসে ডেকো রে। ও কি নাহারে
আড়ায় বসে ডেকে রে কাক পত্রখানি ফেলে রে। ও কি নাহারে
পত্রখানি নিয়ে রে সাধু কাঁদছে মনে মনে রে। ও কি নাহারে
আমার সাধু শুয়ে পড়ে পত্রখানি পড়ে রে। ও কি নাহারে
পত্রখানি পড়ে রে সাধু কাঁদছে মনে মনে রে। ও কি নাহারে
দেশের থেকে এয়েছে রে পত্র বাড়ি যাতি হবে রে। ও কি নাহারে

১৪

হিজল গাছে শুকনো খড়ি
ও বাপজান দূরে শ্বশুর বাড়ি
ভালো দেখে আনবেন শাড়ি
বাপজান যাব শ্বশুর বাড়ি
ও বাপজান যাব শ্বশুর বাড়ি ৷৷

রাত পোহালি শাশুড়ি দেবে খোঁটা
ও বাপজান ঝরবে চোখের পানি
ও বাপজান ফাটবে বুকের ছাতি ৷৷

ভালো দেখে আনবেন চুড়ি বাপজান
বাপজান যাব শ্বশুর বাড়ি
ও বাপজান যাব শ্বশুর বাড়ি ৷৷

রাত পোহালি ননদে দেবে খোঁটা
ও বাপজান ঝরবে চোখের পানি
ও বাপজান ফাটবে বুকের ছাতি ৷৷

১৫

বাপও মায়ে দিয়েছে পুকুর তাইতে ভেসেছে পোনারে
আজব তামাশার পোনারে।
জাল নেইকো জেলেনি নেইকো কি দিয়ে ধরব পোনারে ৷৷

www.pathagar.com

জামুর কান্দে লাল গামছা তাই দিয়ে ধরব পোনারে
সেই না পোনা ধরেরে জামুই সোনার খালুইতি থুলোরে ॥

সেই না খালুই নিয়েরে জামই শাউড়ির হাতে দিলরে
সেই না খালুই নিয়েরে শাউড়ি হেঁসেল ঘরে উঠলরে ॥

হেঁসেল ঘরে উঠেরে শাউড়ি সোনার বটি নিলরে
সোনার বটি নিয়েরে শাউড়ি সেই না পোনা কাটেরে ॥

সেই না পোনা কুটেরে শাউড়ি সোনার মালসাই ধুলোরে
সেই না পোনা ধুয়েরে শাউড়ি সোনার পাটায় বাটেরে ॥

সোনার পাটায় বেটেরে শাউড়ি সোনার কড়ায়ে রান্দেরে
সোনার কড়ায়ে রান্দেরে শাউড়ি একটু চেখে দেখেরে
শাউড়ি মাছ চাখতি চাখতি সব ফুরিয়ে গেলরে ॥

ভাত খাতি বসেরে জামুই পোনার বিচার তুললরে
ঘরে এয়েছে সোনার বিড়াল সেই খেয়েছে পোনারে ॥

ভাত খাওয়া থুয়েরে জামুই বিড়াল খুঁজে আনেরে
বিড়াল খুঁজে এনেরে জামুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে রে ॥

দশের মধ্যে গিয়েরে বিড়াল জোড় হাত করে দাঁড়ায় রে
তোমার শাউড়ি খেয়েছে পোনা আমার কেন মারলি রে ॥

১৬

বার বার বছর কালে বাপজান
যাইনি নাইয়র পুরা গো
তোমার সোনা কালুয়া হয়ে রইছি ॥

ভাতের কষ্টে বাপজান আমি
মাটি খেয়ে থাকি গো
তোমার সোনা কালুয়া হয়ে রইছি ॥

বাড়ি যেয়ে দিও খবর বাপজান
সোনা ভালো আছে গো
তোমার সোনা কালুয়া হয়ে রইছি ॥

www.pathagar.com

কাপড়ির কষ্টে ভাইজান আমি
তেনা পরে আছি গো
তোমার সোনা কালুয়া হয়ে রইছি ॥

বাড়ি যেয়ে দিও খবর ভাইজান
সোনা আছে ভাল গো
তোমার সোনা কালুয়া হয়ে রইছি ॥

১৭

কালো কালো কালুটে বেগুন চিকন চিকন পাতা। ও কি কাজল ভোমরা রে
সেই না বেগুন তুলতে গিয়ে হাতে ফুটল কাঁটা। ও কি কাজল ভেমরা রে
সেই না বেগুন নিয়ে রে দামাদ বাড়ি ফিরে এল। ও কি কাজল ভেমরা রে
বাড়ি ফিরে এসে রে দামাদ নিজের ঘরে ওঠে। ও কি কাজল ভোমরা রে
নিজের ঘরে উঠে রে দামাদ নিজের বাক্স খোলে। ও কি কাজল ভোমরা রে
নিজের বাক্স খুলে নিজের টাকা নিল। ও কি কাজল ভোমরা রে
নিজের টাকা নিয়ে রে দামাদ ডাক্তার বাড়ি গেল। ও কি কাজল ভোমরা রে
ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই আমার একটি কথা। ও কি কাজল ভোমরা রে
আমার হাতে ফুটেছে কাঁটা বের করতি হবে। ও কি কাজল ভোমরা রে
এমন করে বের করবেন কাঁটা চুলের চেয়েও চিকন। ও কি কাজল ভোমরা রে

১৮

ঝালের ও নাড়ু না কিসের ও নাড়ু
ভাজলাম থরেরে থরে
সেই না নাড়ু ভেজে রে বিবি
আন্ধার ঘরেরে গেল
ও বিবি গা তোলরে ॥

আন্ধার ঘরে গিয়েরে বিবি
কিসের বড়িরে খেল
বিবি বিষের বড়িরে খেল
ও বিবি গা তোলরে ॥

কোমনে গেল রে দামাদ ছোঁড়া হারে
ওঝা খুঁজে আনো ডাক্তার ভালো আনো
আলমডাঙ্গা সব দিগরে খুঁজে আলাম রে
না পালাম ওঝা না পালাম ডাক্তার
ও বিবি গা তোলরে ॥

www.pathagar.com

আমার বিবি যদি নাহ্‌রে বাঁচে
আমি নদীতে ঝাঁপ দেব
ও আমি পানিতে ডুবে মরব
ও বিবি গা তোলরে ॥

১৯

ঘরের কান্টায় বুনলাম শাকও শাকও ভালো হ্‌ল রে
সেই না শাকও তুলতে গিয়ে মাজা হ্‌লফল করে
ও দরদের ভাইজানরে ॥

কোলের যাদু ধন ঘুমিয়ে কাতর
কোন বা ঘরে শোয়াইরে দরদের ভাইজানরে ॥
ঐ না ঘরে উঠোনা গো ননদী টাকা পয়সার ঘর
টাকা পয়সার ভুগি যে নাইও বাবা মারও ভুগি রে
ও দরদের ভাইজানরে ॥
ঐ না ঘরে উঠোনা গো ননদী ধান ও চালের ঘর
ধান ও চালের ভুগি যে নাইও বাপ ও ভায়ের ভুগি
ও দরদের ভাইজানরে ॥

২০

পগার কেটে তুললাম মাটি বাঁশ ঝাড়ের গোড়ে রে
মনের ময়না রে ॥
বারে বারে করি মানা যাসনে জোলা পাড়ায় রে
মনের ময়না রে ॥
জোলা পাড়ার ছেলেপিলে সুতো পড়া জানে রে
সুতো পড়া দিয়েরে ময়না ভুলিয়ে রাখপে তোরে রে
মনের ময়না রে ॥
বাপের ঝিও নাইরে ময়না খুঁজে আনবে তোরে রে
মনের ময়না রে ॥
বারে বারে করি মানা যাসনে কলু পাড়ায় রে
মনের ময়না রে ॥
কলু পাড়ার ছেলেপিলে তেলও পড়া জানেরে
তেলও পড়া দিয়ে রে ময়না ভুলিয়ে রাখপে তোরে রে
মনের ময়না রে ॥
চাচার ঝিও নাই রে ময়না খুঁজিয়া আনবে তোরে রে
মনের ময়না রে ॥

www.pathagar.com

২১

ডালিম গাছে ডালিম ধরে রসের ভারে ডালিম খসে পড়ে
কার কাছে যাব আমি আমার কপালে কিবা দোষ আছে ॥

বাক্সর শাড়ি বাক্সে রইল শেরের স্বামী আমার পরে নিল
কার কাছে যাব আমি আমার কপালে কিবা দোষ আছে ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসের কালে শান্তির কলমি জলে ভাসে
ডালিম গাছে ডালিম ধরে রসের ভারে ডালিম খসে পড়ে ॥

কার কাছে যাব আমি আমার কপালে কিবা দোষ আছে
বুড়ো শাওড়ির গালে কালি এ রাত আমি একলা কাটাই কি করে ॥

ঘরের পেছনে বেগুন গাছ নতুন বেগুন ধরে
সদাই আগুন জ্বলে মনে এ রাত আমি কাটাই কেমন করে ॥

২২

ঐ পাড়াতে দেখেরে আলাম দুই সতীনের খেলা রে
মালেকা পতি কন্যা নারেকে।
একও মাথার তেলওরে মালেকা দুইও মাথায় করবরে।
মালেকা পতি কন্যা নারেকে ॥

তবু সতীন ঘরে আমি আনব রে
মালেকা পতি কন্যা নারেকে।
একও পরণের শাড়ি রে মালেকা দুইও পরণে পরোরে।
মালেকা পতি কন্যা নারেকে ॥

সতীন সতীন করনা রে মালেকা
সতীনের বড় জ্বালা রে
মালেকা পতি কন্যা নারেকে ॥

২৩

হেলা গাছে দুলারে হেলে দুলে পড়েরে
বাবা আনবে শাড়ি দাদা আনবে হাঁড়ি
দামাদ আনবে চন্দন কাঠের নাকড়ি ॥

রান্দা ঘরের রান্দনি বাড়া ঘরের বাড়নি
বাড়তে বাড়তে কাপড় হলো ময়লা ও নাহারে ॥

www.pathagar.com

কমনে গেল কাচনি কোমনি গেল ধোয়ানি
কাচিয়ে দেও মোর বিবির পরণের শাড়ি ও নাহারে ॥

সেই না কাপড় মাখিয়ে সেই না কাপড় নাড়িয়ে
সেই না কাপড় ঢালিয়ে মোর সোনার ঝিনঝিন পাটে ও নাহারে ॥

সেই না কাপড় কাচিয়ে সেই না কাপড় ধুইয়ে
সেই না কাপড় নাড়িয়ে দাও মোর কুসুম ফুলের আড়েরে
ও নাহারে ॥

পশ্চিমে মেঘ পূবে বাতাস হুড়মুড়িয়ে আসে
সেই না কাপড় উড়ে গেল জুলেখারও দেশে ও নাহারে ॥

পাখি যদি হতাম আমি ডালে বসে দেখতাম
তবু দেখতাম জুলেখারও মুখ ও নাহারে ॥

২৪

ছোট ছোট তেঁতুল গাছ চিরল চিরল পাতা
আমার সোনার ময়নারে আমি কার হাতে সঁপি ॥

শউরির হাতে সঁপে দিলি তামুক সেজে নেবে
আমার সোনার ময়নারে আমি কার হাতে সঁপি ॥

শাউড়ির হাতে সঁপে দিলি পান ছেঁচে নেবে
আমার সোনার ময়নারে আমি কার হাতে সঁপি ॥

জায়ের হাতে সঁপে দিলি ভাত রাইন্দে নেবে
আমার সোনার ময়নারে আমি কার হাতে সঁপি ॥

স্বামীর হাতে সঁপে দিলি আলক করে থোবে
আমার সোনার ময়নারে আমি কার হাতে সঁপি ॥

স্বামীর হাতে সঁপে দিলি সোনা যত্ন করে থোবে
আমার সোনার ময়নারে আমি জামুর হাতে সঁপি ॥

তথ্যদাতা : চায়না খাতুন, জন্ম : ১৯৫৪, গ্রাম- ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, পেশা : গৃহিণী, তারিখঃ ১৫.১০.১২, আনেছারা খাতুন, জন্ম : ১৯৬২, গ্রাম- ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, পেশা : গৃহিণী, তারিখঃ

www.pathagar.com

১২.১০.২০১২, শরিফা খাতুন, জন্ম : ১৯৭০, গ্রাম- তিওরবিলা, আলমডাঙ্গা, পেশা : গৃহিণী, ২৩.০৪.২০১৩, ইতিমন নেছা, জন্ম : ১৯৬৭, গ্রাম- হাজরাহাটি, চুয়াডাঙ্গা সদর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ১৭.৯.২০১২, নাসিমা পারভীন, জন্ম : ১৯৭৭, চুয়াডাঙ্গা সিনেমা হল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, পেশা : গৃহিণী, তারিখ : ১১.১০.২০১২, ছমিরন নেছা, জন্ম : ১৯৬২, গ্রামঃ বিষ্ণুপুর, দামুড়হুদা উপজেলা, পেশাঃ গৃহিনী, তারিখ : ১৪.১০.২০১২, রোজেকা খাতুন, জন্ম : ১৯৯২, গ্রাম : ঘোষবিলা, আলমডাঙ্গা উপজেলা, পেশা : ছাত্রী, তারিখ : ২০.০৯.২০১২, খাদিজা খাতুন, জন্ম : ১৯৮২, গ্রাম : বড়বলদিয়া, দামুড়হুদা উপজেলা, তারিখ : ২৩.০৮.২০১২, মর্জিনা বেগম, জন্ম : ১৯৬৭, ফার্মপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, তারিখ : ১০.০৯.২০১২, সুফিয়া খাতুন, জন্ম : ১৯৯২ গ্রাম : ঘোষবিলা, আলমডাঙ্গা উপজেলা, তারিখ : ২২.০২.২০১৩, শিলা খাতুন, জন্ম : ১৯৬৭, গুলশান পাড়া, চুয়াডাঙ্গা, তারিখ : ২৮.০৮.২০১২

ছ. বারৈঙ্গে গান

বারৈঙ্গে গান চুয়াডাঙ্গার কৃষকদের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় আঞ্চলিক কর্মসংগীত। একক অথবা সমবেত কণ্ঠে মন-উদাসী মেঠোসুরে বারৈঙ্গে গান গাওয়া হয়ে থাকে। বারৈঙ্গে গান নিষিদ্ধি প্রেমের আদি রসাত্মক ও অবৈধ প্রণয় কথায় পূর্ণ থাকে বলে এ গান মাঠে-ঘাটেই গাওয়া হয়ে থাকে। বিষয়বস্তুর জন্য বিগত কারণে গ্রামের ভেতরে এ গান গাওয়া সম্ভব নয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, গ্রাম্য নরনারীর প্রণয়-লীলার জৈবিক আকুলতা, যৌন-বিষয়ক ঠাট্টা-তামাশা ও বিরহকথা এই গানের প্রধান অবলম্বন। বারৈঙ্গে গান মৌখিক রীতি নির্ভর হওয়ায় একে বারাঙ্গে, বারিঙ্গে, বারিঙ্গা ইত্যাদি নানাভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

বারৈঙ্গে গান মূলত কৃষকদের গান। বর্ষাকালে এই গান বেশি গাওয়া হয় বলে একে বারাষে গানও বলা হয়ে থাকে। বর্ষা থেকে বারাষে এবং বারাষে থেকে বারৈঙ্গে হয়েছে বলে মনে হয়। চুয়াডাঙ্গা এলাকার লোক-কবিরাই এর রচয়িতা। গানের ভণিতায় কবির নাম উল্লেখ থাকে না। এ গানে প্রথাগত কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। থালা-ঘটি-বাটি বা নিড়ানি, কাস্তে ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই তালে তালে বাজিয়ে এ গান গাওয়া হয়। সারি বেঁধে ধান-পাট নিড়ানো, ধান-পাট কাটা বা ফসল খেতে কাজ করার সময়ে মূল গায়ক মাঝখানে দাঁড়িয়ে টানা দীর্ঘ সুরে এই গান গেয়ে যায়। বাকি সবাই পরে তার সাথে দোহার করে। সুর এবং বিষয়বস্তুর আকর্ষণ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে এই গানে জড়িত। প্রাণ-মন সতেজ রেখে কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি ও বিনোদন এই গানের লক্ষ্য হওয়ায় একে কর্মসংগীতের পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং বিপর্যয় ঘটায় বারৈঙ্গে গানের চর্চা অনেক কমে এসেছে ঠিকই কিন্তু এ গানের বিষয়বস্তুর প্রাপ্তবয়স্কতা, আমোদজনক আলগা রঙ্গরসের কৌতুককর বর্ণনার কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলা, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও জীবন নগরের গ্রাম অঞ্চল থেকে এ গান এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বারাসে গান বলতে যে বারমাসী গান বোঝায়, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বারৈঙ্গে বা বারাষে গানের সাথে নামের সাদৃশ্য থাকলেও এ গান সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।

www.pathagar.com

১

বাড়ির কাছে বেড়ের মাঠে হাল ধরেছে ছোট দেওরারে।
এত দেরি হয় ভাবিজান খিদেয় জ্বলে মোর পেটরে।

পান্তার থালা আঁচলে ঢেকে ভাবি যায়রে বাড়ির কাছে মাঠে
এ পথ আমি যাবে কেমন করে মাঠে যেতে পা ওঠেনারে।
ওরে মাঠে যেতে পা ওঠেনারে।
এ পথ হেঁটে যাব কেমন করে।

কদু কুটি কুচি কুচি দেওরা আমার একই জুটি
মাঠে যেতে পা ওঠে না এ পথ হেঁটে যাব কেমন করে।

বেগুন কুটি ফালা ফালা দেওরা আমার গলার মালা
মাঠে যেতে পা ওঠে না এ পথ হেঁটে যাব কেমন করে।

হাটে গিয়ে ওরে দেওরা এক খিলি পান কিনে খেয়োরে
মনে করে আমার জন্য পান সুপারি কিনে এনোরে।

দেওরা আমার হাটে যাবে সেই না পথে বাঘের ভয় ওরে
দেওরা তোমার জন্য কিনে দেব উড়োবাজ ঘোড়ারে।

স্বামী আমার যেমন তেমন দেওরা আমার মনের মতন
দেওরা ম'লে হব পাগল আমি যাব দেশান্তরেরে।

২

চ্যাংড়া বন্ধু এত জ্বালা দিলি আমার অন্তরে
দেখতে দেখতে শিয়ানা হলাম বয়স হলো ষোলরে।

আমি পিরিত জানিনে রীত জানিনে চ্যাংড়া বন্ধুরে
বন্ধু আমার কথা শোনে না জোর করে দিল পিরিতের বায়নারে।

গাঙের ধারে সরষের ফুল বন্ধু হরে নিল জাতিকুল
বন্ধু ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে ঝেড়ে বান্ধি চুলরে।

যদি দেখে পাড়ার লোকে কলঙ্ক যাবে ওরে রটেরে
বন্ধু ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে ঝেড়েরে বান্ধি চুলরে।

আমার বিয়ের বয়স হলো এখন উপায় কি করি বলো
বলো কোথায় গেলে বন্ধু আমি পাব তোমারে।

www.pathagar.com

এমন করে কেন বলো শাড়ির আঁচল টেনে ধরো
ছেড়ে দ্যাও ছেড়ে দ্যাও বন্ধু আমি লজ্জাতে মরিরে।

আর কটা দিন সবুর করো বয়স আমার হয়নি আঠারো
বন্ধু বলো সব কথা তো যায় না বলা আমি মরিরে অন্তরে।

৩

বন্ধু আমার দেশে থাকে না
আমি মাসে মাসে লিখি চিঠি
না পাই বন্ধুর ঠিকানা, ঠিকানা।
বন্ধু আমার দেশে থাকে না ॥

ঘরে তো আর মন টেকে না
বিধি যদি দিত পাখা
উড়ে আমি যেতাম চলে বন্ধুর ঠিকানা।
বন্ধু আমার দেশে থাকে না ॥

ওরে আমার বন্ধুর ডালিম গাছেরে
ডালিম হলো এক জোড়া
ওরে সে ডালিম আমি বন্ধুরে কেমনে খাওয়াব।
বন্ধু আমার দেশে থাকে না ॥
বন্ধু আমার ঘরে এল না ॥

৪

দুপুর বেলা নিঠুর কালা বাজায় বাঁশি শ্যামরায়
আমার প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।

আগে পিছে পঞ্চ সখি জল আনিতে যাই
কোন পথে গেলে আমি প্রাণ বন্ধুর দেখা পাই।
রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পাড়ার লোকে মন্দ কয়
আমার সখি মন মজেছে নিঠুর কালা শ্যামরায়।
আমার প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।

সাপের বিষ সে ঝাড়লে নামে
প্রেমের বিষ তো উজান ধায়।
ওঝা বৈদ্যের সাধ্য কিরে
প্রেমের বিষ ঝেড়ে নামায়।
আমার প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।

www.pathagar.com

ঝোপেঝাড়ে লাগলে আগুন
পানি দিলে নিভে যায়।
প্রেমের আগুন কেমনে নিভায়
দেবে পানি কোন জায়গায়।
আমার প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।

কত গাড়ি এল গেল আমার বন্ধু এল না
বন্ধু এলে বসতে দিতাম বিছিয়ে ফুলের বিছানা।
পাখার হাওয়া দিতাম তারে যেন তার প্রাণ জুড়ায়।
আমার বন্ধু বিনে প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।
আমার সখি মন নিয়েছে নিঠুর কালা শ্যামরায়।

৫

দুপুর বেলা নিঠুর কালা বাজায় বাঁশি শ্যামরায়
প্রেমের বিষেওরে আমার প্রাণ জ্বলে যায়।

আগে পিছে পঞ্চ সখি জল আনিতে যাই
কোন পথে গেলে আমি প্রাণ বন্ধুর দেখা পাই।
রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে পাড়ার লোকে মন্দ কয়
আমার সখি মন মজেছে নিঠুর কালা শ্যামরায়।
প্রেমের বিষে ওরে আমার প্রাণ জ্বলে যায়।

সাপের বিষ সে ঝাড়লে নামে
প্রেমের বিষ তো উজান ধায়।
ওঝা বৈদ্যের সাধ্য কিরে
প্রেমের বিষ ঝেড়ে নামায়।
প্রেমের বিষে ওরে আমার প্রাণ জ্বলে যায়।

ঝোপেঝাড়ে লাগলে আগুন
পানি দিলে নিভে যায়।
প্রেমের আগুন কেমনে নিভায়
দেবে পানি কোন জায়গায়।
প্রেমের বিষে ওরে আমার প্রাণ জ্বলে যায়।

কত গাড়ি এল গেল আমার বন্ধু এল না
বন্ধু এলে বসতে দিতাম বিছিয়ে ফুলের বিছানা।
পাখার হাওয়া দিতাম তারে যেন তার প্রাণ জুড়ায়।

www.pathagar.com

বন্ধু বিনে ওরে আমার প্রেমের বিষে প্রাণ জ্বলে যায়।
আমার সখি মন নিয়েছে নিঠুর কালা শ্যামরায়।

৬

আমের পাতা চিকন-চাকন স কলার পাতা দোলে
বেছে বেছে করো বিয়ে মাজা যাহার সরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

প্রথমে আলাপ হলো তমাল গাছের তলে
নিয়েরে ভিজিল শাড়ি গামছা পাতি তলেরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

দুইজনে করিলাম পিরিত আতা গাছের তলে
মনে হলো দুজন যেন চাপা পড়ে মরিরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

রাখাল বন্ধু হাল বয় জুড়ে লাল গ
মনে বলে নিজের হাতে ধরি বন্ধুর হালরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

রাখাল বন্ধু গ চরায় নদীর কূলে কূলে
মনে বলে যাইরে বন্ধু সেই না নদীর ধারেরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

রাখাল বন্ধু চান [স্নান] করে ও সে শান বান্ধা ঘাটে
মনে বলে কাছে গিয়ে সাবান ডলি গায়েরে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

আমার বাড়ি যেও বন্ধু দখিন বরাবর
উঠোন দুয়োরি ঘর আমার না করো ভয় ডররে।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধুরে।

তথ্যদাতা :

মোঃ মকবুল হোসেন, প্রাক্তন এম. পি. [জন্ম : ১৯৫০], স্টেশন রোড, আলমডাঙ্গা।

আবুল কাসেম মাস্টার [জন্ম : ১৯৫৪], হাটবোয়ালিয়া, আলমডাঙ্গা

আক্কাস আলি [জন্ম : ১৯৩৮], গ্রাম : কালুপোল, উপজেলা ও জেলা : চুয়াডাঙ্গা। সংগ্রহের তারিখ ১১. ০৬. ২০১২

ময়নাল হোসেন, [জন্ম :] হাটবোয়ালিয়া, আলমডাঙ্গা গানের আসর থেকে সংগ্রহ। সংগ্রহের তারিখ ০৯. ০৭. ২০১৪

www.pathagar.com

জ. হৈল্-বৈল্ গান

হৈল-বৈল গান মূলত ফসল তোলার গান। চুয়াডাঙ্গা এলাকায় পৌষ মাসে আমন ধান কাটার সময় গ্রামের কিশোর-তরুণরা সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে হৈল-বৈল গান করে ও ধান, চাল, ডাল, টাকা মাগন করে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন করতে হয় বলে হৈল-বৈল গানের পরিধি ৪ থেকে ১২/১৪ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হৈল-বৈল গান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হালুই গান, হোলুই গান, হুলোই গান নামে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। হোলুই বা হুলোই, হুল্লা বা উল্লাস অর্থে আনন্দধ্বনি বা আনন্দেরই গান। বাঙালির প্রিয় নবান্ন উৎসব এবং হৈল-বৈল গান একই সময়ে সংঘটিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে বিষয়টি উৎসবমুখর আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ হয়েছে। হৈল-বৈল গান মূলত চাষি-গৃহস্থের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। হৈল-বৈল হাস্যরসাত্মক অভিনয় প্রধান দলীয় সংগীত। কৃষি-নির্ভর গ্রাম্যজনের নানা অভিজ্ঞতা, প্রেম, রস-রসিকতা, সামাজিক কাহিনী ইত্যাদি বর্ণিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও বহু বিচিত্র্য বিষয়ে যেমন রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্গতির কাহিনী, জমিদারের অত্যাচার, স্থানীয় কেচ্ছাকেলেঙ্কারী, রাজনৈতিক ঘটনা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে হৈল-বৈল রচিত হয়।

তবে মুসলমান প্রধান গ্রামগুলোতে হৈল-বৈল গানের বিষয় সব সময়ই ধর্মীয় বিষয়ের বাইরে আমোদ-ফুর্তির গান হিসেবে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। কালের বিবর্তনে ধর্মীয় বাতাবরণ হৈল-বৈল গানে আর মুখ্য বিষয় নয়, সার্বজনীন সামাজিক আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিচিত্র্য বিষয় নিয়ে রচিত এ গান এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভিন্ন মর্যাদায় অভিসিক্ত। হৈল-বৈল কখনও লঘু বিষয় নিয়ে, আবার কখনও গুগম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত হতে দেখা যায়।

বালক বা তরুণ বয়সী গায়কেরা বড় বড় লাঠির আঘাতে তাল ঠুকে ঠুকে এই গান সকলে মিলে গেয়ে থাকে। মূল গায়ক গানটি গেয়ে যেতে থাকে, দোহাররা সুর করে সমবেত কণ্ঠে তাকে অনুসরণ করে থাকে। ছড়ার ছন্দে ও লাঠি ঠোকার তালে তালে একই সুরে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় না। সে জন্য একে সুরযুক্ত ছড়াও বলা যেতে পারে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসব্যাপী সন্ধ্যার পর ছেলেরা দলবদ্ধভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে হৈল-বৈল গেয়ে বেড়ায়। কোনো কোনো এলাকায় পৌষ মাসের শেষ তিন দিন এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। বিনিময়ে গৃহস্থরা চাল ডাল ইত্যাদি দিয়ে গায়কদের সন্তুষ্ট করে থাকেন। সেই সমস্ত সামগ্রী দিয়ে ছেলেরা পৌষ সংক্রান্তির রাতে চড়ুইভাতি করে থাকে।

যিনি হৈল-বৈল রচনা করে থাকেন তাঁকে 'ওস্তাদ' বলা হয়। ওস্তাদই দলের মূল গায়ক। অন্যদের তিনিই তালিম দিয়ে উপযুক্ত করে তোলেন। মূল গায়ক নির্দিষ্ট সুরে এক পংক্তি পরিবেশন করে, এরপর সকলে এক সঙ্গে দোয়ারকি করে। হৈল-বৈল টানা সুরে গীত হয়। দোহাররা গানের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্য করে এই ভাবে সমস্ত সংগীতটি পরিবেশিত হয়। গানের শেষে ভণিতায় ওস্তাদের নাম ও ঠিকানা থাকে এবং গৃহস্থকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

www.pathagar.com

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর এবং পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া, ২৪ পরগণা অঞ্চলে হৈল-বৈল প্রতিটি গ্রামে সার্বজনীন গান হিসেবে চালু ছিল। তবে বর্তমানে লোকগীতির এ বিশেষ ধারাটি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনও তার জনপ্রিয়তা হারায়নি।

১

আল্লাহ আল্লাহ বল সবে হিন্দু বল হরি
জয়বাংলার নিশান তুলে চল বাড়ি বাড়ি ॥

এল অস্ত্র-ধরা খানসেনারা সরোজগঞ্জের হাটে
মানুষ মেরে করছে সাবাড় গুলি-গোল্লার চোটে ॥

আশেপাশে গ্রাম-গঞ্জে বাধল দৌড়োদৌড়ি
দূরের গ্রামে গিয়ে সবাই দিচ্ছে গড়াগড়ি ॥

আত্মীয়-স্বজন পুত্র-পরিজন কতই গেল মারা
মেয়েলোকের ইজ্জত গেল হল সর্বহারা ॥

আমার উস্তাদ এলাহি মাস্টার ছয়ঘরি তাঁর বাড়ি
কচুখালির কাদায় পড়ে দিচ্ছে গড়াগড়ি ॥ ১

২

হায় হায় ওরে !
জোলার একটি পোলা ছিল দধি খাবার চায়।
আড়াই টাকা নিয়ে জোলা গাই কিনতে যায় ॥

হায় হায় ওরে !
পাঁচশো টাকার গাভী জোলা আড়াই টাকা কয়।
আড়াই টাকা কয়ে জোলা জুতার বাড়ি খায় ॥

হায় হায় ওরে !
জুতোর বাড়ি খেয়ে জোলা বুদ্ধি হারা হলো
গ-বাছুর না কিনেই সে বাড়ি ফিরে এলো ॥

হায় হায় ওরে !
ভেউ ভেউ কাঁদে জোলা দেখে ছেলের মুখ
হতভাগা জোলার বেটার দুঃখে ফাটে বুক ॥ ১

www.pathagar.com

৩

ওরে ভাই রে ভাই
বনের পথে লয়ে সাথে সীতা ও লক্ষ্মণে
পাতার কুঁড়ে বাঁধল জুড়ে পঞ্চবটীর বনে ॥

ওরে ভাই রে ভাই
পঞ্চবটীর বনে সীতা লোভে পড়ে ম'ল
সোনার হরিণ দেখে রামের চরণ ভুলে গেল ॥

ওরে ভাই রে ভাই
রাম গেল শিকারেতে লক্ষ্মণ ছিল পথে
সীতারে যে তুলে নিল রাবণ রাজার রথে ॥

ওরে ভাই রে ভাই
পুষ্পকরথে নিয়ে সীতায় লঙ্কায় চলে যায়
তাই দেখে পাপের ভয়ে বিভীষণ পালায় ॥

ওরে ভাই রে ভাই
রাবণে জিজ্ঞাসা করে বিবি মন্দাদোরী
কোথা থেকে নিয়ে এলে এ হেন সুন্দরী ॥

ওরে ভাই রে ভাই
নারীর পাপে রাজ্য যাবে, যাবে সিংহাসন
একটু যদি জানতে পারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

ওরে ভাই রে ভাই
সীতাহরণ পালা মোদের এই পর্যন্ত হল
উদ্ধারপর্ব শুনতে হলে আরেক বাড়ি চলো ॥

ওরে ভাই রে ভাই
গান গাবো আর কত গাবো গাচ্ছি বাড়ি বাড়ি
আমার উস্তাদ এলাহি মাস্টার ছয়ঘরি তাঁর বাড়ি ॥ ১

৪

আহা আর শুনেছ দেশবাসী কলিকালের ধারা
কার্তিক মাসের আকালে কিছু মানুষ গেল মারা ॥

আহা আর শুনেছ

www.pathagar.com

মাতাপিতা ভাইবন্ধু খোদার মর্জি ভাল
দুঃখের বিষয় কতক লোকের বউ মারা গেল ॥

আহা আর শুনেছ
মামুদ আলি দম পেয়েছে খোরশেদের দয়ায়
কোরবান আলি বলে আল্লাহ প্রাণটা রাখা দায় ॥

আহা আর শুনেছ
কলির শেষে বাংলাদেশে রেশন কার্ড হলো
তেল লবন আর কাপড়-চোপড় চিনি পাওয়া গেল ॥

আহা আর শুনেছ
কাপড় পরে চিনি খেয়ে মিষ্টি করে মুখ
একটা জিনিস পাওয়া গেলে ঘুচত মনের দুখ ॥

আহা আর শুনেছ
কন্ট্রোলেতে নিকে যদি হতো দুনিয়াতে
নিতাই বিশ্বাস করত নিকে মনের খুশিতে ॥

আহা আর শুনেছ
আতর আলি উঠে বলে আমার যন্ত্রণা
বউ হারিয়ে একতারাতে দোহার লাগে না ॥

আহা আর শুনেছ
আমরা কত গান গাবো আর গেয়ে হলাম হত
এই বাড়ির এই মণ্ডল সাহেব পয়সা দেবেন কত ॥ ১

৫

একটুখানি চান্দেরে ভাই মাঠ করেছে আলো
বেলেরদাঁড়ি নীল বুনলাম নীল হলো না ভালো ॥

বাবুর ঘুড়া জুড়া-জুড়া নীল দেখতে গেল
নীল দেখতে গিয়ে বাবু বেদে মাসী পেল ॥

বেদে মাসী মুখে হাসি মুখখানি তার ছুঁচো
সে মুখ দিয়ে খেয়ে গেল দখিন বিলির চেঁচো ॥

চেঁচো খেলো ভালোই করল ভুঁড়ি হলো টান
পেট ফুলে দম ফুরাল শেষকালে যায় প্রাণ ॥

www.pathagar.com

আমরা কত গান গাবো আর গেয়ে হলাম হত
এই বাড়ির এই মণ্ডল সাহেব পয়সা দেবেন কত ॥ ২

৬

হাদে রে টিয়ের মা'র নিয়ে গেল গাবতলা দিয়ে
হাদে রে গাবতলার ছুঁড়ি কডা নাইতে নেমেছে ॥

হাদে রে গলায় তাদের ঢোড়া সাপ পট মেলেছে
হাদে রে গলায় ছিল কণ্ঠমালা রক্ত ছুটেছে ॥

হাদে রে চিকন-চাকন চুলগুলো পেড়ে বসেছে
হাদে রে মুটা মুটা চুলগুলো চিপতে লেগেছে ॥

আমরা কত গান গাবো আর উস্তাদের নাম বলি
আমার উস্তাদ মালেক মণ্ডল বহালগাছি বাড়ি ॥ ২

৭

ওপারেতে কদম গাছে কদম ফুল ধরে
সেই ডালেতে কেষ্ট ঠাকুর সদাই নৃত্য করে ॥

থোকায় থোকায় কদম ফুল ভরা থরে থরে
ফুলের ভারে কদম গাছের ডালটি ভেঙে পড়ে ॥

নৃত্য করে কেষ্ট ঠাকুর যায় গোয়ালের বাড়ি
ছিকের ওপর তোলা ছিল দুধ মাখনের হাড়ি ॥

চালাক চতুর গোয়ালা বেটা কেষ্টকে ভাড়ালো
তখনই যে মরে গেল সাতশ গর পাল ॥

বুদ্ধিহারা গোয়ালা তখন মাথায় ভাঙে হাড়ি
বড় বউ কেঁদে কেঁদে মাথায় তোলে বাড়ি ॥

গোয়ালার ছোট বউ বড় বুদ্ধি ধরে
সাত গাঙ সাঁতরে গিয়ে চণ্ডীর পায়ে পড়ে ॥

সাতশ গর পাল বেঁচে যায় চণ্ডীর দয়ায়
দিশেহারা গোয়ালা মনে শান্তি ফিরে পায় ॥ ২

www.pathagar.com

৮

বাঁশ কাটতে গেলরে জোলা হারিয়ে গেল দা
দা খুঁজতে গিয়ে পেল খ্যাঁকশিয়ালের ছা ॥

খ্যাঁকশিয়ালের ছা পেয়ে সে বেজায় খুশি হল
কাঁধে করে জোলা তারে বাড়ি নিয়ে গেল ॥

জোলার গিন্নি দেখে বলে কাঁধে তোমার কি
চুপ কর তুই রাজার বেটা জামুই এনেছি ॥

খাইয়ে-দাইয়ে খ্যাতার মধ্যি শুইয়ে রাখিছি
গরম পেয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে কাটায় রাত ॥

সকালবেলা উঠে শিয়াল করছে হুয়া হুয়া
গিন্নি উঠে বলছে শোনো দিচ্ছে তোমার দোয়া ॥ ২

তথ্যদাতা : ১ মোছাঃ চায়না খাতুন, জন্ম: ১৯৫৪, গ্রাম: ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ: ১৪.০৩.২০১২

২ হীরা, জন্ম: ১৯৯১, গ্রাম: বহালগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, সংগ্রহের তারিখ: ২১.০৮.২০১৪

৩ মোঃ জাকির হোসেন, গ্রাম: ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা। সংগ্রহের তারিখ: ১৭.০৫.২০১৩

ঝ. ঝাঁপান গান

চুয়াডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী লোকগান হলো ঝাঁপান। লাফ-ঝাঁপ শব্দ থেকে সম্ভবত ঝাঁপান শব্দটি এসেছে। যে গান লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বা নেচে নেচে গাওয়া হয় তাকে ঝাঁপান বলে। ৮/১০ জন লোক মিলে তৈরি হয় ঝাঁপান গানের দল। একটি দলে একজন প্রধান শিল্পী থাকে এবং বাকিরা সহশিল্পী হিসেবে সমবেত কণ্ঠে গান করে ও বাজনা বাজায়। প্রধান শিল্পীর পায়ে বাঁধা থাকে একগুচ্ছ ঘুঙুর। কমপক্ষে ৮/১০টি জ্যান্ত বিষধর সাপ একসাথে ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে খেলানো হয়, সেই সাথে চলে গান ও বাজনা। ঘুঙুরের বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রের শব্দে ভীত প্রাণী সাপ এক জায়গায় ফণা তুলে স্থির থাকে এবং জিভ বের করে ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করতে থাকে। সারাদিন সারারাত ধরেও চলে ঝাঁপান গান। ঝাঁপানের অনুষ্ঠানে বহু লোকজন ভিড় করে।

উঁচু মাচার উপরে গোখরা, কেউটে, চন্দ্রচূড়, দুধরাজ, কাল নাগ, চন্দ্র বোড়া ইত্যাদি সাপের খেলা ঝাঁপানের প্রধান আকর্ষণ। সাপ খেলার লড়াইয়ে জিতে যাওয়া সাপুড়ের দলকে মেডেল এবং পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

ঝাঁপান গান এবং ঝাঁপান খেলার দীর্ঘকালের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে চুয়াডাঙ্গার কেদারগঞ্জের প্রেমচাঁদ সাপুড়ে সাপ খেলা দেখানো এবং ঝাঁপান গানের

www.pathagar.com

পেশাদার শিল্পী ছিলেন। বেহুলা-লখিন্দরের চিরচেনা কাহিনী নিয়ে তাঁর গাওয়া গান এক সময় দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল।

এই না শাওন মাসে ঘন বিষ্টি পড়ে
কেমন করে থাকব আমি আন্ধার ঘরে।
বিধির কি হইল।

আর সোনার বরণ লখাইরে আমার
বরণ হইল কালো।
কি না সাপে দংশিল তারে তাই আমারে বলো।
বিধির কি হইল।

আবার কাল হইয়াছে লখাইর বিয়া
মালির মুকুট দিয়া।
বলো কেমন করে যাব লো আমি মালি পাড়া দিয়া।
বিধির কি হইল।

আবার কাল হইয়াছে বেউলার বিয়া বেনের সিঁদুর দিয়া।
হায়রে কেমন করে যাব আমি বেনে পাড়া দিয়া।
বিধির কি হইল।

সবেদ আলীর ঝাঁপান গান

আমি বন্দনা করি মা মনসা দেবী
ও রাঙা চরণ যেন পাইগো
স্বরসতীমা শুক্কলো বরণী
রক্তের বৃহষত্তি মাগো কুন্ডলকারিণী
আমি বন্দনা করি ॥
গলাতে গজমতি মুক্তারও হার
দাওগো মা স্বরসতী বিদ্যারও ভার।
এই বিদ্যা খাটুক মাগো সদা সর্বকাল
মনসার চরণে জানাই হাজারও সালাম।
এই পর্যন্ত বন্দনা আমার রাধাকান্তসরী
আমি বন্দনা করি ॥
ও আমার জলে ভেসে যায়গো সোনার কমলা
বেহুলা ভাসিল জলে মাগো
কান্ত লয়ে কোলেতে সোনার কমলা
যেমন দুধের করল নদে নালা মাগো
কলার করল ভেলা
সেই ভেলাতে চড়ে যাব মাগো

www.pathagar.com

লঙ্কায় আর বেহুলারে...সোনার কমলা ॥
এহেন আষাঢ় মাসে গগন গর্জন
সোনার বরণ হইলরে...সোনার কমলা ॥
ওগো কি হলো কি হলোরে আমার এতদিনের পরে
আহারে নিদাণ বিধি এই ছিল তোর মনেরে
সোনার কমলা ॥
নিভিতে শোকের অনল কেবা দিল জ্বেলে
সোনার বরণ লঙ্কায় আমার যায় বুঝি চলে
সোনার কমলা ॥
আগে যদি জানতাম আমি ছেড়ে যাবে পতি
জাগিয়া ঘুমাইয়া রইতাম না নিভাইতাম বাতি
সোনার কমলা ॥
এই পর্যন্ত ঝাঁপান আমার রাধাকান্তসরী
মুসলমানে বলেন গো আল্লাহ হিন্দু বলেন হরি
সোনার কমলা ॥

এ ধরণের শত শত গান আছে যা আজ বিলুপ্তির পথে। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত সাপুড়ে ও ঝাঁপান শিল্পী বিষ্ণুপুর গ্রামের মরহুম আজহার আলী মাস্টার হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনীভিত্তিক ঝাঁপান গানের পরিবর্তে মুসলিম শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক ঝাঁপান গান রচনা করেন।

আজহার আলীর ঝাঁপান গান

সোনার চাঁদ উঠিলে রে আব্দুল্লাহর ঘরে।
মা জননী আমেনা খাতুন কাঁপেন থরে থরে ॥
৩৬০টি কাবার পুতুল মুখে ধুলা উড়ে
আবু জেহেল বলে আমার আসন কেন নড়ে ॥
আবু সুফিয়ান ভেবে বলে বাম চোখটা কেন নাচে
কোন দুশমন জন্ম নিল মক্কা শহর বিছে।
সকল ফেরেশতা মিলে দরুদ শরীফ পড়ে
ছায়েরা হাওয়া এসে বলে সোনার নূর পেয়েছি কোলে ॥
আমেনা বলে খায়না দুগ্ধ কেন কোলের ছেলে
মুখে শুধু ইল্লাল্লাহ ইয়া উখতি সে বলে ॥
জিব্রিল বলে কলেমা পড়ে মাগো হওগো মুরিদান
কচিমুখে শাহাদতের বাণী সে শুনায় ॥
আজাজিল কেন্দে বলে ঠেকলাম বিষম দায়
ওরে সাপে দুনের বিচে শেষ নাহি হয় ॥
ওই কলেমার জোরে নষ্ট হবে যতেক শয়তানি
ওই কলেমায় নষ্ট হবে বিষ হবে পানি ॥

www.pathagar.com

বিষ তখন দেখে শুনে ভয়েতে পাক পাড়ে
আল্লাহ নবীর স্মরণে বিষ রোগীর অঙ্গ ছাড়ে ॥

এ জেলার উল্লেখযোগ্য ঝাঁপান শিল্পীদের নাম– চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাইদঘাট গ্রামের ইছাহক আলি, জন্ম: ১৯৪২ ও আলতাফ হোসেন সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৬৪, ঠাকুরপুর গ্রামের ইউসুফ সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৬৯, সুমিরদিয়ার আজিজ সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৮৬, চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজপাড়ার রাহেন সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৭২। দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের নজল ইসলাম, জন্ম: ১৯৬৪, চর হোগলডাঙ্গা গ্রামের গনি সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৬৯, দর্শনা-চাঁদপুরের নজীর সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৫৪, চিৎলা গ্রামর ননীগোপাল সর্দার, কোমরপুর গ্রামের আকছেদ আলী, জয়রামপুর গ্রামের ফকির চাঁদ, বিষ্ণুপুর গ্রামের হকাজ্জেল। জীবননগর উপজেলার তোফাজ্জেল, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর গ্রামের দিদার হোসেন ও মোজাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গাবাসী খোরশেদ মণ্ডল, রহমান সাপুড়ে, বুজক গড়গড়ির শামসুদ্দিন, সুমিরদিয়ার জামাত আলি, হাট কালুগঞ্জের প্রেমচাঁদ, তালতলার রহমান, গাড়াবাড়িয়ার শুকুর আলি ও আলতাফ সাপুড়ে, শাহপুরের আবদুল করিম, তেঘরির কিশোর দাস, আলমডাঙ্গা উপজেলার টেংরামারির আমজাদ, দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুরের চাঁদ আলি, বিষ্ণুপুরের আজহার আলি, জয়রামপুরের মোফাজ্জেল, নেহালপুর গ্রামের মায়া বাগদি ঝাঁপান ও ভাসান গানের খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. আলতাফ হোসেন সাপুড়ে, জন্ম: ১৯৬৪, গ্রাম: গাইদঘাট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা।
২. রাজিব আহমেদ [জন্ম :১৯৭৫], চুয়াডাঙ্গা কোর্টপাড়া, চুয়াডাঙ্গা।
৩. লিয়াকত আলী মিন্টু, সংস্কৃতি কর্মী, চুয়াডাঙ্গা, ১৪.০৩.২০১২
৪. সুনীল বিশ্বাস [জন্ম: ১৯৫০], গ্রাম: রুইতনপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা। সংগ্রহের তারিখ: ১৯.০৪.২০১২

ঞ. কবিগান

কবিগান আসলে স্বভাব কবির গান। কবিগানের আসরে দুই দল কবি তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে শ্রোতা-দর্শকদের উদ্দেশ্যে তা পরিবেশন করে থাকেন। কবিগান দলীয় সঙ্গীত। একটি দলে মিলে কবিয়াল এবং তাঁর সঙ্গী দোহার বাদক মিলে মোটামুটি ৭/৮জনের সমন্বয়ে একটি দল তৈরি হয়। কবিগান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গান। তাই দুই দলের পরস্পরের প্রতি চাপান-উতোরের মধ্য দিয়ে কবিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। কবিগান বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় গান। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার চুয়াডাঙ্গাবাসী কাতব আলি বয়াতি, কুলচারা গ্রামের আহাদাালি গায়েন, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোগাইলবগাদি, গ্রামের মাহতাব আলি গায়েন, খাদিমপুরের সারোয়ার আলি গায়েন, এনায়েতপুরের আবদুল রাজ্জাক কবিগানের শিল্পী হিসাবে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কবিগান মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়ে দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পরকে আক্রমণ করে গাওয়া হয়। দুজন কবির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এ গান অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তার কারণ।

www.pathagar.com

বন্দনা

দশের চরণ করি স্মরণ আমি বারে বার
দয়া যদি করেন বারি তবে তো তরিতে পারি
নইলে কি বা ক্ষমতা আমার।
আমি আরেক কথা বলি ভাই আছেন যত মহাশয়
মা ফাতেমা জগৎজননী
তিনি যদি দেন বর তবে আমি হই উদ্ধার
আমার কণ্ঠে বসে যা বলান সুবহানী।
খোদার কুদরতের সীমা কে বুঝিবে তার মহিমা
তার উপমা বুঝহ দেলবিছে দশবিশে
বান্দার উপকারের জন্যে
আসমানকে রেখেছে শূন্যে
জির জন্যে মা খাকিকে রেখেছেন নিচে।
তৌরাত জব্বুর ইঞ্জিল ফোরকান
আমি সালাম জানাই এই চার কোরান
আছে বয়ান তয়ান তার মাঝারে।
পড়ে শুনে আলেমগণে আলেম হলেন এ ভুবনে
আমি সালাম জানাই এ সবাকারে।
আমি সালাম জানাই হজরত আলি
তিনি মহাবলের বলী সবাই কাঁপে নামের জোরে।
সালাম জানাই মা জহরন
চার যুগ ধরে আছে চেতন
ওগো পার করিবেন দেখ দাওন ধরে।
আমি এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত
আর বকব না অত্যন্ত
আদিঅন্ত শেষ নাহি হলো
আছেন যত কণ্ঠীধারী উচ্চকণ্ঠে বলেন হরি
আর পাকজবানে একবার সবাই আল্লার ধ্বনি বলো।

তথ্যদাতা : মোঃ আনছার আলি [জন্ম : ১৯৪৯], কোমরপুর, কার্পাসডাঙ্গা , দামুড়হুদা

কবিগান

ধনি এমন ব্যবসা ছেড়ো না
সুখের ধান ভানা।
ও ধান ভানতে জানো না
তুমি ভালো পারো না।
ঢেঁকির ছিয়া নড়েচড়ে গড়ে পড়ে না।
ধান ভানে ভালো জানে ভালো
চাল যেন তার কাটে না ॥

www.pathagar.com

ধনি এমন ব্যবসা ছেড়ো না
সুখের ধান ভানা।
ও ধান ভানে ভালো জানে ভালো
চাল হলো মিছরি দানা।
ধনি এমন ব্যবসা ছেড়ো না
সুখের ধান ভানা।

ও ঢেঁকির তিনজন ভানানি
ও দেখ কৃষ্ণমোহিনী।
একজনা হয় গোপীর মেয়ে দুইজন তেলেনি।
ও ধান ভানে ভালো জানে ভালো
ওদের গায়ে সোনার গহনা।
ও সুখের ধান ভানা।
ও ধনি এমন ব্যবসা ছেড়ো না
সুখের ধান ভানা।

কামরাঙা ফল টাকায় জোড়া
ভাগে দিতে পারব না।
কামরাঙা ফল ভাগে দিতে পারব হে
আমি ভাগে দিতে পারব না।

ছড়া গান

পয়লাতে বেকুব বলি বেকুব হলো এক
সোজা রাস্তা কেটে যে রাস্তা করে ব্যাঁক ।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো দুই
বান থাকতে ঘরের চালে তুলে দিল পুঁই।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো তিন
ডনজের টাকা পরকে দিয়ে নিজেই করে ঋণ।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো চার
বউয়ের কথা শুনে দেখো মাকে লাগায় মা'র।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো পাঁচ
পরের পুস্কুরর্নিতে যে জন ভাগে ছাড়ে মাছ।

www.pathagar.com

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো ছয়
ভর-যুবতী বউখানা যার বাবার বাড়ি রয়।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো সাত
নিজের বস্তু রাখে যে জন অপরেরও হাত।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো আট
পরের টাকা কর্জ করে কেনে শোয়ার খাট।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো নয়
বউয়ের কথা শুনে যে জন সদাই করে ভয়।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো দশ
বউয়ের কথা শুনে যেন হয়ে থাকে বশ।

তারপরেতে বেকুব বলি বেকুব হলো এগারো
বউয়ের কথা শুনে বাড়ি বসাইল স্যাকারো।

বলে কাঁকড়া বিছে গড়িয়ে দাও

রচয়িতা : নুরুল ইসলাম, জন্ম: ১৯৪৮, গ্রাম: দলিয়ারপুর, দামুড়হুদা। কবির নিকট থেকে সংগ্রহের। তারিখ : ৯.৫.২০১৪

ট. অষ্টক গান বা অষ্টগান

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের কামার, কুমোর, সুতোর, মুচি, জেলে ইত্যাদি নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে চৈত্রসংক্রান্তিতে চৈত্রপুজার গাজন উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অষ্টকগান বা অষ্টগান গাওয়া হয়ে থাকে। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য লীলার লৌকিক উপাখ্যান অথবা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধার প্রণয়লীলা বিষয়ক আখ্যান ও লোকপুরাণ অবলম্বনে হালকা রসের সহজ সরল এবং আবেগাশ্রয়ী উপস্থাপনার কারণে অষ্টকগান বা অষ্টগান জনপ্রিয়। ছন্দোময় ভাষায় রচিত এ গানে স্থায়ী অন্তরা ও দুটি তুক থাকে। অষ্ট সখীর সহযোগে এই গান গাওয়া হয় বলে একে অষ্টকগান বা অষ্টগান বলা হয়ে থাকে। একজন সূত্রধারের নির্দেশে শিল্পীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এই গান পরিবেশন করে। সামনে ৭/৮ জন ছেলেমেয়ে গান করে এবং পিছনে হারমোনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, মন্দিরা, করতাল, জুড়ি, কাঁশি, বেহালা ইত্যাদি দেশি বাদ্যযন্ত্রশিল্পী সহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা বিশেষ সাজ-সজ্জা এবং নজরকাড়া রং-বেরঙের পোশাক পরে রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্য সহযোগে এ গান পরিবেশন করে।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হিন্দু-প্রধান মাদারহুদা গ্রামে শত বছরের বেশি সময়ের ধারাবাহিকতায় অষ্টকগান বা অষ্টগানের প্রচলন আছে। এই গ্রামের সংস্কৃতিমনা সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের (জন্ম: ১৮৮৮, মৃত্যু: ১৯৬৬) পরিচালনায় ব্রিটিশ আমল থেকে সেই ঐতিহ্য রক্ষা করে এ গান এখনও বজায় রয়েছে। সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের পরে হরেন্দ্রকুমার শর্মা (জন্ম: ১৯০৫, মৃত্যু: ১৯৯৮) এর পরিচালনার ভার নেন। বর্তমানে মাদারহুদা গ্রামের অনিল পাত্রের (জন্ম: ১৯২৪) পরিচালনায় সন্ন্যাসীকুমার শর্মা (জন্ম: ১৯৫৪), সুকুমার শর্মা (জন্ম: ১৯৬১), শম্ভুকুমার পাত্র (জন্ম: ১৯৬২), সুভাষ শর্মা (জন্ম :১৯৭৪) চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ব্যাপক জনপ্রিয় এই গান এখনও টিকিয়ে রেখেছেন। এই গ্রামের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জারিয়াল আনসার আলি (জন্ম: ১৯৪০) ছিলেন প্রয়াত সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের ছাত্র এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পদচারণার হাতেখড়িও তাঁর প্রয়াত শিক্ষকের কাছে। মাদারহুদায় অস্টক এবং বালাকি গানের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা প্রায় জীবনব্যাপী বলা যায়।

১

মাগো জয় জয়শঙ্খ করি গিরিজাকুমারী ত্রিপুরাসুন্দরী তারা।
ওগো দুর্গতিনাশিনী নরকবারিণী জয় তব দুঃখ হারা ॥

করি পদ সেবন দেবত্রিলোচন মৃত্যুর নাম ধরি।
মাগো আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি তরিব কোন সাধন জোরে ॥

ও যার করো কৃপা দান রবির সন্তান তারে কি ছুঁইতে পারে।
ও সে জয় ডঙ্ক মেরে যাবে ভব পারে হেলিয়া ত্রিসংসারে ॥

মাগো গাধির তনয় দিলে পদাশ্রয় ত্রিজগতে সবে জানে।
ও যার বাসনা পুরালে ধন বহে দিলে মা তোমার নিজ গুণে ॥

তুমি অরিষ্টনাশিনী রাবণঘাতিনী দানবদলনী তুমি।
তাই শুনে রামায়ণে বিল্ব পত্রদানে পূজেছিল রঘুমণি ॥

২

ও মনে তৃণ বাঞ্ছা করি গোলকবিহারী নবদ্বীপে অবতরি।
কলির জীব উদ্ধারিতে নিত্যান্দর সাথে অবতীর্ণ গৌরহরি ॥

ও তার দিয়ে পঞ্চ নাম পুরাই মনষ্কাম প্রতি জীবের ঘরে গিয়ে।
বলে হরে কৃষ্ণ রাম হরে কৃষ্ণ রাম হরে কৃষ্ণ হরে হরে ॥

ও সে দুই বাহু তুলে ডাকে কৃষ্ণ বলে শমনের ভয় যাবে দূরে।
অ্যান হলি বিস্মরণ ওরে আমার মন শমনের দিন কবে হবে ॥

www.pathagar.com

ও মা ত্রেতা অবতারিণী ত্রৈলোক্যতারিণী গণেশজননী তারা।
আমি পড়েছি বিপদে রেখো মা শ্রীপদে ভয় ভবপরাৎপরা ॥

জানি তব গুণে এ তিন ভুবনে কালে কি ছুঁইতে পারে।
এ তিন ভুবন নাহি ভজন-পূজন ডাকি মা তোমারে ॥

৩

শোন শোন সর্বজন জামাইয়ের বিবরণ
শাশুড়ির ভালবাসা।
তারা অন্য কর্ম থুয়ে ঝি জামাই লয়ে
অন্যগ্রহে করেছে বাসা ॥
এক দিন জামাই এল বাড়ি লাগল তাড়াতাড়ি
চাল কুটার জোগাড় করে
আমি বলব আর কত তৈয়ার করেছে যত
পিষ্টকাদি থরে থরে ॥
পিঠে গড়েছে কাঁচিপোড়া আর তালের বড়া
পাটিসাপ্টা আর পুলি।
কত গড়েছে আন্দশা বল কি আর হেথা
জামাইর দিচ্ছে মুখে তুলি ॥
কত গড়ে ভাজা পিঠে আর চিনি দুধ মিঠে
জামাই খাবে মনের সুখে।
ও সে ক্ষীর সর পরমান্ন লুচি আদি অন্য
সবে দিচ্ছে বারেবারে।
ও সে সম্বন্ধী আর শালি করে চতুরালি
আর কবে দেখা পাব।
আমরা ফিরে চাল কুটিব তোমার দেখা পাব
হেসে হেসে কথা কব ॥

৪

শোন শোন সর্বজন জামাইয়ের
শাশুড়ির ভালবাসা।
একদিন জামাই এল বাড়ি লাগল তাড়াতাড়ি
পিঠে গড়ার যোগাড় করো ॥
ও সে পিঠে থরে থরে খাওয়াইল জামাইরে
বসিয়ে স্বর্ণখাটে।
তখন শালাতে শালিতে করল চাতুরি
মুখে বলে হরি হরি ॥
আমরা রাজার মেয়ে দিছিলাম বিয়ে

www.pathagar.com

লাঠি-ধরা বুড়োর সাথে।
বুড়োর দন্ত গেছে নড়ে বুদ্ধি গেছে হরে
পাকা দাড়ি ঘন নড়ে।
হায় কি মরি হায় কোন বা দেশে যাই
এ দেশে আর থাকব নারে ॥

৫

শোন হে হেমন্ত রাজন তোমার তো বুদ্ধি ভাল না।
আবার সুরধনির মনোমোহিনী বুড়োর হাতে দিও না ॥
বুড়োর শ্লেষাতে ধরে টানে বুড়ো আর কাশতে পারে না
আবার গিরি পরে যত সখীগণ তারা সব আনন্দিত মন ॥
আবার সামনে এসে বলে দেখিব জামাই কেমন।
মুখে পাকা দাড়ি দন্ত নড়া তা দেখে ভুলেছে রাজন ॥
তোমরা কি নিন্দা করো না এ সব বিধির ঘটনা।
আবার বুড়ো বলে নিন্দা করো সেই আবার কানের সোনা ॥
এসে দেখা হলো ভাগ্য ভালো করব সে সাধ্য-সাধনা।
হায় কি মরি হায় কি মরি হায় কি মরি হায়রে হায়।
এসে দেখা হলো ভাগ্য ভালো করব সে সাধ্য-সাধনা।
মরি হে অতি বুড়ো বর যেয়ে বসল পিঁড়ের পর।
বরণ করিতে যেয়ে সাপে মারে উচাটন ॥
সর্প দেখে কম্প লেগে আইয়েরা সব রইল দাঁড়িয়ে।

৬

শোন শোন সর্বজন করি এই নিবেদন
শিব-দূর্গার দ্বন্দ্ব-কথা শোন দিয়া মন।
শিব-দূর্গা দুইজন বসে রত্ন সিংহাসন
শিব কহিছে দূর্গারে বচন ॥
সকালে রন্ধন করো ক্ষুধার্ত হয়েছি বড়ো
অস্থির হয়েছে মোর প্রাণ ।
শুনে কথা গৌরী কয় এ তো তোমার ক্ষুধা নয়
কুচুনী পাড়াটি বড়ো মনে হয় ॥
স্নান করিতে ভগবতী হস্তে লয়ে তেলের বাটি
ধীরে ধীরে যমুনাতে যায় ।
স্নান করিতে গঙ্গার জলে সঙ্গে কত যোগী চলে
দৈত্য তার চলে ডানে বাঁয় ॥
দূর্গা যখন ঘাটে যায় শিব বলে মোর সময় হয়
তখন চেয়ে দ্যাখে কুচুনীনগর।
দক্ষিণ পাড়ার এক কুচুনীনামটা তার চিন্তামণি

www.pathagar.com

শ্যামের চেয়ে লম্বা তিন হাত ॥
বিশ-পঁচিশ হাত কাপড় দিলে তবু বলে কুঁড়ের কুঁড়ে
ঘোমটা দিলে না ঢাকে তার পিঠ।
পূর্বপাড়ার এক কুচুনী নামটা তার স্বর্ণমণি
স্বামীর দিয়ে রন্ধন করায় ভাত ॥
ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকে পারস হলে খেতে বসে
গ্রাসে তোলে তিন জনের ভাত।
স্বর্ণমুনী তাহার নাম মুখে দ্যায় তিনপণ পান
খয়ের সুপারি সেরকে তিনপোয়া ॥
এই অবধি এ সব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল হেথা
বদন ভরে সবে বলো শিব ধ্বনি ॥

৭

শোন শোন সর্বজন করি একটি নিবেদন।
কৃষ্ণ কথা শোন দিয়া মন ॥
শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিতে পরম রঞ্জন
যোগী হলেন শ্রীনন্দের নন্দন ॥
কৈলাশেতে যেয়ে হরি শিব আরাধনা করি
বলে তুমি দেব পঞ্চানন ॥
শ্রীমতি করেছে মান সদাই আকুল তার প্রাণ
কি দিয়ে মান করিব ভঞ্জন ॥
আমার মোহনবাঁশি তুমি নাও যোগীর বেশ আমারে দাও
সন্ন্যাসীর বেশে আমি যাব ॥
তখন মোহনবাঁশি ত্যাজ্য করি যোগী বেশে গেল হরি
উপনীত গোকুলের গোঠে ॥
তখন আপনার নীলমণি, চিনিতে না পারে রানী
বিনয় করিয়া কথা কয়।
এ নব বয়সে যোগী কেন হলে বৈরাগী
শিশুকালে ধর্মে এত মন ॥
তুমি শোন মা যশোদা রানি বলো না নিঠুর বাণী
সংসারে মোর পিতামাতা নাই ॥
আমি সদাই শ্মশানে থাকি দয়ামায়া নাহি রাখি
নাইকো মোর ইষ্টি কোনো ভাই ॥
আমি নব প্রেমের অনুরাগী যে ভাবে হয়েছি যোগী
এখন আমি সেই কর্মে যাই ॥
এ অবধি এ সব কথা সাঙ্গ হয়ে গেল হেথা
বদন ভরে বলো শিব ধ্বনি ॥

www.pathagar.com

৮

শোন গো সখি শ্যামের বাঁশি বাজিল ওই বিপিনে
আমি অধৈর্য হয়েছি প্রাণে বাঁশির রব শুনে ॥
আমি কেমনে যৌবন দান করিব কালার শ্রীচরণে ॥
শুনে বাঁশি মন উদাসী ধৈরজ না মানে প্রাণে।
সদাই রাধা রাধা বলে অন্য নাম কি না জানে ॥
শুনে গো ধনি হৃদ-কমলিনী কি নিয়ে যাই নিধু বনে।
আমি কুলে দিয়ে কালি হেরিব নির্জনে শ্রীমাধব সনে।
মন দিয়ে পদে পড়েছি বিপদে কালার শ্রীচরণে ॥

৯

শিবের বিয়ের সম্বন্ধ হইল আনন্দ
ঘটক হল নারদমুনি।
ও নারদ যাত্রা করে কয় চললেম হিমালয়
জয় দিয়ে বীণার ধ্বনি ॥

দেখে বলে গিরিরাজ নারদের সাজ
এসো এসো নারদমুনি।
আমি আইছি মনে করে বাক্য নাহি সরে
তোমার কন্যা আছে ঘরে শুনি ॥

যদি ছেলে ভাল হয় কাজ মন্দ নয়
বিয়ে দেব মনে করি।
মিটলো সম্বন্ধের গোল হরি হরি বল
সকলে বদন ভরি ॥

১০

শিবের বিয়েয় লাগেও না ধান্য আর দুর্বারে।
তাই ঘুরাইয়ে বরণ করি, বরণ করি হায়রে ॥
শিবের বিয়েয় লাগেও না আয়না চিরণ কোট রে।
হাত ঘুরাইয়ে বরণ করি বরণ করি হায় রে ॥
শিবের বিয়েয় লাগেও না ঢোল আর সানাই রে।
হাত ঘুরাইয়ে বরণ করি বরণ করি হায় রে ॥
শিবের বিয়েয় লাগেও না সরা আর প্রদীপ রে।
হাত ঘুরাইয়ে বরণ করি বরণ করি হায় রে ॥
শিবের বিয়ে লাগেও রে কলা গাছ আর ঘট রে।
হাত ঘুরাইয়ে বরণ করি বরণ করি হায় রে ॥
শিবের বিয়ে লাগে ওরে দই আর খই রে।
হাত ঘুরাইয়ে বরণ করি বরণ করি হায় রে ॥

www.pathagar.com

তথ্যদাতা : আফতাব ডাক্তার [জন্মঃ ১৯৪৭], পেশাঃ চিকিৎসক, মুন্সীগঞ্জ পশুহাট, আলমডাঙ্গা উপজেলা। শম্ভুকুমার পাত্র [জন্মঃ ১৯৬২], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা। সুভাষ শর্মা [জন্মঃ ১৯৭৪], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা। মোঃ আনসার আলি [জন্মঃ ১৯৪০], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা।

ঠ. বালাকি গান

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের কর্মকার বা কামার, কুম্ভকার বা কুমোর, সূত্রধর বা সুতোর, চর্মকার ও বাঁশ-বেতশিল্পী মুচি সম্প্রদায়, জেলে ইত্যাদি নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অষ্টক বা অষ্টগান ও বালাকি গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য লীলার লৌকিক উপাখ্যান অথবা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধার প্রণয়লীলা বিষয়ক আখ্যান ও লোকপুরাণ অবলম্বনে হালকা রসের সহজ সরল এবং আবেগাশ্রয়ী উপস্থাপনার কারণে অষ্টকগানের সাথে সাথে বালাকি গানও সমান জনপ্রিয়। বালাকি গানের দলপতিকে বলা হয় 'বালা'। সেই সূত্রে এই 'বালাকি গান' নামকরণ এবং পরিচিতি। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে চৈত্রপূজার তিন দিন ধরে শুরু হয় বালাকি গানের অনুষ্ঠান। গানের সাথে সাথে বাংলার লোকনৃত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এখানে লক্ষ করা যায়।

শিবের জন্ম আষাঢ় মাসে হলেও তাঁর বিবাহানুষ্ঠান হয় চৈত্র মাসের শেষে। চৈত্রসংক্রান্তিতে সে উপলক্ষে পূজা উৎসব ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন। বালাকি গানের মূল বিষয় হলো শিবের বিবাহ এবং তার ঘর-গেরস্থালি নিয়ে। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কাহিনী, তাঁদের পুত্রকন্যা কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী – এঁদের জীবনের চালচিত্র, রঙ্গ-তামাশা, কথকতার বিষয় নিয়েই বালাকি গান রচিত। বাঙালির সংসার জীবনের নানা অনুষঙ্গের সাথে শিব-পার্বতীর যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে বালাকি গানে। বাঙালির বিবাহের রঙ্গ-তামাশা, বাঙালি মেয়ে-জামাইয়ের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাওয়া – বাঙালি সমাজ-জীবনের মানবিক চেহারা এবং আচরণ রূপায়িত হয়েছে শিব-পার্বতীর কর্মকাণ্ডে। যারা অল্পতেই তুষ্ট বাংলাদেশের এমন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কাছে বালাকি গান তাই একান্ত নিজস্ব আবেগ-অনুভূতিতে সহজেই নাড়া দিয়েছে। সাধারণত হিন্দু সমাজের অন্য কোনো দেবতার ক্ষেত্রে এমনটি আদৌ দেখা যায় না।

বালাকি গানের অনুষ্ঠান হয় চৈত্রসংক্রান্তির শুধু তিন রাত্রি ধরে। ধূপচিতে ধূপ-ধুনা দিয়ে পোড়ানোর সাথে সাথে এ গান পরিবেশন করা হয়। মাদারহুদায় অনুষ্ঠিত বালাকি গানের আসরে বাড়ির বালাকি, শিব-বন্দনা, ধূপচির জন্ম কথা, গণেশের জন্ম কথা, ঘাটের কথা, মরা জিয়ানো, সীতাহরণ, সন্ন্যাসখণ্ড, শাশুড়ি-বউয়ের কোন্দল, শিবের বিয়ে, প্রভাসযঞ্জ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লবকুশের যুদ্ধ, গৌরাঙ্গ-লীলালাস্য, গৌরাঙ্গের অন্তিমলীলা, শ্রীমতির মানভঞ্জন, শ্রীমতিরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, বসনচুরি, সুখ-বসন্ত ইত্যাদি গান গাওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার এক সময়ের হিন্দু-প্রধান মাদারহুদা গ্রামের পুরোনো ধারাবাহিকতায় বালাকি গান অনুষ্ঠিত আসছে। বর্তমানে মাদারহুদা গ্রামের অনিল পাত্রের (জন্মঃ ১৯২৪) পরিচালনায় সন্ন্যাসীকুমার শর্মা (জন্মঃ ১৯৫৪),

www.pathagar.com

সুকুমার শর্মা (জন্মঃ ১৯৬১), শম্ভুকুমার পাত্র (জন্মঃ ১৯৬২), সুভাষ শর্মা (জন্মঃ ১৯৭৪) চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ব্যাপক জনপ্রিয় বালাকি গান এখনও টিকিয়ে রেখেছেন।

ঘাটের কথা

বাদ্য-বাজনা শুনি মধুর বচন।
নাচিতে গাহিতে যাও তোমরা কোন জন ॥
নাচিতে গাহিতে যাই আনন্দিত মনে।
শিবের বালা ভক্ত যাই গঙ্গা দরশনে ॥
নাচিতে গাহিতে বালা যান গঙ্গার তটে।
দেখি বারো বৎসরের মরা পড়ে আছে ঘাটে ॥
এই বারো বৎসরের মরা আছে অনাহারে।
গঙ্গাদেবীর নাম শুনিলাম বারো বৎসর পরে ॥
বারো বৎসরের মরা পড়ে আছে চুনা।
এই কথা শুনে ভক্তগণ করে শিবের ঘোষণা ॥
ভক্তগণের কথা কিছু বৃথা নাহি যায়।
ভক্তগণে বলে যাহা তাহাই সিদ্ধ হয় ॥
ভক্তগণ কথা শুনে পড়ে বিষম পাকে।
হরগৌরী বলে তখন নিরবধি ডাকে ॥
ত্বরায় কি ত্বরিবেন এ মহা-সংকটে।
রহিতে না পারি শিব আইল নিকটে ॥
যুক্ত করে প্রণাম করি মহাদেবের পদে।
উদ্ধার করিলেন শিব সে মহাবিপদে ॥
দুই দিকে দুই পর্বত রয় গঙ্গার বয় ধারা।
শিবের বরে জিয়ে উঠল বারো বছরের মরা ॥
মরা জিয়ে ঘাট করলাম আনন্দিত মন।
নাচিতে গাহিতে যায় গঙ্গা দরশন ॥
নাচিতে গাহিতে ভক্তগণ গঙ্গার সন্নিকটে যায়।
ভক্তিভরে প্রণাম করে গঙ্গা দেবীর পায় ॥
গঙ্গা মাতা বলে তখন ডাকে ক্ষণে ক্ষণ।
নিদ্রাগত আছেন মাতা হইয়া চেতন ॥
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মাতা জাগ্রত হইল।
এস এস বলে ভক্তগণে আলিঙ্গন করিল ॥
আলিঙ্গন করে মাতা বলিল আপনি।
বদন ভরিয়াসবে বল শিব ধ্বনি ॥

তথ্যদাতা : আফতাব ডাক্তার [জন্ম : ১৯৪৭], পেশাঃ চিকিৎসক, মুন্সীগঞ্জ পশুহাট, আলমডাঙ্গা উপজেলা। শম্ভুকুমার পাত্র [জন্মঃ ১৯৬২], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা। সুভাষ শর্মা [জন্মঃ১৯৭৪], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা। মোঃ আনসার আলি [জন্মঃ ১৯৪০], গ্রামঃ মাদারহুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা।

www.pathagar.com

ঢ. গাজীর গীত

চুয়াডাঙ্গা জেলার সব জায়গায় গাজীর গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বর্তমান কালেও সারা জেলায় এখনও নানা গ্রামে গাজীর গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গাজী একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান সাধক পুরুষ এবং পির হিসাবে সাধারণ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। এই কারণে রোগ-বালাই, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যা, চাকরি-বাকরি, বিদেশে যাওয়া ইত্যাদি নানা রকম মুশকিল আসানের জন্য চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বহু লোক বাড়িতে গাজীর গানের মানত করে থাকে।

গাজীর গানে একটা বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলমান শিল্পীদের মতো আশা-চামরধারী কয়েকজন হিন্দু সম্প্রদায়ে শিল্পীও চুয়াডাঙ্গা জেলায় রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় আশা-চামরধারী প্রায় সব শিল্পীর পরিচয় দেওয়া হলো। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের হবিবর গায়েন [জন্ম: ১৯৬৭], সাবেনগর গ্রামের আবুল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৬], নবীননগর গ্রামের নিজাম গায়েন [জন্ম: ১৯৩৪], বড় শলুয়া গ্রামের মহিদুল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৯], ফুলবাড়ি (ছয়ঘরিয়া) গ্রামের কর্নেল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৭], বুড়োপাড়া গ্রামের ওমর আলি গায়েন [জন্ম: ১৯৬৫], আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বিল্লাল [জন্ম: ১৯৬৪], গড়গড়ি-গোবিন্দপুর গ্রামের মানোয়ার গায়েন [জন্ম: ১৯৭২], দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের আলাউদ্দিন গায়েন [জন্ম: ১৯৫৪], ধানঘড়া গ্রামের ওমর আলী গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪] ও ডাবলু মুহুরী [জন্ম: ১৯৬৬], জুড়ানপুর গ্রামের আজিবর গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪], জীবননগর উপজেলার কাশিপুর(আন্দুলবাড়িয়া) গ্রামের সিরাজ গায়েন [জন্ম: ১৯৪৯] ও খলিল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৪], বেণীপুর গ্রামের তোফাজ্জেল গায়েন [জন্ম: ১৯৪৯], ফরিদ গায়েন [জন্ম: ১৯৬৪] ও কুদ্দুস গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪], বাঁকা গ্রামের সুধীর গায়েন জন্ম: ১৯৩৪], অজিত গায়েন [জন্ম: ১৯৩৯], খলিল গায়েন [জন্ম: ১৯১৪] ও আজিবর গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪] গাজীর গানের বিশিষ্ট শিল্পী।

গাজী কালাচাঁদ পীরের গান

কোথা মা এসো মাগো এই আসরে- ২ বার
আমরা ভরসা করি
মা তোমার চরণ ধরি
তাই আমরা ডাকি মাগো এই আসরে- ২ বার
আমরা অবুলা বালা নাহি জানি মাগো প্রেম খেলা
তাই আমরা ডাকি মাগো কর জোড়ে এই আসরে- ২ বার।
আমরা রমণীগণে ডাকি মা তোমারে বারে বারে
উচ্চস্বরে ডাকি মাগো তরাও আমারে
কোথা মা এসো মাগো এই আসরে- ২ বার।
ও রেখো মা রেখো চরণে কুলের কলঙ্কিনী জয় বিষহরি।

প্রথমে বন্দনা করলাম আল্লাজীর চরণে

www.pathagar.com

ওগো আল্লাহ করবেন দয়া আমার এই আসরে- ২ বার।
চার কোণায় চার দেবতা বন্দি-বন্দি সরস্বতী
কোথায় রইলে মা জননী আমার কণ্ঠে কর ভর।
ওগো কোথায় রইলে মা মনসা ধরি তোমার পায়- ২ বার।
আহারে আহারে ওরে রেখো চরণে বিষহরি।

২
শ্বেত বরণী বীণাপানি এসো ঘরে মা আমার
গত নিশি জেগে আছি মা তোমার চরণ তলে
দিবানিশি জেগে আছি তোমার চরণ পাব বলে
ও ভক্তিভাবে ডাকি মাগো
কৃপা কর আজ আমার
এসো গো মা সরহাসিনী
এসো গো মা বিন্দু ঝরা
এসো গো মা রূপ রসনা
মোরা কি বল হয় হারা ॥

মা : তাই গাজীকালু ফকির হয়ে

ও ফকির হয়ো না
সোনার খিলকা (খিলকা) সাজবে না
তোমরা দুই ভাই হলে ফকির
আমি প্রাণে বাঁচব না ॥

কার বা দরজায় যাবা ও বাপ
কেবা দয়া করে- ২ বার।
পরের মায়ের মা বলিবা ও বাপ
আমার প্রাণে সবে না
সোনার গলে খিলকা তোমার সাজবে না ॥
আগে যদি জানতাম রে বাপ
তোরা যাবি ছেড়ে
আঁতুর ঘরে মেরে ফেলতাম
গলায় লবণ দিয়ে
তোমার বাবার সিংহাসন
পড়ে রবে খালি
ও ফকির হয়ো না
তোমার গলায় সাজবে না ॥
যেমন বাম ভাগে রেখে ঝোলা

www.pathagar.com

গলায় পরছে তুলি মালা
হলিমলি ও ভাই দুলছে দুনয়নে
ছের বেছের বলে জিন্দাপীর আমার
তুলে নিচ্ছে ছেরে
মানিক মুক্তা অভিযুক্ত করেছে গাঁথুনী
পীরের পশমে পশমে
দিচ্ছে আল্লাহর ধ্বনি---
মা তোর দয়ার গাজী ফকির হয়ে চলল মা
ওমা চিনে চিনলি না
হায় বেটা হায় বেটা বলে কাঁদবি
ওমা কেন্দে পাগল হবি ॥
হায় হায় করে কাঁদবি তখন
ও মা'জান গো
ওমা কেন্দে পাগল হবি
হায় বেটা হায় বেটা বলে
কেন্দে পাগল হবি।
রাম শোকে দশরথ কেন্দে পাগল
ওমা এরকম পাগল হবি
দাসীরে এয়েছে ফকির
ছেড়েছে জিকির
হৃদয় যাচ্ছে ফেটে
বল দেখি মা ফকিরের জিকির কেনো
লাগে এত মিঠে ॥
না জানি কোন বাদশার ছেলে
নবীন বয়সে হয়েছে ফকির
তাইতি জিকির এত মিঠে
দাসীরে এক মুষ্ঠি আতপ চাল
পাঁচটি মানিক আর জোড়া ধুতিবস্ত্র
নিয়ে যেয়ে সেই ফকিরকে বিদায় করে এসো
যাবে কিন্তু হাসতে খেলতে–
কোথায় গো ফকির বাবাজী
আমাকে দোয়া কর।

তথ্যদাতা: আবদুল মজিদ [জন্ম: ১৯৭১] গ্রাম: চিৎলা বাগানপাড়া, উপজেলা: দামুড়হুদা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩০.০৮.২০১৪। বিল্লাল [জন্ম : ১৯৬৪]। গ্রাম: পাইকপাড়া, উপজেলা: আলমডাঙ্গা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২৪.০৯.২০১৪। মানোয়ার গায়েন [জন্ম : ১৯৭২], গড়গড়ি: গোবিন্দপুর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২৭.০৯.২০১৪

www.pathagar.com

ঢ. নামকীর্তন

চুয়াডাঙ্গা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশের মধ্যে নামকীর্তন ও পদাবলি কীর্তন বা পালাকীর্তনের এক সময়ে ব্যাপক প্রচলন ছিল। হিন্দু সমাজের ভক্ত ও সাধকগণ 'কীর্তন' শব্দটি ঈশ্বরের নামকীর্তন অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। তবে হিন্দু সমাজের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত হিসাবেই কীর্তনকে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে হিন্দু-প্রধান গ্রামগুলো থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ক্রমান্বয়ে দেশত্যাগ করার ফলে বর্তমানে কীর্তনের প্রচলন একেবারে কমে গেছে।

নামকীর্তন বা নামযজ্ঞ সাধারণত অষ্টপ্রহর বা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কীর্তন গায়কেরা গান পরিবেশনের সময় গায়ে নামাবলি ও গেয়া রঙের পোশাক পরে থাকে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলেও অন্যান্য অঞ্চলের মতো নামকীর্তনের প্রথাবদ্ধ ষোড়শ পদবিশিষ্ট নামকীর্তন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। 'নামকীর্তন' নামজপ অথবা নামযজ্ঞ নামেও পরিচিত।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নামগানের ভাবরস পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রোতাদের উদ্বেল করে তোলে। এই ষোড়শ পদ এইভাবে পরিবেশনকে 'আখর' পদ্ধতির গায়ন রীতি বলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কীর্তনের আখর কথার তান।' নামকীর্তন গাওয়ার সময় ঢিমে তালে গাইতে গাইতে হঠাৎ দ্রুত তালে ছন্দের গতি পাল্টে ফেলে শ্রোতাদের চেতনাকে চঞ্চল করে তোলে। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢিমে তালে ফিরে গিয়ে শ্রোতাদের শান্ত রসে সমে ফিরিয়ে আনে। এটাই নামকীর্তনের বহুল প্রচলিত রীতি। কীর্তনের ভাষায় একে তাল ফেরতা বলা হয়ে থাকে। নামকীর্তনে প্রহর অনুযায়ী সমবাদী রাগের আলাপ এবং বিস্তারে সুর, ছন্দ, তাল, লয় ও গতির প্রয়োগ ও গায়ন রীতির বিশিষ্টতার জন্য লোকসমাজে এই গান সমাদৃত হয়েছে। তিন ঘণ্টা করে অষ্টপ্রহরে বিভিন্ন সমবাদী রাগ অনুসরণ করে নামকীর্তনে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

নামকীর্তনে একজন মূল গায়েন, ৪/৫ জন দোহারকি, ২ জন খোল বাদক, ২ জন করতাল, ১ জন দোতারা, ১ জন বাঁশি ও ১ জন হারমোনিয়াম বাদক থাকে। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে খোলের ব্যবহার অপরিহার্য।

তথ্যদাতা : ষষ্ঠীচরণ শর্মা [জন্ম : ১৯৩১], গ্রাম : কুমারী, আলমডাঙ্গা উপজেলা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৯.৭.২০১৪

ণ. খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় ১৮৩০ সালের দিকে পাদ্রী রেভারেন্ড এস. হেরসেলের উদ্যোগে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু হয়। ১৮৪৩ সালে কার্পাসডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত গির্জাটিই চুয়াডাঙ্গা জেলার সবচেয়ে পুরোনো গির্জা। কার্পাসডাঙ্গায় খ্রিস্টান সমাজের ধারাবাহিক বিস্তারের মধ্য দিয়ে বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় চুয়াডাঙ্গা শহরে, ডিঙ্গেদহ, খেজুরা, ডিহি কেষ্টপুর, হিজলগাড়ি, ফুলবাড়ি

www.pathagar.com

ও দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা, বাগাডাঙ্গা এবং দর্শনায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এখানে চার্চ অব বাংলাদেশ (প্রোটেস্ট্যান্ট) বা এসেম্বিজ অব গড (এ জি), রোমান ক্যাথলিক, সেভেনন্থ ডে অব এসেমব্লিজ-এই তিন সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানের বসবাস রয়েছে। এঁদের সব মিলিয়ে জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি। বর্তমানে সব সম্প্রদায় মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট পাঁচটি গির্জা রয়েছে। খ্রিস্টান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মূলত গির্জাকে কেন্দ্র করে।

খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জীবনকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। যেমন বড়দিন, ত্বকচ্ছেদ ও নামকরণ, অ্যাশওয়েনেস ডে বা ভস্ম বুধবার, পাম সানডে বা জেরুজালেম যাত্রা, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সানডে, স্বর্গারোহন দিবস, পেন্টিয়েস্ট ডে বা পবিত্র আত্মার অবতরণ দিবস ইত্যাদি। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এই সব ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাদ্য সহকারে যিশুগীতি, সৃষ্টি বিবরণ পালা, আব্রাহামের পালা, ইসাহাকের বলি, সপ্তমবাণী, মরিয়মের রোদন, যোহনের পালা, পুনত্থান পালা, মৃত লাসারের পালা ইত্যাদি নানা ধরণের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরিবেশিত গানগুলি রচনা করেছেন বেনচন্দ্র খাঁ, মোহন মণ্ডল, রেভারেন্ড পরিতোষ চৌধুরী, ডেভিড মণ্ডল [জন্ম: ১৯৫২], আলো মন্ডল, [জন্ম: ১৯৬০] প্রমুখ গীতিকার এবং সঙ্গীত শিল্পী। এঁরা কার্পাসডাঙ্গা এবং সংলগ্ন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বেনচন্দ্র খাঁর জন্ম চুয়াডাঙ্গা উপজেলার খেজুরা গ্রামে। তিনি পেশায় ছিলেন মিশনারি স্কুলের শিক্ষক। সঙ্গীত রচয়িতা এবং শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কার্পাসডাঙ্গার খ্রিস্টান সমাজে শিল্পী-মন্ডলীও গড়ে উঠেছে সেই সময় থেকেই।

কার্পাসডাঙ্গা গির্জায় বড়দিনের অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

শিল্পী আলো মণ্ডল বড়দিনে গান পরিবেশন করছেন

রুবেনচন্দ্র খাঁ রচিত যিশুগীতি

১

ওহে স্বর্গের অধিপতি করি তোমায় এই মিনতি
আশিস বর্ষণ কর এই অধম দীনের প্রতি ॥

ওহে শান্তিরাজ কৃপা নেত্রে চাহ আজ
মেলি দুনয়ন মোদের প্রতি এখন
হৃদে প্রেমানন্দে পূর্ণ করে দাও তব কীর্তি ॥

ওহে প্রেমের সাগর এস এ সভার ভিতর
ঘৃণা করো না করো ক্ষমা প্রদান
হৃদে প্রেমানন্দে পূর্ণ করে দাও হে এখন।
হৃদে প্রেমানন্দে পূর্ণ করে দাও তব কীর্তি ॥

ওহে স্বর্গ রাজ চরণ পুজি তব
হৃদয় খুলিয়া ভকতি চন্দনে
দয়াগুণে গ্রহণ করো অযোগ্য ভকতি ॥

২

স্বর্গ মাঝারে যারে সেবিছে অমর গানে গো
আজ তোদের তরে হত ক্রুশের উপরে
আহা কি প্রেত দেখালে দয়াময় ॥

ওরে পাপী মূঢ়মতি চেয়ে দেখ ক্রুশপতি
তোদের তরে হত ক্রুশের উপরে
আহা কি প্রেত দেখালে আমারে দয়াময় ॥

www.pathagar.com

পাতকীর জামিন হেরে এসেছিস মানব হয়ে
আপনারে নত করে এ পাপের ধরায়
হবে কি আনন্দরে স্বর্গে
হবে মহানন্দ রে ঐ স্বর্গে।
আহা কি প্রেত দেখালে আমারে দয়াময় ॥

৩

এ জীবনে নাইরে আশা এ জীবনে নাইরে আশা
খাঁচার মতো থাকে না দুদিনের ঘর
কন্যা তোমার জেনে কি তা জানে না ॥

জন্মিলে মরিতে হবে এ কথা ভাই মিথ্যা নয়
বজ্রসম আঁটো তুমি সকলে তাই ফসকে যায়।
কাঁচা হয়ে পাকা কথা
শুনে প্রাণে লাগে ব্যথা
শূন্য হবে এই যে খাঁচা ভেবে দেখ না ॥

বাঁশের খাঁচা তৈরি হবে তার উপরে তুমি শোবে
কাফনেতে ঢেকে তোমায় রাখবে উত্তরে শিয়র।
দুইটি হাত বুকে দিয়ে যাবি গোরের ভিতরে
তখন রবে কোথায় প্রিয় মনে বুঝে দেখ না ॥

যার জন্য দিনে রাতে মুটেগিরি কর রে মন
যার জন্য ধর্ম-কর্ম দিয়েছ সব বিসর্জন
ধরা পড়বে শমনের হাতে পারবে কি তোমায় বাঁচাতে
তবে কেন দিন থাকিতে না কর তার সদুপায়।
দয়াল যিশুর চরণ ধর তার চরণে গিয়ে পড়
অনুতাপী মন না হলে চির সুখী হয় না ॥

—

তথ্যদাতা: ডেভিড মন্ডল [জন্ম :১৯৫২], কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা উপজেলা। আলো মন্ডল, [জন্ম: ১৯৬০], কার্পাসডঙ্গা, দামুড়হুদা উপজেলা।
রেভারেন্ড ইমানুয়েল মল্লিক [জন্ম: ১৯৭৬], কার্পাসডাঙ্গা চার্চ অব বাংলাদেশ, কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা উপজেলা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২২.০৪.২০১৪
ডাক্তার মার্টিন হীরক চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৫.০৪.২০১৪
ফাদার যোসেফ রানা মন্ডল [জন্ম: ১৯৫৮], কার্পাসডাঙ্গা, উপজেলা দামুড়হুদা। তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২৫.১২.২০১৪

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বহু প্রাচীন। বাঙালি সমাজে নানা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়াও নানারকম শোভাযাত্রা, আনন্দ-মিছিল, বরযাত্রীদের মিছিল, যুদ্ধযাত্রায় বাদ্যধ্বনি, এবং সেই কারণে সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা রণবাদ্যযন্ত্রের অনুশীলন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢোল সহরত করে সরকারি নির্দেশ জারি করার নিয়ম এখনও চালু আছে। বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের ধর্মীয় হিন্দুদের পূজা-পার্বণে, উৎসবাদিতে, বিয়ে-শাদিতে, এমন কি শবযাত্রায় বিধি মতো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে। কিছু কিছু পেশার সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। যেমন সাপুড়েরা বিশেষ ধরনের সম্মেলক বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলা দেখায়, একে বলে 'বীণ বাঁশি' বা 'নাগিন বাঁশি' এবং বানরও ভালুক নাচিয়েরা ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখায়। সার্কাসের জোকাররা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে রঙ-তামাশা করে এবং ফেরিঅলারাও পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পণ্য বেচে এভাবেই বাংলার লোকসমাজে প্রাচীনকাল থেকে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে লোক-সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক বাদ্যযন্ত্রের সাথে ঢোল, খোল, বাঁয়া, ডুগডুগি, খমক, খঞ্জরি, জুড়ি, করতাল, খটখটি, একতারা, দোতারা, মন্দিরা, বাঁশি, ঘুঙুর ইত্যাদি প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. ঢোল

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ঢোল একটি পরিচিত বাদ্যযন্ত্র। যাত্রা, জারি, বাউল, মারফতি, গাজীর গীত, কবি গান, ধুয়োগান, বিচার গান, বারৈঞ্চে গান, হৈল-বৈল বা হালুই গান, ঝাঁপান গান, ছড়াগান, অষ্টক গান, বালাকি গান, কীর্তন এমন কি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গান পরিবেশনের সময়ও ঢোলের ব্যবহার অপরিহার্য। নৃত্য পরিবেশনের সময়ও তালবাদ্য হিসাবে ঢোলের ব্যবহার ব্যাপক। ঢাক, ঢোল এবং ঢোলক আকার ভেদে একই ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ঢোলের চেয়ে আকারে বড় ঢাক আর ঢোলক ঢোলের চেয়ে বেশ ছোট আকৃতির হয়। বাদনের কৌশলে দক্ষ ঢুলি ঢোলে বিশেষ বোল তুলতে পারেন।

ঢোল তৈরির দক্ষ কারিগররা প্রথমে গোলাকৃতি কাঠের উপরে চেঁছে এবং ভেতরে এক ইঞ্চি পুরু রেখে ভেতরের কাঠ সম্পূর্ণ ফাঁপা আকারে কুঁদে ফেলে মসৃণ করে ঢোলের আকার দেয়। ঢোলের উভয় পাশের মুখ ১০/১২ চওড়া হয়। ঢোলের বামপাশে গরুর এবং ডানপাশে ছাগলের চামড়ার আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

২. খোল

ঢোলের মতো খোলও দুই মুখ খোলা এবং মাঝখানে চওড়া মোচা আকৃতির লম্বাটে গড়নের খাটো মুখের হয়। খোলে সাধারণত কাঠের বদলে মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। তাই একে মৃদঙ্গও [মৃৎ+অঙ্গ] বলা হয়ে থাকে। খোলের ডান মুখ ছোট এবং বাঁদিকের মুখ অপেক্ষাকৃত বড়। এর উভয় মুখে ছাগলের চামড়ার ছাউনি থাকে। নামকীর্তন এবং পালাকীর্তন পরিবেশনে খোল বাজান হয়। মাটিতে রেখে অথবা গলায় ঝুলিয়ে খোল বাজানো হয়।

৩. বাঁয়া

বাউলরা ডান হাতে একতারা ও কোমরের বাম পাশে শক্ত করে বাঁধা বাঁয়া হাতের তালু ও তর্জনী দিয়ে বিশেষ কৌশলে বাজিয়ে বাউল গান পরিবেশন করে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এটি ডুগি নামেও পরিচিত। একে তবলার লৌকিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

৪. একতারা

একতারা নামটি থেকেই যন্ত্রের রূপটি ধরা যায়। একটি মাত্র তার যার একতারা তার নাম। একতারা বাংলার নিজস্ব যন্ত্র। একতারার প্রস্তুত প্রণালী মোটেও জটিল নয়। একতারা তৈরি করতে দরকার একটি লাউ, একটি কাটের বা বাঁশের দণ্ড। একটি কাঠের বয়লা বা খুঁটি, একটি তার ও একটি সোয়ারী।

লাউয়ের বুকের অংশ চামড়া দিয়ে ছাউনি দেওয়া থাকে। লাউয়ের সঙ্গে দণ্ডটি আটকানো হয়। দণ্ডটি খুব মোটা নয়। গোলাকৃতির। লাউয়ের ভেতর দিয়ে শেষপ্রান্তে একটু বের হয়ে থাকে। এটা আংটার কাজ করে। দণ্ডের মাথায় কাঠের একটি বয়লা লাগানো হয়। ছাউনির উপর একটি সোয়ারী থাকে। বয়লা থেকে একটি পিতল বা লোহার তার আংটাতে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাতেই তৈরি হয়ে যায় একতারা।

৫. দোতারা

নাম যদিও দোতারা আসলে কিন্তু এটা দুই তারের যন্ত্র নয়। দোতারাতে চারটি তার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দোতারা কাঠের তৈরি। প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ও আধাফুট চওড়া। হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে প্রথেমে দোতারার মূল শরীরের কাঠামো গঠন করা হয়। এরপর কাঠের কাঠামোর বুকে একটি ইস্পাতের পাত লাগানো হয়। এটা স্ক্রু দিয়ে কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কাঠের টুকরার এই অংশকে দণ্ড বলে। এর নিচে থাকে খোল।

খোলের উপর চামড়ার ছাউনি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। খোলের শেষ প্রান্তে একটি আংটা থাকে। ছাউনির উপর থাকে কাঠের একটি টুকরা। উপরের দিকে হাড় দিয়ে তৈরি একটা অংশ লাগানো থাকে। এই অংশের উপর চারটি কাঠের অংশ থাকে। এই কাঠের অংশ থেকে চারটি তার যন্ত্রের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত টেনে আনা হয়।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে বাউলগান, পালাগানে দোতারার ব্যবহার দেখা যায়।

www.pathagar.com

৬. সারিন্দা

মারফতি, বিচার, কিচ্ছা ও কবিগানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে সারিন্দারও ব্যবহার আছে। সারিন্দার মূলকাঠামো কাঠের তৈরি।

৭. খমক

খমক বাদ্যযন্ত্রটি সাধারণত ভক্তিমূলক গানে বাজান হয়। খমক তৈরিতে দুই মুখ খোলা ছোট আকারের কাঠের হাঁড়ি দরকার হয়। এর নিচের দিকের মুখ চামড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এর নিচের অংশে চামড়ার উল্টো পিঠে ১৪/১৫ ইঞ্চি খুব মজবুত সুতো আটকে খমকের ভেতর দিয়ে বের করে সুতোর মাথায় ধরার জন্য এক টুকরো কাঠের বা বাঁশের মুঠি মতো করা হয়। বাঁ কোমরে কনুইয়ের সাহায্যে শক্ত করে আটকে রেখে বাঁ হাত দিয়ে সুতোটা টান টান করে ধরে ডান হাতের সাহায্যে টোকা মেরে গানের সুরের তালে বাজাতে হয়।

৮. খঞ্জরি

খঞ্জরি চুয়াডাঙ্গার লোকশিল্পীদের কাছে খুবই পরিচিত একটি বাদ্যযন্ত্র। জারিগানে বিশেষভাবে তালবাদ্য হিসাবে খঞ্জরির কদর বেশি। বাউল, মারফতি, গাজীর গীত, ধুয়োগান ও কবি গানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে খঞ্জরিও ব্যবহার করা হয়। খঞ্জরি তৈরির উপকরণ বেশ সাদামাটা। ছাতিম কাঠ বা আম কাঠ দিয়ে প্রথমে একটি খোল তৈরি করা হয়। খোলের মাঝামাঝি সমান্তরাল দুদিকে দুটি ছিদ্র রাখা হয়, যাতে আওয়াজ দূরে ছড়িয়ে যায়। খঞ্জরিতে গুইসাপের ব্যবহার করা হয়। চামড়াটা ভালমত রোদে শুকনোর পরে ৪/৫ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে চামড়াটা খুবই মসৃণ হয়। পানি ঝরিয়ে ভেজা চামড়াটি মজবুত করার জন্য গাবের কস বা আঠা মাখিয়ে রাখা হয়। খোলের মাপ অনুযায়ী বাঁশের চটা দিয়ে একটি চাক তৈরি করে ভালভাবে জড়িয়ে কাপড় বা ন্যাকড়া নিতে হয়। এবারে গুইসাপের ভেজা চামড়াটি তৈরি খোলের উপর রেখে আগের তৈরি চাক দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে বেশ কয়েকদিন রোদে শুকানোর পরে ধীরে ধীরে চাকটি খুলে নিতে হবে। দেখা যাবে চামড়াটি খোলের সাথে গাবের আঠার কারণে শক্তভাবে আটকে গেছে। খঞ্জরি এভাবেই তৈরি করা হয়।

৯. কাঁসি

কাঁসার তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটি মুসলমানরা লাঠিখেলায় এবং হিন্দুরা পূজামণ্ডপে মাঙ্গলিক কাজে বাজিয়ে থাকে। এটি দেখতে অনেকটা পানের বাটার মতো। কাঁসির গায়ে ফুঁটো করে দড়ি বাঁধা হয়। বাম হাতে দড়ি ধরে ডান হাতে কাঠি দিয়ে কাঁসি বাজানো হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনেক উৎসবে কাঁসির ব্যবহার দেখা যায়।

www.pathagar.com

১০. বাঁশি

বাঁশের যে বাঁশি দিয়ে সুর তোলা হয় চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সেই বাঁশিকে বলে আড়বাঁশি। তরলা বাঁশ দিয়ে এই বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশি তৈরির সময় বাঁশের একদিকে গিঁট রেখে কাটতে হয় যেন তা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত খোলা রাখতে হয়। বাঁশিতে ছয়টা ফুটো থাকে। বাম ও ডান হাতের তিনটি করে আঙুল ফুঁটোর উপর রেখে বাজাতে হয়। বাজানোর সময় আঙুলগুলো ওঠানামা করে। বাঁশি আড়াআড়িভাবে ধরে ফুঁটোতে ঠোঁট রেখে ফুঁ দিতে হয়। তাতে সুর ওঠে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আড়বাঁশির প্রচলন বেশি। যাত্রাপালা, কবিগান, বাউলগান, কীর্তনের আসরে গায়ক ও শিল্পীরা আড়বাঁশি ব্যবহার করে।

১১. ডুগডুগি

সাধারণত বানরখেলা, সাপখেলা দেখানোর সময় ডুগডুগি বাজাতে দেখা যায়। কাঠের খোলের দুইপাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডুগডুগি বানানো হয়। এর পেটে সুতা বাঁধা হয় এবং সুতার প্রান্তে একটি গুলি থাকে। খোলের মাঝখান ধরে নাড়ালে সুতায় বাঁধা গুলি দুই প্রান্তের চামড়ায় বাড়ি খেয়ে ডুগ ডুগ করে আওয়াজ তোলে।

তথ্যদাতা: মোঃ ঠান্টু রহমান [জন্ম : ১৯৬৭], গ্রাম: বোয়ালমারী, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা
সংগ্রহের তারিখ: ০৮.১২.২০১৩

www.pathagar.com

লোকউৎসব

জীবন-সংগ্রামে ক্লিষ্ট ও কর্মভারে শ্রান্ত বাঙালির জীবনে লোক উৎসব আনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লোকজ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনে প্রধান হয়ে ওঠে সম্প্রীতির আদর্শ। ধর্মীয় উৎসব ব্যক্তিগত পূণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমিত থাকলেও লোকজ উৎসবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় অঞ্চলভিত্তিক মানুষের উদার মানসিকতা এবং সমন্বয়ধর্মী আদর্শ। শুধু তাই নয়– লোকজ উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির শেকড়ের সঙ্গে প্রাণের টান অনুভব করতে শেখায়, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে এবং বৈদেশিক সাংস্কৃতিক-আগ্রাসন রুখতে শক্তি জোগায়।

এসব লোকজ উৎসবের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, এমনকি অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত হয়ে গেছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিসংশ্লিষ্ট অনেক উৎসব রয়েছে, যেগুলো প্রকৃতিনির্ভর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের নিকট বিশেষ গুরুত্ববহ। কালের প্রবহমানতায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় বর্তমানে বেশ কিছু লোকউৎসব এখনও প্রচলিত আছে।

ক. নবান্ন উৎসব

কৃষিভিত্তিক সমাজে শীতকালে চাষি-গেরস্থের ঘরে আমন ধান ওঠার পরে নানা রকম পিঠে, পুলি, পায়েসের আয়োজন চলে। শীতকালীন আবহাওয়ায় নতুন রস-গুড়, খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়া উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করে। পৌষপার্বণকে তাই আনন্দমুখর পরিবেশে শস্য-উৎসব বলা যায়। সময়, পরিবেশ এবং জীবনযাপনের ধরনে নানা রকমের পরিবর্তনের ফলে বাঙালির জীবন থেকে উৎসবের আমেজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সেদিক থেকে নবান্ন ও পৌষপার্বণকে সানন্দে বরণ করে নেয়া যেতে পারে।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

খ. বৃষ্টি নামানোর গান/উৎসব

কৃষির সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক নিবিড়। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগেই নয়, এ যুগেও দেখা যায়, বৃষ্টির উপর কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেজন্য প্রচণ্ড খরায় যখন চারদিক খাঁ খাঁ করে, মাটি ফেটে চৌচির হয়, তখন সবাই বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনা করে। ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়া কাটে– 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে/ধান দেব মেপে।' প্রাগৈতিহাসিক কালে বৃষ্টি নামানোর জন্য যাদুকর ও ওঝারা নানা মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাকের আয়োজন করত বৃষ্টি নামানোর অনুষ্ঠানে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বৃষ্টি নামানোর গানে বা উৎসবে গ্রামের সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ-অনুষ্ঠানকে চুয়াডাঙ্গার

www.pathagar.com

বেশ কিছু অঞ্চলে 'কাদা-খেড়' নামেও পরিচিত। বৃষ্টি নামানোকে উপলক্ষ করে একটি খোলা জায়গার মাটি কুপিয়ে তা পানি দিয়ে কাদা তৈরি করে নেয়। এরপর কিছু মানুষ কাদা শরীরে মেখে আনন্দ-ফূর্তি করে; আবার কিছু মানুষ কাদা তৈরির স্থানের চারপাশে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান-নাচ ও নানা প্রকার আমোদ-ফূর্তিতে মেতে ওঠে। 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই।'– গানে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে নেচে-গেয়ে প্রার্থনা করা হয় বৃষ্টি নামুক, ফসল ফলুক, ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাক। উৎসব শেষে তারা বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত চালের তৈরি ক্ষীর সাধারণত কলা গাছের পাতায় সবার মধ্যে আনন্দের সাথে বিতরণ করে।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

গ. গাস্বি উৎসব

গাস্বি উৎসব মূলত কৃষক বা গেরস্থের লোকায়ত বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। ভাল ফসল পাওয়ার আশায় মূলত এ অনুষ্ঠানের আয়োজন। আশ্বিনের শেষ রাত থেকে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। নিজেরাও যাতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে সে জন্য তারা রাতে তেলাকুচার পাতা, আমরুলি পাতা, কাঁচা হলুদ, পান একসাথে বেটে গায়ে মেখে স্নান করে। জনশ্রুতি আছে যে, আশ্বিনের শেষ দিনে রান্না করে পরের দিন পয়লা কার্তিকে খাওয়া-দাওয়া করলে অভীষ্ট পূরণ হয়। তাই ছড়া আছে, 'আশ্বিনে রান্ধে-বাড়ে, কার্তিকে খায়/যে যেই বর মাগে সেই বর পায়'। কালের বিবর্তনে লোকায়ত অনেক অনুষ্ঠানের আর প্রচলন নেই। তবু গাস্বি উৎসব চাষি-গেরস্থ পরিবারে এখনও পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিমাণে অল্প হলেও বাড়ি বাড়ি পিঠার আয়োজন করা হয়।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

ঘ. বিয়ে

গ্রামাঞ্চলে লোক উৎসবের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান প্রধান। গ্রামাঞ্চলে এখনও সাধারণত ঘটকের মধ্যস্থতায় পাত্র-পাত্রির বিয়ে-শাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সে-সময় ঘটককে কিছু উপঢৌকন দেওয়া বা আর্থিক সম্মানী দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কনের বাড়িতে বর আগে আসত সুবিধা মতো যানবাহনে করে, এখন বাস, কার বা মাইক্রোবাস ছাড়া বর বা বরযাত্রী আসতে দেখা যায় না। কনের বাড়িতে পৌঁছুলে বরযাত্রীদের শরবতের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হতো। তবে বিয়েতে বরের নির্দিষ্ট স্থানে বসার আগে গেট দিয়ে ঢোকার সময়ে ছোট-খাট পরীক্ষা এবং বকসিস দেওয়া নিয়ম প্রচলিত ছিল। কনেপক্ষের সামর্থ অনুযায়ী বরযাত্রিদের ভাত-ডাল-আলুভাঙ্গা, মাছ, মাংস/বিরিয়ানি, মাংস,দই-মিষ্টান্নসহযোগে খাদ্য পরিবেশন করার নিয়ম আছে। আগে সাধারণ গ্রামীণ ব্যবস্থায় মাদুর পেতে কলা গাছের পাতায় খেতে দেওয়া হতো, এখন যুগের চাহিদা এবং পরিবেশ.পরিস্থিতি অনুযায়ী ডেকোরেটরদের করা রান্নাবান্না সেই সাথে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১}, গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

www.pathagar.com

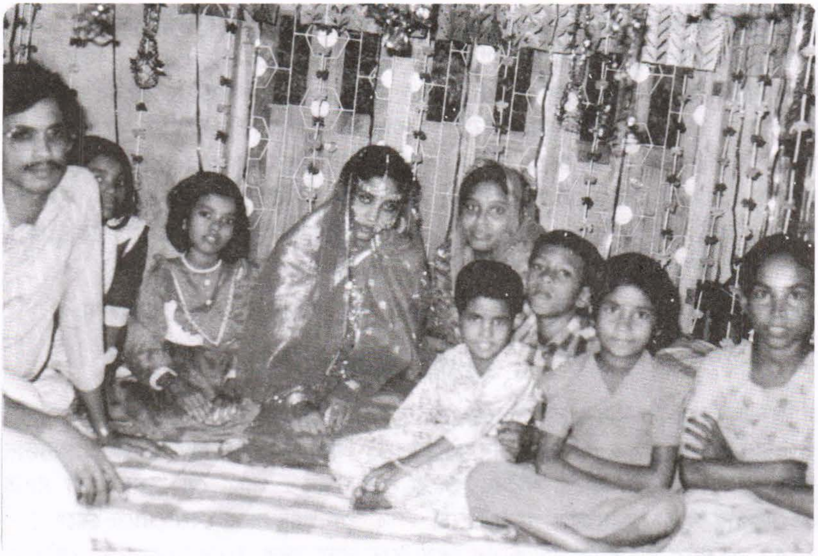

আত্মীয় স্বজনের সাথে বিয়ের সাজে কনে

আত্মীয় স্বজনের মাঝে নতুন বউ

www.pathagar.com

বিয়ে বাড়ির খাবার টেবিলের একাংশ

শশুরবাড়িতে নতুন বউ

www.pathagar.com

শশুর বাড়িতে শিশু কোলে নতুন বউ

ওরস

সাধারণত বছরের বিভিন্ন সময় পিরের দরগা বা মাজার কিংবা কোনো কোনো পিরের ভক্তদের উদ্যোগে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ওরসের রাতে পিরের অসংখ্য ভক্ত-শিষ্য-মুরিদগণ উপস্থিত হন এবং তারা চাল-ডাল-খাসি সাথে করে নিয়ে আসেন। রাতে আধ্যাত্মিক, মারফতি-মুরশিদি-ভক্তিমূলক গান এবং পিরকে কেন্দ্র করেও প্রশংসাসূচক গান পরিবেশিত হয়। আলমডাঙ্গা সদর উপজেলার মাধবপুর, ফরিদপুর, ডাউকি, জাঁহাপুর, এরশাদপুরে বার্ষিক ওরসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাধবপুরে ছলেমান পাগল আওলিয়া (রঃ) ও জোনাব পাগল আওলিয়া (রঃ)-এর মাজারকে কেন্দ্র করে বার্ষিক দুইবার; ২৬ রমযান এবং ১২ চৈত্র ওরস অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র একুশে পদকপ্রাপ্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার জাঁহাপুর গ্রামের মরমী কবি খোদাবখস শাহ-র (১৯২৮-১৯৯০) মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি ওরস অনুষ্ঠিত হয়। আলমডাঙ্গা সদরের দারুস-সালামে প্রতি বছর ৯ অক্টোবর পাগলা ছিলাফতের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদপুর দুলাল কবিরাজের আস্তানায় প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিয়া (রঃ) স্মরণে ওরশের আয়োজন হয়ে থাকে। ডাউকি গ্রামে হজরত খাজা মোজাম্মেল হক আল চিশতি আব্বাসী নিজামী ওরফে চাঁন মাস্টারের বাড়িতে মাঘ মাসের ২৭ তারিখে হজরত খাজা

www.pathagar.com

রুহ বখশ আল চিশতি (রঃ) পিরোজপুরীর স্মরণে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ফরিদপুর গ্রামে 'বাউল শিরোমনি' বেহাল শাহ-র মাজারে প্রতি বছর ওরস শরীফের আয়োজন করা হয়। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলায় ঈদ উপলক্ষে আলমডাঙ্গার কুমার নদীতে নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, কবিগান, বাউল গান ইত্যাদি লোকউৎসব প্রচলিত আছে।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রামঃ ডাউকি, উপজেলাঃ আলমডাঙ্গা

চ. আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎসব

চুয়াডাঙ্গা জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর সংলগ্ন আদিবাসী পাড়া, দর্শনা পৌর এলাকার মেমনগর কুঠিপাড়া, পুড়োপাড়া, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর, শিয়ালমারী, আন্দুলবাড়িয়া, সড়াবাড়িয়া, গয়েশপুর, সুবলপুর, রায়পুর, পীরগাছা, সুটিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর, ডিহি মিশনপাড়া, ফুলবাড়ি, আলমডাঙ্গা উপজেলার রেলস্টেশন পাড়াসংলগ্ন এলাকা, ঘোলদাড়ী, আইলহাস, দুর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে সব মিলিয়ে বর্তমানে ৫ হাজারের কাছাকাছি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এ সব অনুষ্ঠানের মধ্যে ডাকসাংরানো, পৌষবাউড়ি, চৈত্রসংক্রান্তি, বিবাহ, নাচ, গান এবং অনুশাসন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পরবভিত্তিক সংস্কৃতি করম উৎসব, ঘাঁটোব্রত, টুসু পরব, দাঁড়শিলা, ঝুমুর গান, ঝুমুর কীর্তন, ভাদু গান, বোলান, পাতানৃত্য, কাঠিনাচের প্রচলন এদের মধ্যে রয়েছে। তবে বর্তমানে আদিবাসীরা হিন্দু ধর্মীয় আচার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। যদিও তাদের ধর্মানুষ্ঠানে কোনো ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করেন না, বিধায় তারা ধর্মাচরণ অনেকটা নিজেদের মতামত অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিয়েছে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে অনেক আবহমান রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। বৈবাহিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আলাদা আলাদা জাতি-গোষ্ঠীর বিলীয়মান ধারার অবশেষ এখনও কিছু কিছু তাদের জীবনধারায় মিশে আছে।

তথ্যদাতা : দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা আদিবাসীপাড়ার সনাতন সর্দার [জন্মঃ ১৯৫৭], হাজারি সর্দার [জন্মঃ ১৯৫৪], নারায়ণ সর্দার [জন্মঃ ১৯৪৯], অনিমা সর্দার [জন্মঃ ১৯৬৪], কল্যাণী সর্দার [জন্মঃ ১৯৭৮], পুষ্পরাণী সর্দার [জন্মঃ ১৯৭২], বিশু সর্দার [জন্মঃ ১৯৭০]; আলমডাঙ্গা উপজেলার আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন আদিবাসীপাড়ার ঘুঘু ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৪২], বাবলুকুমার ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৭৮], গৌরাঙ্গ ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৫৯], অধীর ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৫৪], নরেন ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৪৪], ললিতারাণী ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৪৩], শৈলরাণী ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৪৪], দুলুরাণী ব্যাধ [জন্মঃ ১৯৫৪]

www.pathagar.com

লোকমেলা

মেলা বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মেলা শব্দের অর্থ মিলন ঘটানো, মিলিত হওয়া, একত্রে অবস্থান করা, আমোদ প্রমোদের অস্থায়ী প্রদর্শন বা সমাবেশ। মেলা এক সময় গ্রামকেন্দ্রিক থাকলেও গ্রাম ছাড়িয়ে মেলা এখন শহরেও স্থান করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে, পালা-পার্বণ বা উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা হলো, গড়াইটুপির মেলা, ঘোষবিলার বারুণী মেলা (কুবির ঠাকুরের মেলা), শিব মেলা, দুর্গাপূজার মেলা, কালীপূজার মেলা, রথের মেলা, জন্মাষ্টমীর মেলা, মহররমের মেলা, পৌষ-পার্বণের মেলা, বসন্তবরণ উৎসব ও মেলা, দোল পূর্ণিমার মেলা, বৈশাখী মেলা, চৈত্র-সংক্রান্তি মেলা, বাউল মেলা, ঈদ-উল-ফিতর ও ইত্যাদি। এখানে কয়েকটি মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

ক. গড়াইটুপির মেলা

চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর থেকে বাসযোগে ১০ কিলোমিটার দূরে সরোজগঞ্জ বাজার। এখান থেকে গড়াইটুপির মেলার দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। প্রতি বছর মেলা বসে ৭ আষাঢ় থেকে ১৪ আষাঢ়। মেলার বয়স প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর। দক্ষিণবঙ্গ বিজয়ী শাসক ও সাধক পীর হযরত খান জাহান আলি দক্ষিণবঙ্গে যাবার সময়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চারজন আউলিয়াকে রেখে যান । মৌলা আলি মালিকুল গাউস তাঁদের অন্যতম। হযরত মালিকুল গাউস তৎকালীন নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে এক সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার নিভৃত গ্রাম গড়াইটুপির মোকামতলা মাঠে একখণ্ড পাথরের উপর চড়ে ভাসতে ভাসতে চিত্রা নদী পথে মোকামতলা মাঠে একটি বটগাছের নিচে এসে হাজির হন। আস্তানা তৈরি করেন। এই দরগায় সেই অলৌকিক পাথরটি এখনও দেখা যায়। সেই প্রাচীন বটগাছের নিচে হযরত মালিকুল গাউসের দরগাকে কেন্দ্র করে এই মেলার আয়োজন।

গড়াইটুপির মৈএটরি মেলা

www.pathagar.com

মালিকুল গাউসের মাজারের উত্তর দিকে একটি দিঘি আছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেলার সময়ে শত শত মানুষ এই মাজারে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ডাব, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানত করে। এখনও মাজারে নানা ধরণের পণ্যসামগ্রী ও টাকা পয়সা মানত হিসেবে দিয়ে থাকে।

মালেকুল গাউস-এর দরগা

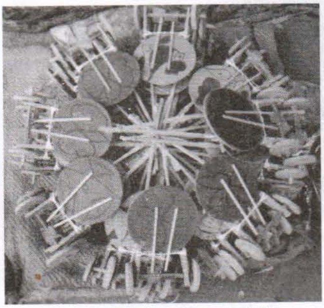

মেলার খেলনা টুমটুমি

ঝিনুকের খেলনা

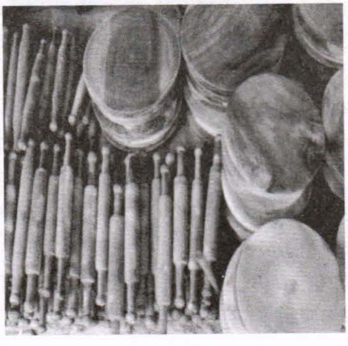

www.pathagar.com

মেলায় সংসারিক জিনিসপত্র

গড়াইটুপির মেলায় বিনোদনের কিছু নিদর্শন

গড়াইটুপির মেলার পণ্য সামগ্রীর মধ্যে নিজ প্রয়োজনীয় জিনিসই অধিক পরিমাণে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে। এই মেলায় মাটির হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, বাসন-কোসন, মালসা, সরা, ঘটি-বাটি, শিশুদের খেলনা সামগ্রী, রঙ-বেরঙের হাঁড়ি, ঘোড়া. নৌকা, পুতুলের পশরা সাজিয়ে বসে কুমোর সম্প্রদায়। কাঠের বিবিধ সামগ্রীর মধ্যে লাঙল-জোয়াল, মই, খাট-পালং, আলমারি, চেয়ার-টেবিল, সিন্দুক থেকে খাদা, খাঞ্চা, পিঁড়ি, বেলনা, খাদি, বাতিদানি, ডাল-ঘুটনি, কাঁকই, লাটাই, লাটিম, খড়ম এসব নিয়ে আসে ছুতোর সম্প্রদায়। বাঁশ-বেতের মধ্যে ধামা, কুলা, ডালা, টুকরি, সরপোস, পাখির খাঁচা, ভেলকি, দরমা, চাটাই, মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম, চাটি-পাটি, মাদুর, হরেক রকম বাঁশি ইত্যাদি নিয়ে আসে বাঁশ-বেতের কারিগর সম্প্রদায়। কামার সম্প্রদায়ের লোহার সামগ্রীর মধ্যে দা, বটি, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, কড়াই, লাঙলের ফলা, হাতা, বেড়ি, তাওয়া, জাঁতি, ছুরি। বিভিন্ন ধরণের হাতপাখা, পাখির প্রতিকৃতি ও খেলনা পুতুলের বিচিত্র সামগ্রী নিয়ে মেলায় হাজির হয় মালাকার সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

ময়রা সম্প্রদায়ের মন্ডা, মিঠাই, জিলাপি, তক্তি, নাড়ু, চিড়ে, মুড়ি-মুড়কি, বরফি, বাতাসা, ছাঁচে তৈরি চিনির হাতি, ঘোড়া, বাঘ, পাখি, মন্দির, বিখ্যাত। শাঁখারি সম্প্রদায় মেলায় উপস্থিত হয় শঙ্খ ও ঝিনুকের শাখা, বালা, আংটি, অনন্ত বাজু, চুড়ি, আয়না, চিরুণী, কান ও নাকফুল, সেই সাথে নকল ধাতবের প্রচুর গহনা নিয়ে। তবে ২০১১ সালের মেলায় প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিক সামগ্রী যেমন- টর্চ, রেডিও, টিভি, মাইক্রোওভেন, মোবাইল সেট ইত্যাদি কেনাবেচা হতে দেখা গেছে।

এছাড়া মৌসুমী ফলমূলের সমাহারে মেলা উপচে পড়ে। এসব ফলমূলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আতাফল, আনারস, ডালিম, পেয়ারা, বাঙি, কলা, নারকেল, বুচি, তালশাঁস, বরই, শশা, খিরা উলেখযোগ্য।

মেলার আরেকটি আকর্ষণ হল চিত্ত বিনোদন। যাত্রা, সার্কাস, যাদু, টকি, বায়োস্কোপ, সঙ, সঙের নাচ, পশু-পাখির লড়াই, সাপ খেলা, বানর খেলা, নাগরদোলা এমনকি ভাগ্য পরীক্ষা খেলাও উপভোগ করা যায়। মেলার অন্য প্রান্তে জমে উঠে লোকসঙ্গীতের আসর, কবি, বাউল ও বিচার গানের আসর। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, চিত্ত বিনোদন ও কেনা-বেচা মিলিয়ে গড়াইটুপির মেলা এ অঞ্চলের মানুষের কাছে অন্যতম তীর্থ মেলা হিসাবে গণ্য হয়।

তথ্যদাতা : মোয়াজ্জেম শাহ [জন্ম: ১৯৫৫], গড়াইটুপি দরগার বর্তমান খাদেম, গ্রাম: গড়াইটুপি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা। ফকির চাঁদ [জন্ম : ১৯১৬], গড়াইটুপি দরগার খাদেম। গ্রাম: তিতুদহ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা। মনসুর শাহ্ [১৯৫১], গ্রাম: কালীভান্ডারদহ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা।

তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩.৭.২০১১

খ. ঘোষবিলার বারুণী মেলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোষবিলা একটি গ্রাম। এ গ্রামে প্রতিবছর বারুণী মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের ৫ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মেলাতে দৈনন্দিন গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ছাড়াও বাচ্চাদের মাটির ও প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা-পুতুল, হরেক রকম বাঁশি, সৌখিন ও মনোহারি সামগ্রী, বিভিন্ন ধরণের মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। মেলার সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধুগুরু মধুপুরে একত্রিত হয়। মেলা উপলক্ষে পাঁচদিনে সাধুসন্ন্যাসী, লোকজও শিল্পীরা আধ্যাত্মিক, জারিগানের আসর জমিয়ে তোলে। বারুণী তিথিতে মেলা হওয়ার কারণে ঘোষবিলার মেলার এই নাম। আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে ঘোষবিলার দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। আগে এ রাস্তা ছিল কাঁচা। দুই দশক আগে এই পথ পাকা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে অথবা বিকল্প সহজ উপায়ে এখন ঘোষবিলায় যাওয়া যায়।

এই মেলাকে ঘিরে এই জনপদে একটি জনশ্রুতি চালু আছে। সাধক কুবির গোঁসাই বা কুবির ঠাকুর ১১৯৪ বঙ্গাব্দে জন্মছিলেন ঘোষবিলা সংলগ্ন মধুপুর গ্রামে। তাঁত-বোনা ছিল তাঁর পেশা। একদিন কুবিরের জননী কুবিরের কাছে গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেন। সে-বছর কোনো এক অজানা কারণে মায়ের গঙ্গা-স্নানের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন কুবির গোঁসাই। কিন্তু এ-সময় কুবির মাকে কথা দেন যেভাবেই হোক আগামী বছর গঙ্গাদর্শনে তাঁরা যাবেই। পরের বছর সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও মাকে নিয়ে কুবিরের যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একদিন হঠাৎ কুবির মাকে বলেন : "চলো গঙ্গাদর্শনে।" ছেলের কথা শুনে মা বলেন : "গঙ্গা কি এখানে বাবা? সেখানে যেতে কয়েকদিন লাগে?" ছেলের পিড়াপিড়িতে মা রাজি হলেন এবং মা-ছেলে মিলে গঙ্গাদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা দুজনে মধুপুর ও ঘোষবিলা গ্রামের মধ্যবর্তী কুমার নদীর তীরে উপস্থিত হন। কুবির কুমার নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেন : "মা গঙ্গা! আমার মা তোমার দর্শন চান, একটিবার দেখা দাও মা !" তখন মা-ছেলের সম্মুখে কুমার নদী গঙ্গানদীর রূপ ধারণ করে। মা সেখানে স্নান করে পূণ্যবতী এবং একই সাথে নবযৌবন ধারণ করেন। মায়ের সাথে কুবির বাড়ি ফিরলে গ্রামের মানুষ রটিয়ে দেয় যে, কুবির তাঁর মাকে মেরে ফেলে সুন্দরী নারী নিয়ে ঘরে ফিরেছে। কুবির একই সাথে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করেন এবং মাকে নিয়ে আবার কুমার নদের তীরে ফিরে আসেন এবং মাকে আবার নদীতে ডুব দিতে অনুরোধ করেন। ডুব দিয়ে উঠে মা আবার তাঁর পূর্বের চেহারায় ফিরে যান– এই ঘটনা দেখে সবার ভুল ভাঙে এবং এরপর প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ কুমার নদের সেই নির্দিষ্ট ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে আসেন। অনেকে বিভিন্ন রোগ-শোক, পাপ-পূণ্যের জন্য এই স্থানকে কেন্দ্র করে মানত করেন। সেই থেকেই ঘোষবিলায় কুমার নদের এই নির্দিষ্ট ঘাটে প্রতিবছর জনসমাগম ঘটে এবং কালক্রমে তা মেলায় পরিণত হয়।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ভাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

গ. বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষের উৎসবের উৎস ছিল তিনটি প্রধান অনুষ্ঠান সম্পর্কিত: পুণ্যাহ, হালখাতা ও বৈশাখী মেলা। এ তিনটি অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈশাখী মেলা খুব প্রাচিনকালের নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পহেলা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে এবং বাংলা নববর্ষ শুভ দিন হিসেবে পালিত হতে থাকে। নববর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বৈশাখী মেলার আয়োজন। বৈশাখী মেলা কোনো ধর্মীয় উৎসব না হওয়ায় এ উৎসবে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে তা বাঁধভাঙা আনন্দে পরিণত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার শহরাঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বৈশাখী উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ে। চুয়াডাঙ্গা সদর ছাড়াও আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনাতে নববর্ষের দিন মঙ্গলশোভাযাত্রা বের হয় সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে। বছরের প্রথম দিন থেকে চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে সাতদিনের বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলাতে গ্রামীণ লোকজশিল্প থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সব জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়। নাগরদোলার ঘূর্ণিপাক, বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি, লোকশিল্পের সামগ্রী, খেলনা, বিভিন্ন মিষ্টান্ন, ফাস্ট ফুডের বিপুল সমাহার, নানা রকম গৃহস্থালির বেসাতি, অল্পমূল্যে মেয়েদের থ্রিপিচ, জুতা-স্যান্ডেল, বাউল ও লোকসংগীতের আসর, গ্রাম্য নৃত্য মেলার প্রধান আকর্ষণ ।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

www.pathagar.com

ঘ. হালখাতা

বাঙালি ব্যবসায়ী সমাজের একটি প্রধান উৎসব 'হালখাতা'। হালখাতার দিনে উৎসবমুখর পরিবেশে ক্রেতা-বিক্রেতার অর্থনৈতিক লেনদেন মিটিয়ে দিয়ে নতুন করে হিসাবের খাতা খোলা হয়। সাধারণত বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাবের খাতা খোলে এবং তাদের ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে থাকে। এ দিনে ক্রেতারা তাদের বাকি-বকেয়া পরিশোধ করে আবার নতুন বছরে নতুন খাতার হিসাবে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। উল্লেখ্য, নিকট-অতীতকাল থেকে লক্ষ করা যায় যে, আগে হালখাতা শুধু বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হলেও এখন তার ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। অনেকে পঞ্জিকার তিথি-নক্ষত্র ও শুভদিন অনুসরণ না করে বৈশাখ মাসের মধ্যে একটা সুবিধা মতো দিন তারিখ নির্ধারণ করে হালখাতা অনুষ্ঠান করে থাকে। শহরে বা গ্রামে ছোট বা বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রায়শ হালখাতা উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

www.pathagar.com

লোকাচার

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বিশেষ সমাজের সাহিত্য, মানুষের আচার-আচরণ সংগীত, ললিত কলা, ক্রিড়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও আরো অনেক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহার। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতি। বলা হয়ে থাকে, জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। এছাড়া স্থান, কাল, পাত্র এবং গোষ্ঠীগত চেতনাও সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। এককথায়, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কিছুই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। বঙ্গ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাদের চিৎপ্রকর্ষ এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে যা কিছু উদ্ভাবন করেছে সেগুলোকে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতি। তবে অঞ্চলভেদে লোকজ সংস্কৃতির কিছুটা তারতম্য লক্ষ করা যায়। সংস্কার ব্যতীত নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা উজ্জ্বল হয়ে আছে। এসব আচার-অনুষ্ঠান মূলত লৌকিক সমাজকেন্দ্রিক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ধর্ম তথা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানুষের আচরিত সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় পঞ্চাশভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো বিশ্বাসরূপে, কখনো সংস্কাররূপে, কখনো ঘরোয়া ও সামাজিক আচার-আচরণরূপে, কখনো আবার ন্যায়-অন্যায় চেতনা ও দায়িত্ববোধরূপে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, ধর্মীয়-আচার এবং লোকাচারের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। ধর্মীয় আচার মূলত পারত্রিক অর্থাৎ ইহজীবনের অতিরিক্ত কোনো সত্য বা লক্ষ্যের দিকে পৌঁছানো কিংবা ইহজীবনে পাপ-পূণ্যজ্ঞান, পরজীবনে মুক্তিই ধর্মীয় আচারের প্রার্থিত। অন্যদিকে লোকাচার মূলত ইহলৌকিক অর্থাৎ বাস্তবজীবনে কীসে সমস্যা দূর হয়, ভালো-মন্দ বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ, কোনো বস্তু বা ঘটনা শুভদায়ক বা অমঙ্গলজনক প্রভৃতি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রার্থিত লাভের অনুকূল-প্রতিকূল চিন্তার টুকরো টুকরো বিশ্বাসের সমষ্টিই লোকাচার।

তবে একটি কথা বলা যায়, লোকাচারের পেছনে জাতিগত-অবস্থানগত-পরিবেশগত মনস্তত্ব ক্রিয়াশীল থাকে। লোকাচারের মধ্যে বাস্তব কার্য-কারণ সম্পর্ক না থাকলেও মানুষ শুধু বিশ্বাস এবং মঙ্গল-অমঙ্গল, লাভ-ক্ষতির কথা ভেবে তা পালন করে থাকে। লোকাচারে কল্যাণ-অকল্যাণ বা মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তা যতটা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ততটা গোষ্ঠীগত নয়। এ-জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের সন্ধান চুয়াডাঙ্গা জেলায় একাধিক পাওয়া যায়। এসব লোকাচারকে বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত করা যায় :

বাগদি আদিবাসী

চুয়াডাঙ্গা জেলায় কিছু সংখ্যক বাগদি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। বাগদিরা সামাজিকভাবে নিচু স্তরে বসবাস করত। তাদের অবস্থান হিন্দু সম্প্রদায়ের স্তর বিভাজনের সর্বশেষ স্তরের আগের স্তরে।

www.pathagar.com

এলাকায় বাগদিরা বুনো হিসেবে পরিচিত। বাগদিরা নানা ধরনের যাদুতে বিশ্বাসী। যা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দেখা যায়। অনাবৃষ্টির কালে কোনো কোনো জায়গায় বাগদিরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে শেওড়াগাছকে ঘিরে দুধকলা ছিটিয়ে সারারাত নাচতে থাকে।

বাগদি সমাজে যাদু বিশ্বাস তাদের বিভিন্ন কাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নানা ধরণের টোটকা চিকিৎসাও বাগদি সমাজে প্রচলিত। তারা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে। বাগদিরা মনে করে নিজেদের কোনো পাপের কারণে ভূত-প্রেত তাদের ঘাড়ে ভর করে। কখনো কখনো অস্বাভাবিক কোনো মৃত্যুকে তারা অশুভ প্রেতাত্মাদের কাজ বলে উল্লেখ করে থাকে।

বাগদি সমাজে 'বাণ' মারার প্রচলন আছে। সাধারণত শত্রুর ক্ষেত্রে এই 'বাণ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভূত-প্রেত, বাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদি বাগদি সমাজে 'ওঝা' নামে এক ধরণের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। পুরো বাগদি সমাজ 'ওঝা' জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত। অসুখ-বিসুখে কিংবা আধিভৌতিক কোনো ঘটনার জন্য বাগদি সমাজ এইসব ওঝাদের শরণাপন্ন হতো।

বাগদি সমাজে নানা ধরণের কুসংস্কার বা যাদু বিশ্বাস ছিল। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. সন্ধ্যার সময় চুল আঁচড়াতে হয় না। সূর্য দেবতা তখন মায়ের কোলে বিশ্রাম নেয়। এই সময় চুল আঁচড়ালে সূর্য দেবতার খাবার বাসনে চুল ঝরে পড়ে এবং তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হন। ফলে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

২. বিয়ের সময় শিয়াল ডাকা অশুভ লক্ষণ।

৩. মাঝরাতে বাঁশের বাশি বাজালে যার একটি মাত্র সন্তান তার খাওয়া জোটে না।

৪. রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলে সকালে কাউকে কিছু না বলে দরজার চৌকাঠে কাজল, সিঁদুর, তেল, পানি ইত্যাদি দিয়ে মা বসুমাতাকে পূজা দিতে হয়। পূজার সময় মা-বাবা এবং স্বামীর পা-ধোয়া পানি খেতে হয়। তবে পুরুষমানুষের দুঃস্বপ্ন দেখার ব্যাপারে কিছু বলা নেই।

৫. বাগদি সমাজে গরু, মহিষ, ঘোড়া ও সূর্য দেবতারূপে পূজনীয়।

বাগদিরা বহুবিবাহে বিশ্বাসী। একজন বাগদি পুরুষ সাতটা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করার কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধ নেই। তবে তারা রক্তের সম্পর্কের কারও সঙ্গে বিয়ে করে না।

বাগদিরা হিন্দু ধর্মীয় আচার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। বিয়েতে কন্যাকে পণ দেওয়ার রীতি আছে। বাগদি সমাজে বিধবা বিবাহও প্রচলিত। কিন্তু বিধবা বিবাহ খুব কম ঘটে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করেন না বলে তাদের ধর্মাচরণ অনেকটা নিজেদের মনগড়া আকার ধারণ করেছে। বাগদি সমাজে বিয়ে এবং মৃত্যুতে লোক খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গার বাউল সম্প্রদায়

চুয়াডাঙ্গা জেলার বাউলদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রধান ঘরানা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ছেউড়িয়ার ঘর, ঘোষপাড়ার ঘর, হরিশপুরের ঘর, ঘোলদাড়ির ঘর, চৌধুরীর ঘর ও ফরিদপুরের ঘর। ছেঁউড়িয়ার ঘরের সাধক লালন শাহ, ঘোষপাড়ার ঘরের সাধক সতীমা-কালা, হরিশপুরের ঘরের সাধক পাঞ্জু শাহ, ঘোলদাড়ির ঘরের সাধক পাঁচু শাহ, চৌধুরীর ঘরের সাধক উজল চৌধুরী ও ফরিদপুরের ঘরের সাধক ভারতের বর্ধমানের দেলবার শাহ অনুসারী বেহাল শাহ।

ঘরানাভেদে সানধতত্ত্বে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বাউলদের ঘরানাভেদটা খুব বেশি বড় নয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগটাই মুখ্য। কে কোন ঘরের সন্তান, কোথায় জন্ম কোনটাই বিবেচ্য নয়। সবাই একসঙ্গে সাধুসঙ্গ করেন, যোগাযোগ রাখেন।

বাউলদের পরিধেয় বস্ত্র তাঁদের স্বরূপ চিনতে সাহায্য করে। বৈষ্ণব ঘরানার বাউলদের পোশাক গেরুয়া, সহজিয়া মতের বাউলদের নানান রঙ-বেরঙের টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে তৈরি, আর লালনপন্থী বাউলদের পোশাক শাদা কাফনের কাপড়। চুয়াডাঙ্গা এলাকায় বাউলরা পোশাক পরিচ্ছদে সাধন ভজনে বাউল শ্রেষ্ঠ লালনের অনুসারী।

বাউলদের আচার-আচরণের কথা সম্প্রদায়ের বাইরে অদীক্ষিত জনের কাছে প্রকাশে বাধা-নিষেধ আছে। তবু কখনো ফাঁক-ফোকড় গলে ছিটেফোঁটা বেরিয়ে আসে। তাঁদের কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। গুরুর বাণী বা গানই তাঁদের শাস্ত্রকথা। মানবগুরুর সেবাভক্তি ও গুরু নির্দেশিত করণ পালনই তাঁদের ধর্ম। তাই সকাল সন্ধ্যায় সাধু-গুরুর সমাধিতে ভক্তি-সেজদা দেন। প্রকৃত বাউলদের শাস্ত্রসম্মত আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিধান নেই। অবশ্য সমাজের ভয়ে এখন তা হয়।

অন্যান্য গুরুবাদী মরমী সাধনার মতো বাউলরা অত্যন্ত আত্মমুখীন। সাধন-ভাষাও প্রহেলিকাময়, ধাঁধায় জড়ানোতার পাঠভেদ সর্বসাধারণের সাধ্যাতীত। মানুষই তাদের সাধনার মন্দির। ধর্মমন্দিরে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেন।

www.pathagar.com

তাঁদের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। মিথুনাত্মক যোগসাধনাই আধ্যাত্মবাদী বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার মূল পদ্ধতি।

গঞ্জিকা সেবনকে অনেকে সাধনার অঙ্গ বলে দাবি করেন। প্রকৃতি-পুরুষের যুগল সাধনা বাউলকরণের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিন্দু ধারণ প্রক্রিয়ায় তাঁরা জন্মশাসন করেন।

এঁরা সন্তান নয়, শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বাসী। তবে এ যুগে সেরকম প্রকৃত সাধকের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা দুচারজন। হরহামেশাই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।

সাধনার জগতে ঢুকতে বাউলকে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। ঘরানাভেদে দীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। লালন ঘরানার নিয়ম হলো, গুরু তিনবার কলেমা হক পাঠ করিয়ে দীক্ষার্থীদের ঘরে তোলেন। তারপর গুরুর হাত থেকে চাল-পানি সেবা গ্রহণ করে দীক্ষা পূর্ণ হয়। চলে সাঁইজির নাম-গান। সবশেষে গুরুর চরণে সাধ্যসেবা নিবেদিত হয়।

দীক্ষার পর শুরু হয় শিষ্যের পরীক্ষাকাল। গুরুর নির্দেশ চলতে থাকে সাধন জন্মের ক্রিয়াকরণ। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শিষ্য এক সময় ভেক-খিলাফতের যোগ্য হয়ে ওঠেন। তখন গুরু বা গুরুমা আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত দেন। তাঁদের দুজনের অনুপস্থিতিতে যেকোনো সাধু খিরকা দিতে পারেন। তবে তাঁকে পাঁচজন সাধুগুরুর সম্মতি নিতে হয়।

১৯৯৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে রণগাজি বিশ্বাসের আখড়া প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য খিলাফত দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চারদিকে কৌতূহলী মানুষ, উৎফুল্ল শিষ্য-ভক্তের দল, সাধু-গুরুর ব্যস্ততা। খিলাফত হবে আখড়ার বর্তমান রক্ষণাবেক্ষক রণগাজি বিশ্বাসের উত্তরসূরী ভদু বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রীর।

আখড়ার মাঝখানে সবাই জড়ো হয়েছেন। চারজন সাধু একটা চাদরের চারকোনা ধরে রেখেছেন। তার নিচে ভদু বিশ্বাসকে এনে দাঁড় করানো হলো। এতদিনের শরীয়তি পোশাক খুলে 'খিরকা' নামের সেলাইবিহীন একখন্ড সাদা কাপড় পরিয়ে দেওয়া হলো। কাঁদে উঠল আচলা-ঝোলা। স্ত্রীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ধারা। জগতকে চিরতরে ত্যাগ করা বড্ড কঠিন। পরনে তাঁর সাদা শাড়ি। সবকিছুতেই সাদা রংয়ের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অন্তিম যাত্রার সাজে সাজলেন তাঁরা– জিন্দা দেহে মরার বসন।

কলেমা বা মন্ত্র পাঠ করালেন বাউল সাধক রইছউদ্দিন। তারপর সকল দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশের প্রতিকী হিসেবে সাদা কাপড় দিয়ে দুজনের চোখ ও হাত বেঁধে দেওয়া হলো। এক সাধু কিছু চাল ছিটিয়ে দিলেন। ভদু বিশ্বাস ও তার স্ত্রী সকল সাংসারিক মায়া মোহ থেকে মুক্ত হলেন। জগত-সংসারের কাছে তাঁদের আর কোনো দাবি দাওয়া রইল না। আজ থেকে তাঁরা 'মৃত' বলে গণ্য।

সবশেষে চোখ ও হাত বাঁধা ভদু বিশ্বাস দম্পতিকে রণগাজি বিশ্বাসরে আখড়ার চতুর্দিকে সাত পাক ঘোরানো হলো। পেছনে পেছনে সাধুগুরুর দল ভক্তিগীতি গাইতে লাগলেন। প্রদক্ষিণ শেষ হলে সদ্য খিলাফত প্রাপ্ত দম্পত্তি আসন নিলেন। উপস্থিত সকল সাধুগুরু তাঁদেরকে সেজদা করে সম্মান জানালেন। দুজনের চোখে-মুখেই দেখা

www.pathagar.com

গেল প্রশান্তির ছাপ। ভক-খিলাফত প্রাপ্ত কোনো বাউলের দেহাবসানের পর জানাজার প্রয়োজন হয়না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কবর বা সমাধি হয়ে থাকে। অবশ্য সামাজিক কারণে ইদানীং নিয়মের বদল ঘটছে।

চুয়াডাঙ্গার বাউলরা এখন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নানা পেশায় যুক্ত। একসময় এই লোকধর্ম তাঁতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। আলমডাঙ্গা এলাকার তাঁতিদের মধ্যে বাউলমতের প্রসারতা বেশি ছিল। এখন এ সম্প্রদায়ের অনেকেই জাত ব্যবসা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। তবু কারিগর ও কৃষিজীবী সমাজেই বাউল-ফকিরদের প্রাধান্য রয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামটিকে নির্দ্বিধায় চুয়াডাঙ্গা জেলার বাউলদের রাজধানী বলা যায়। এখানে প্রায় সাড়ে ৭শ ঘর বাউর ফকিরের বাস। এই এক গ্রামেই রয়েছে রনগাজি বিশ্বাস, বনমালী শাহ-দুলাল শাহ, শুকচাঁদ শাহ বেহাল শাহ প্রমুখ খ্যাতিমান সাধক ও গায়কের আখড়া। এর মধ্যে রনগাজি বিশ্বাসের গোলবাগান সবচেয়ে পুরোনো আখড়া। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, কয়েকশ বছর আগে আরব দেশ থেকে আগত রনগাজি বিশ্বাস জনদরদী ও স্বচ্ছল জীবনযাপন করতেন। প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতেন।

কথিত আছে, একদিন এক ফকির এসে খাদ্য প্রার্থনা করে। কিন্তু রনগাজি বিশ্বাসের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া ঘরে আর কিছুই ছিল না। বিধায় ফকির প্রত্যাখাত হয়। রনগাজি বিশ্বাস বাড়ি ফিরে সবকিছু শুনে মর্মাহত হন এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর নির্জনে একাকী কাটান। এ সময় মোচাই শাহ নামে এক সাধকের সঙ্গে দেখা হয়। রনগাজি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে নেন। তারপর নিজের ১ একর ৭২ শতক জমিতে পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগিয়ে বর্তমান গোলবাগান গড়ে তোলেন। সেখানে ৯ হাত চওড়া ইদারা (কুয়া) তৈরি করেন।

অল্প দিনেই তিনি একজন বড় সাধক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বেশকিছু ভক্ত জুটে যায়। একদিন সকালে রনগাজি বিশ্বাস সাধনরত অবস্থায় তাঁকে কাপড় দিয়ে ঘিরে ফেলতে ভক্তদের নির্দেশ দেন। ভক্তরা তাই করে। অনেকক্ষণ পরও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভক্তরা কাপড় সরিয়ে দেখতে পায় ভেতরে কেউ নেই। কেবল সেখানকার মাটিতে গভীর সুড়ঙ্গ। ভক্তরা ৭টি বাঁশ জোড়া দিয়ে সুড়ঙ্গে নামায়, তবু ঠাঁই পায়নি। সেই রাতে স্বপ্নে ভক্তদেরকে এ রকম কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। আজও ছোট আকারে সুড়ঙ্গ বিদ্যমান। বর্তমানে সেই সুড়ঙ্গকে ঘিরে পাকা করা হয়েছে। রনগাজি বিশ্বাসের ছেলে নিজামউদ্দিন বিশ্বাস, তাঁর ছেলে সোনাউল্লাহ বিশ্বাস, তাঁর ছেলে আফতাবউদ্দন বিশ্বাস, তাঁর ছেলে আমজাদ আলী ওরফে ভদু বিশ্বাস (৬৮) বর্তমানে গোলবাগান দেখাশোনা করছেন। এখনও গোলবাগানকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা তিথির পঞ্চম দিনে এখানে সাধুসজ্ঞ হয়।

ফরিদপুর ছাড়াও চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামে বেশ কিছু আখড়া রয়েছে। অধিকাংশ বাউল-ফকির নিজ বাড়ি সংলগ্ন বাগান বা সন্নিহিত এলাকায় বার্ষিক সাধুসজ্ঞ করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলায় বর্তমানে প্রতি বছর দুই শতাধিক ছোট-বড় সাধুসজ্ঞ হয়। এর মধ্যে

www.pathagar.com

ফরিদপুর গ্রামের রনগাজি বিশ্বাস, দুলাল শাহ, জাঁহাপুর গ্রামের খোদা বকস শাহ, বহালগাছির হেদায়েত আলী শাহ, সাহাপুরের শুকুর শাহ, ভুলটিয়ার তাইজেল শাহ প্রমুখের সাধুসঙ্ঘের আয়োজন ব্যাপক। সাধারণত গুরুর মৃত্যু বা বাবা-মা বাউলপন্থী হলে তাদের মৃত্যু তারিখে সাধুসঙ্ঘের আয়োজন করেন। একবার যে তারিখ চূড়ান্ত হয়, পরের বছর সেদিনই সাধুসঙ্ঘ হয়। প্রথমবার দাওয়াত পৌঁছালে পরবর্তী বছরগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই সাধু-ফকিরগণ হাজির হয়ে যান। তথাপি আয়োজন সাধু প্রতিবছর সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সাধুসঙ্ঘ একদিন স্থায়ী হয়। আগের দিন দুপুর বা বিকেল নাগাদ সাধুগণ যথাস্থানে হাজির হয়ে যান। সারারাত চলে গান আর গান, সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা। বাকি সাধুরা বৃত্তাকারে বসে বা শুয়ে তা উপভোগ করেন। পরদিন দুপুরের পর আসর ভাঙতে শুরু করে। সাধুসঙ্ঘে আমিষ খাবার পরিবেশনের নিয়ম নেই। আর সকালে দই-চিড়া সহযোগে বিশেষ আহার চলে, বাউলরা যাকে বলে 'বালকসেবা'।

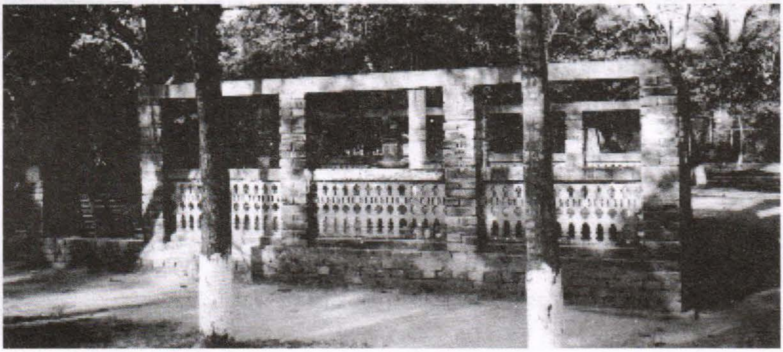

আলমডাঙ্গা উপজেলার জাঁহাপুর গ্রামে খোদা বক্স সাঁইয়ের সমাধি

মাজারকেন্দ্রিক আচার

দেহাটির মাজার: জীবননগর উপজেলার দেহাটি গ্রামে একজন অজ্ঞাত পীরের মাজার আছে। শোনা যায়, পীর সাহেব স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু সপ্তাহান্তে দেখা যায় কবরের মাটি সরানো এবং ভেতরে কোনো লাশ নেই। এই পিরের নাম বিস্মৃত হয়ে গেছে। তাঁকে নাকি অন্যত্র ভক্তদের দর্শন দিতে দেখা গেছে। ইটে গাঁথা এ মাজারে নিয়মিত শিরনি হয়।

চুয়াডাঙ্গার তুষ্ট শাহের মাজার: চুয়াডাঙ্গা শহরের রেল স্টেশনের কাছে তুষ্ট শাহের মাজার আছে। প্রতি বছর ১ বৈশাখ রাতে এখানে বাউলরা একত্রিত হয়ে গান বাজনা করেন।

দুধপাতিলার দরগা: জীবননগর উপজেলার দুধপাতিলা গ্রামে একটি অজ্ঞাত পীরের দরগা আছে। এর কাছেই বাউলপন্থী আনার শাহের মাজার আছে। আনার শাহ লালন শাহর শিষ্য ছিলেন। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে বাউল ও ভক্তগণ এখানে মিলিত হয়ে গান বাজনা করেন।

www.pathagar.com

জুড়ানপুরের মাজার: দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামে পির বুড়া দেওয়ানের মাজার আছে। মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তিনি একজন রাজ কর্মচারী হিসেবে এখানে আসেন। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ বুযুর্গ ব্যক্তি এবং উচ্চমানের কামালিয়াত প্রাপ্ত সাধক ছিলেন। এই পাকা মাজারে ভক্তরা মানত করেন, শিরনি দেন।

গয়েশপুরের দরগা: জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামে ইটের তৈরি একটি অজ্ঞাত পিরের মাজার আছে। ভক্তরা এখানে মানত করে, শিরনি দেয়। এই দরগার অনেক কেরামতির কথা লোকমুখে শোনা যায়।

বেতবাড়িয়ার মাজার: চুয়াডাঙ্গার বেতবাড়িয়া গ্রামে বটগাছের নিচে একটি পাকা মাজার আছে। এই অজ্ঞাতনামা পির দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর নানা অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনা যায়। এখানে শিরনি, মানত হয়।

ফকির বাবার মাজার: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়গড়ি গ্রামের মাঠে অজ্ঞাতনামা ফকির বাবার মাজার আছে। মোগল বাদশাহ শাহ আলমের আমলে এই সংসারত্যাগী ফকির ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে আসেন। তাঁর মাজার ইটের তৈরি। বাউল ফকিররা এখানে গান বাজনা করত বলে গোবিন্দপুরের হাজী বোরহান উদ্দিন মাজারটি ভেঙে দেন। পরে বাউলরা আবার মাজারটি তৈরি করে নেয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে এ মাজারে ভক্তরা শিরনি দিতে আসেন।

ক. পশু-পাখি বিষয়ক লোকাচার

নতুন গরু-ছাগল কিনে বাড়িতে এনে সে-পশুর পায়ে পানি দিয়ে গোয়ালে ওঠানো, সকালবেলা কাক ডাকলে অমঙ্গল-অশুভ সংবাদ শোনার ভীতি, রাতে কোক পাখি ডাকলে অমঙ্গল হয়, বাড়ির গাছে শকুন বসা অলক্ষ্মনের প্রতীক, দিনে শেয়াল ডাকা অলক্ষ্মন, রাতে কাক ডাকা দুর্ভিক্ষের আসন্ন সংকেত, ইস্টিকুটুম পাখি ডাকলে নিঃসন্তান দম্পত্তির বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, পৌষ মাসের রাতে বাড়ি থেকে কুকুর-বেড়াল তাড়াতে নেই,

খ. অমঙ্গল বিষয় লোকাচার

পেছন থেকে ডাকলে কাজে বিঘ্ন ঘটে বা অমঙ্গল হয়, গামছা ও ছাতা হারানো অমঙ্গল, সন্ধ্যায় প্রদীপ না জ্বালালে অমঙ্গল হয়, ঝাঁটা কারো শরীরে স্পর্শ করা অমঙ্গল,

গ. মানুষ বিষয়ক লোকাচার

সুন্দর বাচ্চাদের কপালের এক পাশে কালির আঁচড় না কাটলে নজর লাগা, মানুষের ছায়া মাড়িয়ে না যাওয়া ভালো, সন্ধ্যার পরে মেয়েদের খোলাচুলে থাকা অলক্ষ্মণ, হাত থেকে বাসনকোসন পড়ে গেলে অতিথি আসার সম্ভাবনা, দুজনের মাথায় ঠুকে গেলে- আবার দুজনে ইচ্ছেকৃত না ঠুকলে শিং গজানোর সম্ভাবনা, কোনো প্রসূতি নারী গর্ভাবস্থায় বাঁদর দেখলে সন্তান বাঁদরের মতো চঞ্চল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস, গায়ে পাখা লাগলে আয়ুক্ষয়-মাটিতে লাগালে তার প্রতিকার হয়, হাত চুলকালে টাকা আসে, ভিখারীকে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা

www.pathagar.com

না দেওয়া, এ ডুবে স্নান না করা, স্নান করে কিছু মুখে না দিয়ে ভিক্ষা দিতে নেই, রাত্রিবেলা আয়নাতে মুখ দেখতে নেই, চৌকাঠের উপর বসতে নেই-তাতে পূর্ব পুরুষদের ঘাড়ে বসা হয়,

ঘ. খাবার বিষয়ক লোকাচার

পিঠা খেয়ে সন্ধ্যারাতে বাইরে গেলে মাথায় সামান্য হলুদ না দিলে জিন-পরীর ভর করার সম্ভাবনা, খেতে বসে বিষম খেলে দূরের কেউ খেতে বসা মানুষটিকে স্মরণ করছে বলে ভাবা, হাত থেকে খাবার মাটিতে পড়ে গেলে মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া, একবারে বাড়া ভাতা না খাওয়া।

ঙ. গাছ-পালা, ফুল বিষয়ক লোকাচার

কলা গাছের পেট দিয়ে মোছা বেরোনো অমঙ্গল, বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে রাতে খালি মাথায় না যাওয়া, রাস্তায় পড়ন্ত বাঁশ অতিক্রম করে না যাওয়া, আম-কাঁঠাল গাছে ফল না ধরলে গাস্বিতে (আশ্বিন সংক্রান্তি) তাতে দা দিয়ে কোপালে ফল ধরার সম্ভাবনা থাকে, গাস্বির দিনে আচমকা ছুলিওয়ালার গায়ে হলুদ ফুলের পানি ছিটালে তার ছুলি সেরে যায় এবং যে পানি ছিটাবে তার আর কখনও ছুলি হবে না বলে বিশ্বাস, নতুন কাপড় পরার আগে তা থেকে সুতো ছিঁড়ে তুলসিগাছকে দিলে কাপড় বহুদিন টিকে থাকে, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই।

চ. প্রাকৃতিক বা প্রকৃতি বিষয়ক লোকাচার

ঝড়ের সময় ঝড়কে বসার জন্য পিঁড়া উঠানে ছুঁড়ে দেওয়া এবং ঝড় মাঠে চলে যাওয়ার জন্য উঠানে কাঁচি ছুঁড়ে দেওয়া, খালি দোলনা দোলাতে নেই।

তবে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোকাচারগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব উপকরণ ও রীতি অবলম্বন করে লোকাচারগুলো পালিত হয়ে থাকে তা ধর্মগত-জাতিগত ভেদ-রেখাগুলোকে অতিক্রম করে যায়।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

একটি জাতি-গোষ্ঠীর স্বরূপ ধরা পড়ে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গড়ে ওঠা খাদ্য-রুচি ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে। সেই বিবেচনায় একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, জীবনাচরণই শুধু নয় তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্চার প্রতিটি কর্মে ও ব্যবহারে, ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানে, সমাজ-সংস্কৃতিতে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য-রুচি ও খাদ্যাভ্যাসের ছাপ থাকে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রচলিত লোকখাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও বৈচিত্র্য দেখে সহজেই এই জনপদের মানুষজনের অনুধাবন করা যায়। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর এক ও অভিন্ন সাংস্কৃতিক বিন্যাসের অন্তর্গত হয়েও চুয়াডাঙ্গা তার নিজস্ব রুচি-বৈচিত্র্য তার মধ্যে ধরে রেখেছে।

ক. সাধারণ লোকখাদ্য

ভাত, মাছ, ডাল, দুধ, ফলমূল ইত্যাদি বাঙালির দৈনন্দিন খাবার। ভাত হিসেবে এক সময় আউশ, আমন ধানের মোটা চালেরই বেশি প্রচলন ছিল এবং চাল দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য হলে সাধারণত মানুষ গম, ভুড়ো, চিনা ও কাউনের ভাত, কলাই সিদ্ধ, গমের রুটি খেয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছে। সাধারণভাবে স্থানীয় মানুষ দুপুরে ও রাতে গরম ভাত এবং সকালের নাস্তা হিসেবে গরমের দিনে পান্তা এবং শীতের দিনে কড়কড়ে (বাসি ভাত) খেয়ে থাকে। পান্তার সাথে লবণ, কাঁচা মরিচ ও পিঁয়াজ আর কড়কড়ে ভাতের সাথে পিঁয়াজ, কাঁচা বা পোড়ানো শুকনা মরিচ, তেল পিঁয়াজের ফুলকা এবং বাসি তরকারি খাওয়া হয়। এছাড়া গমের বা চালের আটার সাথে হলুদ, মরিচ, লবণ মিশিয়ে ধাপড়া তৈরি করে খেতেও দেখা যায়। ফলমূলের দিনে বাঙ্গি বা কাঁকর, তরমুজ ইত্যাদিও খাওয়া হয়।

আম কাঁঠালের দিনে পাকা আম কাঁঠাল দিয়ে মুড়ি ও পান্তা খাওয়ার চল আছে। আবার অনেক বাড়িতে ছেলেমেয়ে ও মেহমানদের জন্য মুড়ি, মোয়া, খই, চিড়া, নাড়ু, ঝুরিভাজা ইত্যাদি তৈরি থাকে। চালের ক্ষুদ দিয়ে জাউ, আতপ বা ভুড়ার চালের জাউ এবং গমের আটার জাউ বহু পরিবারে ব্যবহৃত হতো। ছোলা, যব ও গমের ছাতু এখনও অনেক পরিবারে খাওয়ার প্রচলন আছে। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাবার প্রবণতা বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখা যায়। অবশ্য এমন দিনে চাল ভাজা, চিড়া ভাজা, ছোলা ভাজা ও মটর ভাজা এ অঞ্চলের অত্যন্ত মুখরোচক খাদ্য।

গ্রীষ্মকালে অনেক পরিবারে সিদ্ধ মৌ আলু খাওয়া হয়। শহর এলাকায় বিভিন্ন পেশাজীবী ও বিশেষ করে হিন্দু পরিবার রুটি, পরোটা, লুচি, ভাজি, মিষ্টি এবং চা দিয়ে নাস্তার কাজ সারে। এছাড়া পাঁপর ভাজা, আসকে পিঠে, হুড়াপোড়া, ডালের বড়া, পিঁয়াজু বড়া, বেগুন বা ফুলকপির ফুলুরি, আলুর চপ, ডিমের চপ, বাদাম ভাজা, ঘোল, দই খাওয়ার চল এ অঞ্চলে দেখা যায়।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রচুর নদনদী ও খাল বিল থাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। গরম ভাতের সাথে বিভিন্ন রকমের মাছের ঝোল তরকারি সহযোগে পরিবেশন হয়। কখনও কখনও থাকে ডাল, শাক-সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। বাড়ির আঙিনায় প্রচুর শাক-সবজি জন্মায়। ফলে গ্রামের মানুষের খাদ্যের চাহিদা অনেকাংশে এখান থেকে মিটে যায়। রসনা তৃপ্তিতে ডাল ও বিভিন্ন ধরণের ভর্তা-ভাজির উপযোগিতা সব পরিবারেই সমান। আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, ডাল ভর্তা, টাকি মাছের ভর্তা এলাকার মুখরোচক খাবার। মাংসের প্রচলন সাধারণ মানুষের কালে ভদ্রে হয়। বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া মাংস খাওয়া সাধারণ মানুষের সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বাড়িতে আত্মীয়-জামাই-কুটুম্ব এলে সাধারণত মুরগী জবাইয়ের প্রচলন আছে। ধনীদের খাদ্য প্রণালীতে আছে কোরমা, পোলাও, বিয়ানী, জর্দা, পরোটা, লুচি, নিমকি, হালুয়া, ফিরনি, পায়েশ, সেমাই ইত্যাদি এবং সাধারণ পরিবারে আতপ বা আলো চালের গুড় মিশ্রিত ক্ষীর, মাংস মিশ্রিত খিচুড়ি, সুজি, সেমাই, পিঠা ইত্যাদি।

খাওয়ার পরে অনেকেই চুন সুপারি খয়েরসহ পান-তামাক-জর্দা খেয়ে থাকে। কেউ কেউ এর সাথে সুগন্ধি মশলা পছন্দ করে।

খ. মিষ্টান্ন

বাঙালির খাদ্য তালিকায় পছন্দের খাবার হিসাবে নিঃসন্দেহে মিষ্টিজাত খাবারের স্থান শীর্ষে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে দুধ থেকে তৈরি ছানার মিষ্টি বাঙালিদের অত্যন্ত প্রিয়। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে, পারিবারিক প্রয়োজনে এবং বিয়ে-শাদিতে, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে, অফিস-আদালতে আতিথেয়তায় মিষ্টি একান্ত অপরিহার্য। বর-কনের সম্বন্ধ অনুষ্ঠান, বিবাহানুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া, বউ-ভাত, খাৎনা বা মুসলমানি, আত্মীয়তার সম্পর্কে যাওয়া-আসা, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, চাকুরি লাভের খবর জানানো, ধর্মীয় মিলাদ মাহফিল, পূজার প্রসাদ বিতরণ বা কোনো শুভ কাজের শুরুতে মিষ্টির ব্যবহার অপরিহার্য। বাঙালির প্রতিদিনের জীবনে সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় মিষ্টির ব্যবহার যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি শুধু রসনা তৃপ্তি মেটানোর জন্য মুখ্য নয় – এর সাথে রুচি এবং অভিরুচি জড়িয়ে আছে। এক সময়ে মিষ্টি তৈরি হিন্দু ময়রা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া পেশা থাকলেও বহুদিন থেকে জনপ্রিয়তা এবং চাহিদার কারণে ব্যবসা হিসাবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু লোকজন এ পেশায় আগ্রহী হয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং এর কারিগরও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া যায়। তাই গ্রাম-গঞ্জ, শহরে এবং হাটে-বাজারে সব জায়গায় অজস্র মিষ্টির দোকান গড়ে উঠেছে। মিষ্টির দোকানেই শুধু নয়, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং চায়ের দোকানগুলোতেও যেখানে-সেখানে মিষ্টি পাওয়া যায়। মিষ্টির চাহিদার কারণেই মিষ্টান্ন শিল্পের এই প্রসার।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দুগ্ধজাত ছানার মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা, চমচম, কালজাম, পানতোয়া, রাজভোগ, সন্দেশ, কাঁচাগোলা, প্যাড়া সন্দেশ, নলেন গুড়ের সন্দেশ, ছানার জিলাপি, কমলাভোগ, দুধ চমচম, ল্যাংচা, ছানার পোলাও, ছানার মুড়কি, ক্ষীর সন্দেশ, সাগরভোগ, রসকদম্ব, রসমালাই, দই ইত্যাদি প্রধান এবং জনপ্রিয়। এ ছাড়া অন্যান্য

www.pathagar.com

মিষ্টির তালিকায় রয়েছে সীতাভোগ, ক্ষীরমোহন, জিলাপি, বুঁদে, বাতাসা, কদমা, গজা, খুরমা, লাড্ডু ও অন্যান্য।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে এবং আলমডাঙ্গা বাজার, কুমারী বাজার, হারদি বাজার, হাটবোয়ালিয়া, জামজামি, আসমানখালি, নান্দবার বাজার, বড়-গাংনি বাজার, গোকুলখালি, আলোকদিয়া, সরোজগঞ্জ বাজার, বদরগঞ্জ বাজার, কুতুবপুর বাজার, ঘোলদাড়ি বাজার, হিজলগাড়ি বাজার, দামুড়হুদা, কার্পাসডাঙ্গা, দর্শনা, জীবননগর, হাসাদহ ও অন্যান্য ছোট-খাটো হাটে-বাজারে সব জায়গাতেই মিষ্টি পাওয়া যায়। তবে নির্ভেজাল মিষ্টির জন্য নির্ভরযোগ্য এবং মান সম্পন্ন সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের কালিপদ দাস প্রতিষ্ঠিত 'কালিপদ মিষ্টান্ন ভান্ডার', গোলাম মাহবুব মুকুলের 'মিষ্টিমুখ', আলমডাঙ্গা শহরের হারাণচন্দ্র অধিকারীর 'অধিকারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নাম করা যায়। 'কালিপদ মিষ্টান্ন ভান্ডারের রসগোলা, চমচম, পানাতুয়া, কাঁচাগোলা, সন্দেশ, বুন্দে, দই, শাদা দই; 'মিষ্টিমুখে'র চমচম, রসগোলা, রাজভোগ, ক্ষীর সন্দেশ, দই, সাগরভোগ, দুধ চমচম, এবং 'অধিকারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র রাজভোগ, চমচম, ক্ষীরমোহন, দই, ঘি, ভুজিয়া ইত্যাদির কদর বেশি। এই প্রতিষ্ঠানলো সাধারণত নিজেরা দই তৈরি করেন – কোনো বাজারের কেনা দই বিক্রি করেন না।

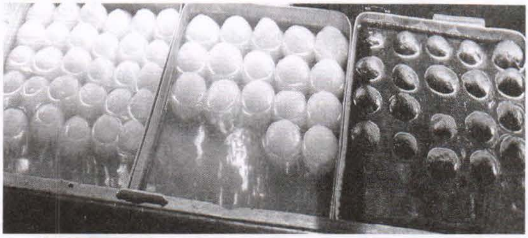

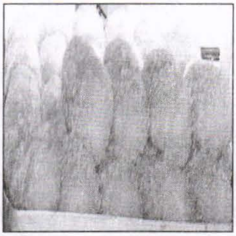

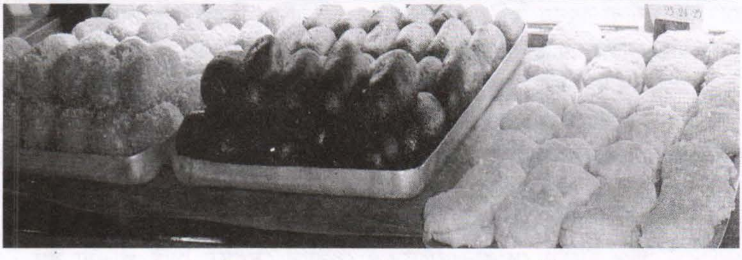

চুয়াডাঙ্গা 'কালিপদ এন্ড গ্রান্ড সন্সে'র কয়েক রকমের মিষ্টি

চুয়াডঙ্গা জেলার সবচেয়ে পুরনো প্রতিষ্ঠান 'কালিপদ মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কালিপদ দাস [জন্ম: ১৮৯৩ – মৃত্যু: ১৯৭৫] পৈতৃক নিবাস আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রাম থেকে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে এসে ১৯১৮ সালে মিষ্টির দোকান খোলেন। তাঁর দোকানের রসগোলা, পান্তুয়া, চমচম, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ তৈরিতে

www.pathagar.com

নির্ভেজাল ছানা, কারিগরি নৈপুণ্য, পেশার প্রতি সততা, প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ততার জন্য অচিরেই তাঁর সুনাম এবং খ্যাতি জেলার ভিতরে এবং বাইরেদূর-দূরান্তরে।

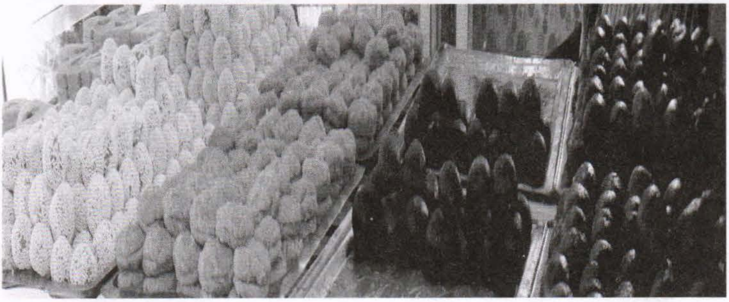

চুয়াডাঙ্গা 'মিষ্টি মুখ' মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বিভিন্ন রকমের মিষ্টি

ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলে তরুণ কালিপদ দাসের দোকানের রসগোলা, পান্তুয়া, চমচম কলকাতার মিষ্টিপ্রিয় মানুষদেরও মনোহরণ করেছিল। বর্তমানে তাঁর উত্তর-প্রজন্মের হাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন থাকলেও নানা বাস্তব প্রতিকূলতার কারণে শেষ পর্যন্ত কত দিন এ পেশায় তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন বলা কঠিন।

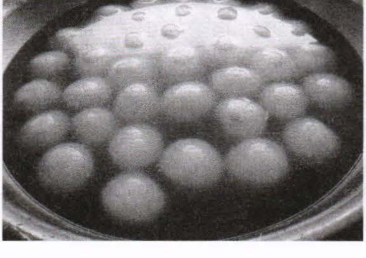

www.pathagar.com

আলমডাঙ্গা 'অধিকারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন

মিষ্টির প্রধান উপাদান দুগ্ধজাত ছানা। নির্ভেজাল ছানার উপরেই নির্ভর করে মিষ্টির গুণগত মান। চুয়াডাঙ্গায় কোনো দিন দুধের কোনো বাজার বসে না। দুধ উৎপাদনকারী এবং দুধ ব্যবসায়ী ঘোষ ও গোয়ালা সম্প্রদায়ের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে মিষ্টান্ন শিল্পীদের। দেশভাগের পর থেকে ক্রমান্বয়ে অধিকাংশ দুধ ব্যবসায়ী ঘোষ ও গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকজন দেশত্যাগ করে চলে গেছে। ফলে দুধের জোগান কম হওয়ায় উচ্চ মূল্যে দুধ কিনে ও প্রয়োজন মতো নির্ভেজাল ছানা না-পাওয়ার কারণে মিষ্টির চাহিদা এবং মিষ্টিজাত খাবারের স্থান শীর্ষে থাকলেও বর্তমানে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় এলাকা ভেদে প্রতি কেজির দাম দুধ ৫০ টাকা এবং ছানা প্রতি কেজি মান ভেদে টানা ছানা ১০০ [মাখন তোল] টাকা, ভ্যাট ছানা ১৬০ টাকা ও সারান [ফুলক্রিমযুক্ত] ছানা ২২০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা দামে বিক্রি হয়। মিষ্টি বানানোর জন্য প্রচুর জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হয়। সে ক্ষেত্রেও প্রতি মণ বাবলা কাঠ স্থান ভেদে ১৮০ থেকে ২৫০ টাকা, জনপ্রতি দৈনিক মজুরি ভাল কারিগরের ক্ষেত্রে ৬০০ থেকে ৩০০ টাকা,ও অন্যান্য কর্মচারির ৩০০ থেকে ২০০ টাকা এবং চিনি ছাড়াও অন্যান্য জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্যের কারণে ভালমানের মিষ্টির উৎপাদন খরচ অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে টিকে থাকা তাই

www.pathagar.com

তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এই কারণে স্বনামধন্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অনেকেই মিষ্টি ব্যবসা গুটিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন অথবা হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ নিরুপায় হয়ে দেশত্যাগ করছেন।

এক সময়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার মোড়ভাঙাসহ অন্যান্য গ্রামের ময়রা সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমে ভাল মানের মিষ্টির যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু গত ১০/১৫ বছরের মধ্যে ব্যবসায় প্রতিকূলতা এবং অন্যান্য বাস্তব সমস্যার কারণে তাঁদের অধিকাংশ লোকজনই গ্রাম ছেড়ে আলমডাঙ্গা শহরে বা আশেপাশের গ্রামে এসে পেশা বদল করে জীবিকা নির্বাহ করছে আর কিছু লোকজন দেশ ছেড়ে চলে গেছে। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে উপযুক্ত আনুকূল্য না পেলে চুয়াডঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন শিল্পের মান এবং সুনাম ধরে রাখা যাবে না।

তথ্যদাতা : প্রবীরকুমার দাস, 'কালিপদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার, চুয়াডাঙ্গা।
হারাণচন্দ্র অধিকারী [জন্ম : ১৯৫৮], 'অধিকারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', আলমডাঙ্গা শহর, আলমডাঙ্গা।
গোলাম মাহবুব মুকুল [জন্ম : ১৯৫১], 'মিষ্টিমুখ', চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার, চুয়াডাঙ্গা।
রাশেদুল ইসলাম জোয়ার্দার [জন্ম : ১৯৪৮], পোস্ট অফিস পাড়া, চুয়াডাঙ্গা।
ওয়ালিউল ইসলাম মালিক [জন্ম : ১৯৪৮], মল্লিক পাড়া, চুয়াডাঙ্গা।
মোঃ মকবুল হোসেন, প্রাক্তন এম. পি. [জন্ম : ১৯৫০], স্টেশন রোড, আলমডাঙ্গা।
মোঃ নাজিমউদ্দিন শেখ [জন্মঃ ১৯৫০], প্রাক্তন চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা
মোঃ মোশারফ হোসেন [জন্মঃ ১৯৫১], প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান, জীবননগরঃ উপজেলা।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

খেলাধুলা মানুষের অবসর উপভোগ তথা চিত্তবিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। মানুষ তার ফেলে আসা অতীতকে খেলাধুলার মাধ্যমে পুনরুত্থিত করে। ব্যবহারিক জীবনে জীবিকাবহুল কাজ নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর প্রয়োজন। আর অবসর উপভোগ করার নিমিত্তে খেলাধুলা ও আমোদ-ফুর্তি প্রয়োজন। রূপসী বাংলার স্বাবলম্বী, অক্লান্ত পরিশ্রমী, নিরক্ষর, নিরহংকার, সহজ, সরল, স্বল্পে তুষ্ট, আমোদ প্রিয়, বিশ্বাস-সংস্কার-আচার প্রিয়, ধর্মভীরু বাঙালি তার কর্মজীবন, বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আবেদন নিবেদনের নিত্যকালের সাধিত পথে চলতে সবর্দা অভ্যস্ত। মানুষ এক সময় গুহাবাসী ও শিকারজীবী ছিল। সে কারণে এখনো চুয়াডাঙ্গাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বালক-বালিকারা বালি দিয়ে গুহা তৈরি করে বা শিকার শিকার খেলে।

লোকক্রীড়ায় বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে বিভিন্ন রূপ আর্থসামাজিক পটভূমিকায়। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণের পশ্চাতে যেসব উপাদান সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে লোকক্রীড়া তার অন্যতম। শ্রম-উৎপাদন-ভোগ-বিশ্রাম যাপিত জীবনে যে প্রবহমান ধারা সক্রিয়; তার একটি বিশেষপর্ব সূচিত হয় শরীরক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। বিবর্তনের পর্যায় ধরে শারীরিক কসরত হয়ে উঠে উৎপাদক শ্রেণির অবকাশ যাপনের নান্দনিক উপাদান। ধীরে ধীরে নান্দনিক এই শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন বিচ্যুত শ্রেণির আনন্দের খোরাক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু উৎপাদনের সাথে সক্রিয় জনগোষ্ঠী এর আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। শারীরিক এসব ক্রিয়া অবকাশের সাথে সাথে অনিবার্যভাবে প্রমোদের বিষয় হয়ে উঠেছে।

লোকক্রীড়ায় সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক পেক্ষাপট মূখ্য। কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন এ খেলায় পড়ে না। সাধারণত পারিবারিক সামাজিক জীবন-যাপনের সাথে সাথে এটি আত্মস্থ হয়ে যায়। ঋতু প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এক একটি ক্রীড়া এক এক সময় অনুষ্ঠিত হয়। কল্পনা শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি, নাট্য উপাদান ও যাদু ক্রিয়া খেলায় ছড়ার উপস্থিতি, ঐতিহাসিক উপাদান এবং যাপিত জীবনের বিবর্তিত ইতিহাস চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের লোকক্রীড়ায় দৃশ্যমান হয়।

নদ-নদী, খাল-বিল, জঙ্গল-জলাশয়ে পূর্ণ থাকায় এ অঞ্চলের মানুষের নানান প্রতিকূলতা আর হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য শারীরিক সাক্ষমতার ব্যত্যয় ঘটলে টিকে থাকা অনুপায় হয়ে যেত। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে এ অঞ্চলের মানুষকে যেমন দৌড়, ঝাপ, লাফ, দিতে হয়েছে তেমনি রসদ সংগ্রহের তাগিদে তীর, ধনুক, বল্লম, টোটা, কোচ বা যুথবদ্ধ কোনো তরবারীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মুসলিম আগমনের প্রাককালে এ অঞ্চলে কৈবর্ত শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। ফলে মৎস শিকার এখানকার মানুষের প্রধান পেশা ও নেশা ছিল। পরবর্তীকালে নদ-নদী,

www.pathagar.com

খাল-বিল, জলাশয়ের মৃত্যু ঘটলে জীবন-জীবিকার বিকল্প পন্থা হিসেবে এ অঞ্চলের মানুষ কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। মৎস শিকার ও কৃষি কাজের প্রাণান্তকর শ্রমসাধ্য কাজে ক্লান্তি শেষে মানুষের জীবনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে অবসর এবং অবসর থেকে প্রয়োজন হয় বিনোদনের। আর এই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তাদের অতীত জীবনের ধারাবাহিক চলচ্চিত্রটি লৌকিক ক্রীড়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করে চিত্তবিনোদনের উপায় খুঁজতে থাকে এবং ভবিষৎ প্রজন্মের মধ্যে তার বীজ রোপনের গোড়াপত্তন করে।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে খেলাকে উপজীব্য করে অনেক মৌখিক ছড়াও রচিত হয়েছে যা খেলোয়াড়দের মন ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে তোলে। এ অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ঘনিষ্ট পরিচয় লোকক্রীড়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

লোকক্রীড়ার মধ্যে সমাজ ইতিহাসের স্বাক্ষর যেমন স্পষ্ট তেমনি আনন্দের পাশাপাশি জাতির বিবর্তিত ইতিহাস, কল্পনা শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি, ঐতিহাসিক উপাদান, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো প্রতিকূল প্রতিবেশ ও বিপদ সংকুল পরিবেশে আত্মরক্ষার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে খেলাগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান। জীবন-জীবিকার কর্মকান্ডের মধ্যে একঘেয়েমি ও ক্লান্তি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ও লোকক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও আজকের বিশ্বায়নের যুগে দেশ বিদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় মুক্ত আকাশ সংস্কৃতিই এখন পালন করছে বিনোদনের মূখ্য ভূমিকা। শহর এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো থেকে তরুণ সেই গা-ভাসানো অনুষ্ঠানমালার উন্মুখ দর্শক-শ্রোতা, যার মধ্যে না থাকে ঐতিহ্যময় জাতীয় সংস্কৃতির বাস্তব প্রতিফলন, না থাকে জ্ঞানচর্চা, না থাক ভবিষ্যৎ অগ্রবর্তী চিন্তা চেতনার ইতিবাচক রূপায়ণ। এভাবে নিজেদের অজ্ঞাতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সংস্কৃতির বলয় থেকে ছিটকে মূল্যবোধ আর রুচির অবক্ষয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে আগামী প্রজন্ম। দেশীয়ভাবে উদ্ভত ও প্রধানত লোকায়ত সমাজে প্রচলিত যে সমস্ত নান্দনিক খেলাধুলার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক ব্যায়ামের চর্চা গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনকে আনন্দমুখর করে রেখেছিল। আধুনিককালে এসে নতুন নতুন নাগরিক খেলাধুলা অনুপ্রবেশ করে লোকক্রীড়ার স্থান দখল করে নিয়েছে।

১. কাঠি খেলা

সাধরাণত দুই বা ততোধিক বালক/বালিকা খেলাটি খেলতে পারে। খেলার উপকরণ হিসেবে কিছু চিকন পাটকাঠি বা বাশের শলাকা সমান্তরালভাবে ভেঙ্গে সাইজ করে নিতে হবে। কাঠির সংখ্যা ২০ থেকে ১০০ বা ততধিক হতে পারে। কাঠিগুলো খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে যেকোনো একজন একটি নিদিষ্ট উচ্চতা থেকে মুঠো করে নিচের দিকে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর ছাড়িয়ে পড়া কাঠিগুলো একে একে খুব সন্তর্পণে আলাদা করে উঠিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কাঠি উঠাতে গিয়ে যেন অন্য কাঠি নড়ে না যায়। কাঠি নড়ে গেলে অন্যজন মেঝেতে পড়ে থাকা কাঠিগুলো ঠিক একই নিয়মে খেলবে। এভাবে খেলা শেষে প্রত্যেকের কাছে জমাকৃত কাঠি গুণে যার কাছে বেশি সংখ্যক কাঠি থাকবে সেই-ই জয়লাভ করবে।

www.pathagar.com

খেলাটির মধ্যে মানুষকে সাবধানি করে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্ন নীড় রচনা করার প্রয়াস পায়।

কথক : মেধা, বয়স : ১১, পেশা : ছাত্রী (৬ষ্ঠ শ্রেণি), চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

২. থৈয়া থৈয়ী খেলা

লৌকিক ক্রীড়ায় অনেকটাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এরকম একটা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ছাপ পরিলক্ষিত হয় থৈয়াথৈয়ী খেলার মধ্যে। সাধারণত পানিতে এখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বালক-বালিকারা নদী বা পুকুরে স্নান করার সময় দলবদ্ধভাবে এখেলা খেলে। পাটকাঠির কিছু অংশ বা কচুরিপানার ডাটের কিছু অংশ একজন পানির উপর ছুঁড়ে দেয়। অন্যরা সেটি পানিতে হাত দিয়ে থৈথৈ করে বা ঝাঁপিয়ে হারিয়ে দেয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা এটি খুঁজতে থাকে। যে আগে খুঁজে পাবে সে সাথে সাথে ধরে ফেলবে এবং পানিতে ডুব দেবে। এরপর সে আবার ডাটাটিকে পানিতে ছুঁড়ে দেয়। এভাবে খেলা চলতে থাকে। খেলার সময় তারা একটি ছড়া ও আবৃত্তি করে,

কলমিলতা মা
পানতে নামো না
পানতে আছে শাপলা ফুল
নষ্ট করো না।

খেলাটি শিকার জীবনের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। একদা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল নদ-নদী, জল-জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদ সংকুল হওয়ায় মৎস শিকার বা জীবন-জীবিকা অন্বেষণ সহজতর ছিল না। কখনো কখনো জীবনবাজি রেখে তারা শিকারে নামতে বাধ্য হয়েছে। সমবেত এই শিকার ক্রিয়ার স্মৃতিচিহ্ন শিশু কিশোরদের খেলার আদলে থৈয়াথৈয়ী খেলাটি টিকে আছে। খেলাটি যশোর-খুলনা অঞ্চলে কৈয়াকৈয়ী খেলা নামে পরিচিত।

কথক : তানিয়া, বয়সঃ ১৪, পেশা : গৃহ সহকারী, গুলশান পাড়া, চুয়াডাঙ্গা।

৩. গাছ ঝাঁপ খেলা

সাধারণত বর্ষাকালে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ডোবা ও পুকুরগুলো কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। এ সময় উদ্দাম-উত্তাল বালক-বালিকারা ডোবা বা পুকুর ধারের ছোট ছোট গাছগুলোতে উঠে যতদূর সম্ভব দূরত্বে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। যে যত দুরত্বে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে সেইই প্রথম। ক্লান্তিহীনভাবে এ খেলা চলতে থাকে। খেলাটির মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের সাথে সাহসিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

তথ্য : নিজস্ব সংগ্রহ।

৪. কোটবন্দি খেলা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় লোকক্রীড়ার একটি হল কোটবন্দি খেলা। অনেক সময় বড়রা ছোটদের সাথে খেলাটি খেলে থাকে। ৩/৪ জন গোল হয়ে মুখোমুখি বাবু হয়ে বসবে। এরপর ছোট একটি পাথরের টুকরো মুড়ে রাখা হাটুর ভাঁজে লুকিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

সময় নিম্নোক্ত ছড়াটি কাটবে,

ইস খালি বিশ খালি
গুটি রাখলাম
এই মান্দারেব থলি

গুটি লুকানোর পর পরবর্তী ব্যক্তিকে গুটি খুঁজতে বলা হবে। সে এই ছড়াটি কাটবে এবং গুটি খুঁজতে থাকবে,

এ কোট খালি
বেকোট খালি
গুটি আছে
এই মান্দারের থলি।

এভাবে যদি সে গুটিটি খুজে পায় তাহলে জয়ী হবে না হলে পরবর্তী অংশগ্রহণকারী গুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। আদিম যুগে মানুষ পশু পাখি শিকার করে জীবিকা অন্বেষণ করত। খেলাটির মধ্যে স্থলভাগের পশুপাখি শিকারের চিত্র পরিদৃশ্য হয়।

কথক : মোঃ আকতারুজ্জামান, বয়স : ২৬, হাজরাহাটি, চুয়াডাঙ্গা।

৫. বুড়িছুট/বৌচি খেলা

বুড়িছুট একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলায় দুটি দল থাকে। কিশোর, কিশোরীরাই প্রধানত এ খেলায় অংশ নেয়। এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় বুড়ি বা বৌয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিপরীত পক্ষের খেলোয়াড়দের কাজ হল বুড়ি বা বৌকে পাহারা দেওয়া। বৌপক্ষের একজন খেলোয়াড় "চিঁ চিঁ" শব্দ একটানা দম বন্ধ করে উচ্চরণ করতে করতে বৌয়ের পাহারাদারদের ছুঁয়ে মর করার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য আটকে রাখা বুড়ি বা বৌকে উদ্ধার করা। বৌপক্ষীয় খেলোয়াড়দের দম ছাড়া অবস্থায় বৃত্তের বাইরে অবস্থানকালে পাহারাদারদের কেউ যদি ছুঁয়ে দেয়, তবে সে 'মর' হয় অন্যদিকে বৌ নিজেও পালাতে চেষ্টা করে। বৌ পক্ষীয় সব খেলোয়াড় 'মর' হয়ে গেলে অথবা বৌ একাকী পালাতে গেলে বিপক্ষের খেলোয়ারা যদি তাকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে বৌপক্ষীয় খেলোয়াড়দের পরাজয় ঘটে।

খেলাটি প্রাগৈতিহাসিককালের সমাজ ব্যবস্থার স্মৃতি বহন করে এবং প্রাচীনকালের বিবাহরীতির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৬. এক্কাদোক্কা খেলা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মেয়েদের সর্বাধিক প্রচলিত একটি খেলা যদি হয় চু কিৎ কিৎ, তবে অন্যটি হল নিঃসন্দেহে এক্কাদোক্কা। এক্কাদোক্কা খেলায় মেঝেতে বা মাটির উপরে দাগ টেনে কোট বা ঘর আঁকা হয়। তারপর মাটির ভাঙা পাতলা চাক্তি নিয়ে খেলা শুরু হয়। অংশগ্রহণকারিণী নির্দিষ্ট ঘর লক্ষ্য করে চাকতিটি নিক্ষেপ করে ও এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর অতিক্রম করে। একেবারে শেষ ঘরটিতে দাঁড়িয়ে চাকতিটিকে

www.pathagar.com

পেছনের দিকে নিক্ষেপ করতে হয়। চাকতিটি যে ঘরে গিয়ে পড়ে সেই ঘরটি নিক্ষেপকারিণীর কেনা হয় বলে ধরা হয়। একমাত্র কেনা ঘরটিতেই খেলোয়াড় দুটি পা রাখার অধিকারিণী। একে একে সবকটি ঘর কেনা হয়ে গেলে খেলায় জয় লাভ ঘটে। চাকতিটি নির্দিষ্ট ঘরে ফেলতে না পারলে তার দান চলে যায় অথবা চাকতি দাগের উপর পড়লে সে দান ধরা হয় না। ইতোমধ্যে যে ঘর কেনা হয় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে সেই ঘর ডিঙিয়ে চলতে হয়।

এক্কাদোক্কা খেলা দুজন বা দলবদ্ধভাবে ও খেলা হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বার্থ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হওয়ার রীতি এ খেলায় রয়েছে।

এই খেলায় ভূমি ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যের জমিতে তার অধিকার নেই। সেখানে সে একপায়ে লাফিয়ে চলে। একমাত্র নিজের জমিতে অধিকার বলে দুই পায়ে দাঁড়াতে পারে। নারী স্বভাবত নীড়াশ্রয়ী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষকে ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল এবং ঘরকন্নায় নারীর ভূমিকা মূখ্য ও সক্রিয়। এক্কাদোক্কা খেলায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৭. গাদি খেলা

খেলাটি কিশোর-কিশোরী থেকে বড়রাও খেলতে পারে। পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ৩/৪ জনের অধিক খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ নিতে পারে। এই খেলায় অংশ গ্রহণের আগে অবশ্যই একটা ভূমি নকশা তৈরি করে নিতে হবে। সাধারণত সমান্তরাল মাঝে দাগ কেটে এই নকশা তৈরি করা হয়। নকশাকৃত ভূমি অংকনটি গাদির দান বা গাদির ঘর নামে পরিচিত। কোনো কোনো অঞ্চলে এটিকে নুনঘর বলে। ভূমি নক্শা বা গাদির দান অনুসারে খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। গাদির দানের মধ্যে যে ছক তৈরী করা হয় সেখানে পক্ষ-বিপক্ষের খেলোয়াড়রা যার যার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিয়ে থাকে। এখানে ছক অনুসারে পক্ষ-বিপক্ষ মিলিয়ে (৫+৫)=১০ জন খেলোয়াড় অংশ নিতে পারে। পক্ষ দলের খেলোয়াড়রা গাদি ঘরের মধ্যে থাকবে এবং তারা সেখান থেকে বের হবার চেষ্টা করবে। আর বিপক্ষ দল তাদের আটকে রাখতে চেষ্টা করবে। গাদি ঘর থেকে বের হয়ে পক্ষ দলের সবাই একে একে নুনঘর ও পাকি ঘরগুলো প্রদক্ষিণ শেষে আবার গাদি ঘরে ফেরার চেষ্টা করবে। মনে রাখতে হবে পক্ষদল প্রতিটি ঘরেই প্রতিপক্ষের বাঁধার সম্মুখীন হবে। পক্ষদলের যে কেউগাদি ঘরে ঢুকতে পারলেই তারা জয়ী হবে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ যদি দাগের মধ্যে থেকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে পক্ষদল 'মর' যাবে এবং বিপক্ষ দল নতুনভাবে গাদিঘর থেকে খেলা শুরু করবে।

প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে নানা প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। ঝড়-ঝঞ্জা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক বাঁধার মোকাবিলায় এ অঞ্চলের মানুষকে নিরন্তর পরিকল্পনা মাফিক এগুতে হয়েছে। প্রতিটি বাঁধাকে অতিক্রম করে তাদেরকে আগামী দিনের রসদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। এজন্য তাদেরকে শারীরিক

www.pathagar.com

ও মানসিকভাবে আত্মপ্রত্যয়ী হতে হয়েছে। খেলাটির মধ্যে সকল বাধা পেরিয়ে জীবন জীবিকার অন্বেষণে নিরন্তর পথ চলার প্রত্যয় লক্ষণীয় এবং এজন্য শারীরিক ও মানবিক শক্তি গঠনের ইঙ্গিত মেলে।

নিজস্ব সংগ্রহ।

৮. লাঙল খেলা/খয়ে লাঙল খেলা

লঘু হাস্য চপল এই খেলাটি খেলতে মাত্র তিনজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। দুজন পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়ায়। তৃতীয়জন সেই হাতের উপর ডানপায়ের হাঁটু ভেঙে ভর দিয়ে আরেক পা মাটিতে রেখে দাঁড়ায় এরপর দুজন হাটতে থাকে। আর এক পাওয়ালা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। অর্থাৎ লাঙল ভঙ্গিমায় এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে দুজন গরু অন্যজন চাষী। চাষী গরুকে ইচ্ছেমত চালনার সময় মুখে বলবে,

খয়ে লাঙল বয়ে যায়,
হাঁটতে হাঁটতে জীবন যায়

চল চল ডানে চল বায়ে চল যা-যা খেলাটি এ অঞ্চলের জমি কর্ষণ, লাঙল, জোয়াল, গরু, কৃষক ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ততার স্মৃতি চিহ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা খেলার আদলে আজও সমাজে চলমান।

কথক : সাবরিনা ইয়াসমিন, বয়স : ৩৫, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা।

৯. বল্লা বল্লা খেলা

খেলাটিতে তিনজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। দুজন শক্তিমান কিশোর/যুবক একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে মুখোমুখি দাঁড়াবে। অন্যজন তার পেট ও কোমর বরাবর রেখে যুবকদ্বয়ের হাতের উপর সমস্ত শরীরের ভর রেখে শূন্যে অবস্থান করবে। এরপর যুবকটি দুই হাত বুকের সাথে মৃদু শব্দে আঘাত করে বলতে থাকবে,

এক হাত বল্লা
বারো হাত শিং
বল্লা নাচে ধাতিং তিং তিং।

খেলাটিতে শারীরিক কসরতের পাশাপাশি মানুষের পাখির মতো উড়ার প্রাণান্তকর প্রয়াস লক্ষণীয়। আজকের যুগে বিমানে দেশ বিদেশ ভ্রমণের প্রয়াসের হয়ত ঐ খেলাটির মধ্যেই লুকায়িত আছে।

কথক : আনিছুর রহমান, শেষ বর্ষ (সম্মান), ইস:ইতিহাস, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

১০. কপাল টোকাটুকি/গোলাপ টগর খেলা/ নাম পাতাপাতি খেলা

কপাল টুকাটুকি বা নাম পাতাপাতি খেলা চমৎকার অনুভূতির খেলা। খেলাটি মেয়েদের হলেও ৭/৮ বছরের ছেলেরাও মেয়েদের সাথে খেলতে পারে। অন্তত ১০/১২ জনের কম হলে খেলাটি জমে না। এ খেলায় সমপরিমান লোক দুদলে ভাগ হয়ে যায়। দুদলে দুজন রাজা থাকে। রাজাদের নির্বাচন মোটামুটি সর্ব সম্মতিক্রমেই হয়। যদিও রাজাদের

www.pathagar.com

দল গঠন অত সহজে হয়না। রাজা ঠিক হয়ে গেলে যে কয় জোড়া খেলোয়াড় থাকে তাদের জোড়ায় জোড়ায় নাম পাতিয়ে আসতে বলা হয়। সে নাম শুধু খেলোয়াড় দুজনই জানে। যেমন দুজন খেলোয়াড় তাদের নাম রাখল যথাক্রমে পাখি ও মাছ। নাম পাতিয়ে এসে ওরা একজন জিজ্ঞেস করবে কি চাও, পাখি না মাছ। রাজা হয়ত বলবে, পাখি চাই। তখন পাখি নামীয় খেলোয়াড় উত্তরদাতা রাজার দলে আসে, মাছ অন্যদলে চলে যায়। এভাবে দল গঠন হয়ে গেলে দুজন রাজা তাদের দলের লোকদের নিয়ে দুটি সীমান্তে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসবে। সেখানে উভয় রাজাই নিজ দলের লোকদের একটি করে নাম ঠিক করে। প্রথমে একদল হয়ত নাম ঠিক করল পাখি অথবা ফলের নামে, অপর দল ফুলের অথবা মাছের নামে। উভয় দলকেই যাতে একই নামে বিভ্রাটে পড়তে না হয় তার জন্য সর্তকর্তা অবলম্বন করে অন্য বিষয়ের নাম রাখতে হবে। তারপর বিপক্ষ দলের রাজা বিরোধী দলের একজনের চোখ ভালভাবে চেপে ধরে নিজ দলের জনৈক খেলোয়াড়কে ধরা যাক তার নাম কাঁঠাল, ডাকা হয় এই বলে আয়রে আমার কাঁঠাল। সাথে সাথে কাঁঠাল নামীয় খেলোয়াড় পা টিপে টিপে এসে চোখ চাপে ধরা খেলোয়াড়ের কপালে একটি টোকা মেরে আবার সন্তপনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে। এবার চোখ খুলে দিয়ে রাজা বলবে, বলত দেখি কে টোকা দিয়েছে? যদি ঠিক মতো উত্তর দিতে পারে তবে সে এক লাফে যতটা আসতে পারে ততটা জায়গা এগিয়ে গিয়ে বসবে। যদি বলতে না পারে তবে যে টোকা দিয়েছিল সে একলাফে যতটা পারে ততটা এগিযে বসবে। এভাবে যতক্ষণ এক রাজার দল অপর রাজার জমি বা সীমানা দখল করতে না পারছে ততক্ষণ খেলা চলতে থাকে। খেলা শেষে বিজয়ী দলের রাজা পদ্মাসনের মতো করে বসবে দুপায়ের দুটো বুড়ো আঙুল শক্ত করে ধরে পরাজিত রাজার লোকেরা তখন চ্যাং দোলা করে রাজাকে দোলাতে দোলাতে পরাজিত রাজার সীমানায় নিয়ে যাবে। যেতে যেতে তারা নিম্নোক্ত ছড়া কাটবে,

রাজা যায় হেলতে দুলতে
পানের পিক ফেলতে ফেলতে।

খেলাটি প্রণালীবদ্ধভাবে চালাতে পারলে বালক/বালিকাদের মধ্যে দলনেতা নির্বাচন, দলগঠন ও দলের প্রতি আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। আবার লাফ ঝাঁপ ফলে শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের কাজের স্পৃহা জাগ্রত হয়। আবার সাফল্যের ফলশ্রুতিতে রাজোচিত সংবর্ধনার বিষয়টি ও শিশুমনে অধ্যবসায়ী হয়ে সফল হওয়ার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে উৎসাহিত করে।

কথক : আয়েসা সিদ্দিকা, ২য় বর্ষ (সম্মান), চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।

১১. চোর পুলিশ খেলা

খেলায় ৪জন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়। পরিবারের বড়দের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হতে পারে। খেলার নিয়মাবলী চার টুকরো কাগজ কেটে নিতে হবে। টুকরো কাগজগুলোর একটাতে 'চোর' যার প্রাপ্ত নম্বর অংকে লেখা থাকবে-২০, একটি কাগজে ডাকাত নম্বর লেখা থাকবে-৪০, একটিতে লেখা থাকবে বাবু নম্বর-৬০ আরেকটি কাগজে লেখা থাকবে পুলিশ

www.pathagar.com

নম্বর-৮০। এরপর কাগজগুলো এমনভাবে ভাঁজ করবে যাতে ভেতরের লেখা না,দেখা যায়। কাগজের টুকরোগুলো মেঝেতে রেখে অংশগ্রহণকারীরা ইচ্ছেমত যেকোনটি টেনে নিতে পারে। কাগজে যা লেখা আছে সে মোতাবেক সবাইকে ভূমিকা নিতে হবে। প্রথমে চোর, ডাকাত ও বাবু এদের থেকে একজন বলবে,

পুলিশ পুলিশ কোনো হ্যায়?
পুলিশ বলবে হ্যাম হ্যায়।

তখন আর একজন বলবে

চোরকা পাকড়াও অথবা ডাকাতকা পাকড়াও।

এবার পুলিশ অন্য তিন জনের ভেতর থেকে একজন চোর অথবা ডাকাত সাব্যস্ত করবে। যদি পুলিশ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে পুলিশ পূর্ণ নম্বর ৮০ পাবে এক্ষেত্রে চোর ডাকাতের নম্বরটি শূন্য হবে। আবার পুলিশ যদি চোর চিহ্নিত করতে না পারে তবে পুলিশ '০' শূন্য নম্বর পাবে। বাবুর নম্বর কোনো অবস্থাতেই কাটা যাবে না। প্রতি পূর্বের খেলার প্রাপ্তনম্বর একটি আলাদা কাগজে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নাম লিখে তা সংরক্ষণ করবে এবং খেলা শেষে প্রাপ্ত নম্বরগুলো যোগ করে যে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেইই বিজয়ী হবে।

খেলাটির মাধ্যমে শিশুমনে ভালোমন্দ নির্ণয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য উৎসাহী করে তোলে। পুলিশ বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করতে না পারে ও শাস্তি না দিতে পারে তাহলে দুর্বৃত্তদের উৎপাত বৃদ্ধি পায় এবং পুলিশ বা আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনী নিয়ে মানুষের মনে আস্থাহীনতা দেখা দেয়। অন্যদিকে সমাজে শান্তিপ্রিয় মানুষদের কেউ ক্ষতি করতে পারে না 'বাবু' চরিত্রটির মাধ্যমে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

কথক : শফিকুল রহমান, সোনাতনপুর, মুন্সিগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

১২. গদ গুটি খেলা

দুজন খেলোয়াড় নিয়ে গদ গুটি খেলা যায়। প্রথমে নরম মাটিতে ১ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করে দুই সারিতে ৮/১০টি গর্ত খুড়তে হবে (গর্তের সংখ্যা ৪+৪=৮টি অথবা ৫+৫=১০ টি)। এবার এক সারির গর্তে ১০টি করে খেজুরের আটি বা তেতুল বীচি রেখে দিতে হবে অন্য সারির গর্তগুলো খালি থাকবে। দুজনের যে কেউ খেলা শুরু করতে পারে। প্রথমে যে কোনো একটি গর্তের গুটি হাতে নিয়ে পরবর্তী গর্তে একটি করে আটি বা বীচি রেখে দুই সারির ঘরই ঘুরে আসতে হবে। যেখানে শেষ হবে তার পরবর্তী গর্ত থেকে আটি বা বীচি নিয়ে পুনরায় একটা করে বীচি দিয়ে গর্তগুলো ঘুরে আসতে হবে। এভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে দেখা যাবে কোনো কোনো ঘরে প্রচুর আটি বা বীচি জমা হয়েছে। আবার কোনো কোনো গর্ত শূন্য প্রায়। এভাবে খেলতে খেলতে যে গর্তে আটি বা বীচি শেষ হবে এবং যদি পরবর্তী ঘর শূন্য থাকে তাহলে শূন্য গর্তের পরের গর্তে যত সংখ্যক আটি বা বীচি থাকবে তার সবই ঐ খেলোয়াড়ের হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ব্যক্তি একই নিয়মে খেলা শুরু করবে। খেলা শেষে যে যত আটি বা বীচির মালিক হবে সেইই জয়ী হবে।

www.pathagar.com

খেলাটির মধ্যে উৎপাদনশীলতা তথা বীজ বপন এবং আবাদ শেষে শস্য মজুদ করে সংরক্ষণের ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান। এখানে এক সারির গর্তে আটি বা বীচি মজুদ থাকলেও পাশের সারির গর্তগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ফাঁকা থাকে। এরপর একটা একটা করে আটি বা বীচি দিতে দিতে এক সময় খালি গর্তগুলো পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন অন্য গর্তগুলো আবার খালি হয়। অর্থাৎ খালি জমিতে বীজ বপনের ফলে ধীরে ধীরে সোনালী ফসলে মাঠ ভরে উঠে। কৃষকের মন আনন্দে নেচে উঠে। আর জমিতে ছড়ানো ছিটানো ফসল একত্রিত করে ভবিষ্যতের জন্য মজুদ রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

কথক : ফকির মমতাজ উদ্দীন গাঁই, বড় গাংনী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

১৩. ডাংগুলি খেলা

সাধারণত গরু চরানোর সময় উন্মুক্ত মাঠে রাখাল বালকেরা খেলাটি খেলে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দুজন অথবা দুদলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লাংলা লাঠি বা পাচুনী আকারের শক্ত এক হাত লম্বা পরিমাণ লাঠি যাকে ডাং বলে এবং এক বিঘত বা আধ হাত কাঠি যাকে গুলি বলে এ খেলার উপকরণ। একটি ছোট গর্ত খোড়া হয়। গর্তে গুলি রেখে ডাংএর সাহায্যে তুলে বিপক্ষের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দেয়। ওদের যে কোনো একজন গুলি মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিতে পারলে ডাংধারী দান হারায়। তখর দলের অন্যজন ঐ নিয়মে ছোড়ার জন্য এগিয়ে আসে। আর ধরতে না পারলে ডাং গর্তের উপর রেখে দিতে হবে এবং বিপক্ষ দল গুলি ছুড়ে ডাং স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। যদি ডাং স্পর্শ করতে না পারে তাহলে ডাংয়ের সাহায্যে গুলি যতদূর সম্ভব দূরে পাঠিয়ে দেবে এবং ঐ দূরত্ব থেকে ডাং দিয়ে মাপতে মাপতে আসবে। মাপার সময় নিম্নোক্ত ছড়াটি বলবে,

এনা বেনা তেনা শীষ
কেলে ডোগর উনিশ বিশ

এভাবে গুণে যত বিশ হবে তত ইউনিট যোগ হবে। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা যে পর্যন্ত না হাত নিতে পারছে ততক্ষণ এভাবে খেলা চলতে থাকে।

খেলাটির সাথে বর্তমানের ক্রিকেট খেলার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে ক্রিকেটের ব্যাটসম্যান ও ডাং ধারীর ভূমিকা একই। পিচ ও গর্ত প্রায় অভিন্ন। এটি ক্রিকেট খেলার গ্রাম্য সংস্করণ বলা যায়।

কথক : বেলীয়ারা, ২য় বর্ষ (সম্মান), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, বয়স: ১৮।

১৪. গোল্লাছুট খেলা

সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪/৬ থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত হতে পারে। খোলা মাঠ বা বাগান এ খেলার উপযুক্ত স্থান। একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা : ৪০/৫০ হাত দূরে ইট-পাথর বা কোনো গাছ বহি: সীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটা কাঠি থাকে তাকে গোল্লা বলে। দলে একজন নেতা থাকে আর অন্য সদস্যরা 'গদা' নামে পরিচিত। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে

www.pathagar.com

গাছ বা সীমানা ছোঁয়াই এখেলার মূল লক্ষ্য। যে পক্ষ প্রথম দান পায় তারা গর্তের গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। গদারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান ব্যক্তিকে ধরে ঘুরতে থাকে। সুযোগ বুঝে তারা ছুটে গিয়ে গাছ বা সীমানা স্পর্শ করবে। এ সময় বিপক্ষরা ছুয়ে দিলেই খেলোয়াড় মর যায়। একে একে শেষ পর্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকেও ছুট দিতে হয়। যারা সফলকাম হবে তারা গোল্লা থেকে জোড় পায়ে একটা করে লাফ দেয় বহি:সীমার দিকে। সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌঁছাতে পারলে এক 'পাটি' হয়। না পারলে অথবা সবাই স্পর্শ দোষে মারা পড়লে বিপক্ষরা দান পাবে। এ পক্ষের কোনো পাটি গণ্য হবে না। পর্যায়ক্রমে গোল্লা পাওয়া এবং প্রতিরোধ করার ভিতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। পাটির সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

খেলাটির মধ্যে উত্তম শারীরিক কসরস লক্ষনীয়। সাবধাণ করে তোলার ইঙ্গিত বহন করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায়।

কথক : নাহিদা খাতুন, বড় বলদিয়া, কুড়ুলগাছি, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা, বয়স-২০।

১৫. পলাপলি বা লুকোচুরি খেলা

লুকোচুরি খেলা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে পলাপলি খেলা নামে পরিচিত। খেলায় একজনকে রাজা করা হয়। লটারীর মাধ্যমে একজনকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। রাজা চোরের চোখ বন্ধ করে রাখে। দলের অন্যরা এ সুযোগে আত্মগোপন করে। তারপর রাজা চোরের চোখ খুলে দেয় এবং আত্মগোপনকারীদের খুঁজে বের করতে বলে। আত্মগোপনকারীদের যে কোনো একজনকে খুঁজে ধরে আনতে পারলে অথবা তাকে ছুঁয়ে এসে রাজাকে আগেই স্পর্শ করলে ঐ বালক/বালিকা পরবর্তী খেলায় চোর হবে। কিন্তু সে যদি ছোঁয়া বাঁচিয়ে অথবা ছোঁয়ার পরও দৌড়ে এসে আগে ভাগেই রাজাকে ছুঁয়ে নেয় তবে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে না। চোর যতক্ষণ পর্যন্ত সফল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার চোখ বন্ধ করে পালাক্রমে খেলা চলতে থাকে।

প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে জীবন-যাপন করত। যাপিত জীবনে আত্মরক্ষার জন্য তারা গাছের কোঠরে, পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকত। খেলাটির মাধ্যমে আদিম আত্মগোপনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। দুর্বল আত্মগোপন ও সবল আত্মপ্রকাশ লেখাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কথক : জুলমত মন্ডল, গ্রামঃ হাজরাহাটি, ডাকঃ তালতলা, চুয়াডাঙ্গা, বয়সঃ ৭০।

১৬. কুমির কুমির খেলা

১০/১৫ জন বালক/বালিকা একত্রে দলবদ্ধভাবে খেলাটি খেলতে পারে। উঠোন বা বারান্দায় উচু নিচু জায়গা নদী ও ঘাটের কৃত্রিম পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। দলের একজন প্রথমে কুমিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিচে সামান্য দূরে সে ওৎপেতে থাকে। অন্যরা তখন স্নান করতে নামে। তারা স্নানের ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়ে এবং মুখে হাপুস-হুপুস শব্দ করে। এ সময় নিচের ছড়াটি ও কাটতে দেখা যায়,

কুমির তোর জলে নেমেছি
স্নান করে ময়লা ধুয়েছি।

www.pathagar.com

কুমির সুযোগ পেলেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্নানকারীরা পালানোর চেষ্টা করে। যে ধরা পড়ে সে কুমির হয়। আগের কুমির ছাড়া পায়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

খালবিল-নদী/নালার সাথে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মানুষের ঘনিষ্ট যোগাযোগ-পারাপারে, মৎস্য শিকার, বাণিজ্যযাত্রায়,তীর্থ যাত্রায় এবং স্নানাদিসহ ব্যবহারিক নিত্যকর্মে। এসব কাজে নানা বিপাকে পড়ে কুমিরের কবলে পড়ে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। স্নানের সময় কিভাবে কুমির মানুষ শিকার করে তার কৃত্রিম অভিনয় করে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রত্যহিক লোক জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

কথক: ডালিম উদ্দিন, শেষ বর্ষ (সম্মান), ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, বয়স : ২৪।

১৭. চিকা খেলা/চিতে খেলা

সাধারণত পুরুষেরা খেলাটিতে অংশ নিয়ে থাকে। মাঝে একটি দাগ কাটা হয়। দাগের এ পারে থাকে একজন এবং দাগের ও পাশে দাঁড়ায় অন্যজন হাতে হাত মিললে টানাটানি শুরু হয়। যার শক্তি বেশি ও কৌশল ভাল সে অন্যজনকে দাগের উপরে অর্থাৎ নিজের সীমানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

জমাজমি সংক্রান্ত সীমানা দ্বন্দ্ব মানুষ আদিকাল থেকে চালিয়ে এসেছে। এ খেলায় গোষ্ঠিবদ্ধ বা এককভাবে সমাজ জীবনের যুদ্ধ প্রদ্ধতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ খেলায় কুশলীর চেয়ে বলীর জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

কথক : শামসুল আলী, ডাক, আলুকদিয়া, চুয়াডাঙ্গা। বয়স : ২৫।

১৮. রুমাল চুরি

রুমাল চুরি দলবদ্ধ একটি খেলা। প্রথমে একজনকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। অন্যরা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। রুমাল হাতে চোর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে কোনো একজনের পেছনে অতি সন্তর্পণে সেটি রেখে দেয়। যার পেছনে রাখা হয়েছে সে যদি টের না পায় তাহলে ঠিক এক পাক ঘুরে এসে তার পিঠে কিল-থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আগেভাগে জেনে ফেললে সে রুমাল নিয়ে সরে পড়ে। চোর তার স্থানে বসে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একই নিয়মে ঘুরতে ঘুরতে যে কোনো একজনের পিছনে রুমাল রেখে মারার সুযোগ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে পারলে মারের চোট কমে। এভাবে রুমাল চুরি খেলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ও অবসর যাপন করে থাকে।

রুমাল চুরি খেলা গ্রাম্যজীবনে বিচার ব্যবস্থার প্রতিফলন। চুরি আইনের চোখে অপরাধজনক। মারধর করে চোরকে শাস্তি দেয়া হয়। সমাজ জীবনে এরূপ ঘটনা বালিকারা খেলার ভেতর দিয়ে অভিনয় করে থাকে।

কথক : আফিল উদ্দিন, গ্রাম: বড় গাংনী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। বয়স: ৪৭ বছর

১৯. কানামাছি খেলা

এ অঞ্চলের একটি অসম্ভব জনপ্রিয় খেলা কানামাছি। খেলার শুরুতে একজনের দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। যার ভূমিকা হবে অন্ধ বা কানার মতো। অন্যান্য খেলোয়াড়রা চারদিক থেকে এই অন্ধ বা কানাকে মাছির মতো ঘিরে তার গায়ে টোকা

www.pathagar.com

বা মৃদু ধাক্কা দিয়ে এই ছড়াটি কাটে,

কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে খুশি তাকে ছোঁ।

এ সময় কানা চোখ বাঁধা অবস্থায় হাত বাড়িয়ে অন্য খেলোয়াড়কে ধরার চেষ্টা করে ও এই ছড়াটি কাটে,

আমি অন্ধ মানুষ ভাই
কাউকে যদি ধরে ফেলি
আমার কোনো দোষ নাই।

কখনো বা চোখ বাঁধা অবস্থায় এদিক ওদিক দৌড় দিতে দিতে বলে,

আনি গুনী জানিনা
পরের চেলে মানিনা।

কানা যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে ধরতে বা চিনতে না পারে ততক্ষণ এমনিভাবে খেলা চলতে থাকে। তবে কাউকে ধরতে বা চিনতে পারলেই কানার ভূমিকা থেকে মুক্তি পাবে এবং ধৃত ব্যক্তি কানার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নতুনভাবে খেলা শুরু করবে।

অনুভূতিপ্রবণ খেলাটির মধ্যে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে খেলোয়াড়দেরকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। এটি একটি দলবদ্ধ ও অত্যন্ত আনন্দদায়ক খেলা।

কথক : আফিল উদ্দিন, গ্রাম: বড় গাংনী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। বয়স: ৪৭ বছর।

২০. দড়ি লাফানো খেলা (ইস্কিপিং খেলা)

দড়ি লাফানো খেলাটি সাধারণত ৮/১০ বছরের মেয়েদের খেলা। খেলুয়াড়ের উচ্চতা অনুসারে দড়ি ব্যবহার করা হয়। গ্রাম অঞ্চলে বাঁশের কুঞ্চি বা কোনে কোনো ক্ষেত্রে বেত ব্যবহৃত হয়। এটাকে বেতলা বলে। খেলাটি প্রতিযোগিতামূলকভাবে হয়ে থাকে। এক সাথে একাধিক বালিকা খেলা শুরু করবে। দড়ি বা কঞ্চি বা বেত এর দুই মাথা দুই হাতে ধরে পায়ের নিচ দিয়ে মাথার উপর হয়ে প্রদক্ষিণ করবে। যদি কেউ হাতে পায়ে আটকে যায় তাহলে সে বাদ যাবে। এক নাগাড়ে যে যত বেশি সময় ধরে খেলাটি চালিয়ে যেতে পারবে সেই জয়ী হবে।

খেলাটির মধ্যে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয়। উত্তম ব্যায়াম হয়। বালকরা ও খেলাটি খেলতে পারে।

কথক : নাসিমা আকতার জাহান, গৃহিণী, গুলশান পাড়া, চুয়াডঙ্গা বয়স : ৪০ বছর।

২১. হৈলডুগ খেলা

খেলাটি পানির খেলা মূলত পানিতে ডুব দিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ির মাধ্যমে খেলাটি করা হয়। যে ডুব দিয়ে ছোঁবে তাকে অন্য ছেলে মেয়ে অনামিকা আঙুল উঁচিয়ে বলবে এটা কী? জবাব আসবে 'ডুবি'। তখন সবাই বলে তুই আমাকে ছুঁবি বলেই ডুব দেবে। এরপর যে ছোঁবে সে অন্যদেরকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। যতক্ষণ ছুঁতে না পারবে ততক্ষণ খেলাটি চলতে থাকবে। ছুঁতে পারলে অন্যজন একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

www.pathagar.com

খেলাটির মধ্যে পানিতে মাছ শিকারের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার নির্বাহের ইঙ্গিত বহন করে। পানিতে জীবনবিনাশী জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে শিকারের প্রাণান্ত প্রয়াস খেলাটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

২২. কাঁদা মাটি ঝাঁপ খেলা/সড়সড়ি খেলা

কোনো উঁচু পুকুর পাড় বা মরা নদীর উঁচু পাড় খেলার স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়। প্রথমে পুকুর পাড়ের ঢালু অংশে পানি ঢেলে পিচ্ছিল করে নিতে হবে। উঁচু-নিচু জায়গা গুলো যতদূর সম্ভব সমান ও ছুলছুলা করে নিতে হবে। এরপর এক এক জন করে পুকুরের পাড়ে উঁচু মাথায় বসে দেহকে পিচ্ছিল জায়গায় সমপর্ণ করতে হবে। দেখা যাবে অতি দ্রুত পুকুর বা নদীর পানিতে গিয়ে ঝপাৎ শব্দে পড়ছে। আবার ভেজা গায়ে উপরে উঠে একই নিয়মে খেলা শুরু করা যাবে। এভাবে বিরতিহীনভাবে খেলাটি চলতে পারে। খরস্রোতা নদীর উথাল পাথাল ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত খেলাটির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

কথক : নাসিমা আকতার জাহান, গৃহিণী, গুলশান পাড়া, চুয়াডঙ্গা বয়স : ৪০ বছর

২৩. ষোলগুটি খেলা

ষোলগুটির খেলায় প্রথমে ছক কেটে নিতে হয়। খেলায় দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। দুজনের প্রত্যেকেরেই ১৬টি করে গুটি থাকবে। কার কোনো গুটি তা রং দিয়ে বা ছোট বড় আকারে দিয়ে পূর্বেই চিহ্নিত করে নিতে হবে। প্রথমে একজন একঘর সামনে গুটি ঠেলে দিয়ে খেলা শুরু করবে। এরপর সুবিধামত গুটি আশেপাশে দেয়া যায়। উভয় খেলোয়াড় পরস্পরের গুটি মারতে পারে। কেবল লাফ দ্বারা চালের সুযোগ এলে গুটি মারা পড়ে। গুটি মেরে একপক্ষের ঘর শূণ্য অথবা তার চালের পথ রুদ্ধ করতে পারলে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়।

খেলার ধরণ ও পদ্ধতিতে ছদ্মবুদ্ধের কৌশল লক্ষণীয়। এটি দারা খেলার গ্রামীণ সংস্করণ। তবে দাবার গুটির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গুটির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চালের পদ্ধতি এবং গতিবিধি ভিন্ন। কিন্তু ষোল গুটির খেলায় সকল গুটির মান সমান। ধৈর্য্য, সতকর্তা ও কৌশলের ব্যত্যয় ঘটলে খেলায় পরাজয় নিশ্চিত।

কথক: ইকলাস উদ্দীন, গ্রাম: বড় গাংনী, আলডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা বয়স; ৪৫ বছর।

২৪. জোড়-বেজোড় খেলা

সাধারণত তেতুঁল বা খেজুরের আটি অথবা মাটির ছোট ঠুকরা দিয়ে খেলা যায়। দুজন খেলোয়াড় সমান সংখ্যক আটি বা মাটির টুকরা হাতে নিবে। চোখের আড়াল করে আটি বা মাটি বদল করে মুষ্টিবদ্ধ হাত অপর পক্ষের খেলোয়াড়ের চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করবে বল জোড় না বেজোড়? খেলাটি যেহেতু অনুমান নির্ভর সে জন্য আন্দাজে বলতে হবে জোড় বা বেজোড়। সঠিক বলতে পারলে অপর পক্ষের আটি বা মাটিগুলো তার হয়ে যায়। এভাবে খেলতে খেলতে যে বেশি গুটি জিতে নেয়, সেই জয়ী হয়।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

www.pathagar.com

২৫. বাঘবন্দী খেলা

মাটির উপর দাগ কেটে বাঘবন্দীর ঘর তৈরী করা হয়। দুভাগে খেলাটি করা যায়। প্রথমটি (৬+৬)=১২ গুটির সাহায্যে এবং দ্বিতীয়টি (১০+১০)=২০ গুটির সাহাযে দুজন খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ১২ গুটি বাঘবন্দিতে দুদলে দুটি বাঘ থাকে। সরল রেখা বরাবর গুটির বিপরীত পাশে শূন্য ঘর পেলে লাফ দিতে পারে। এতে একটি গুটি মারা পড়ে। তবে বাঘকে কেউ মারতে পারেনা। তাকে বন্দী করা যাবে। অপরদিকে ২০টি গুটির বাঘবন্দীতে একজন বাঘের চাল দেয়। অপরজন গুটির চাল দেয়। বিপরীত দিকে শূন্য ঘর থাকলে বাঘ লাফ দিতে পারে। এতে একটি গুটি মারা পড়ে। কিন্তু পরপর দুটি ঘর গুটি দখল করে রাখলে বাঘের গতিপথ বন্ধ হয়। গুটির চালে বাঘ মরে না, গুটিগুলো আত্মরক্ষা করতে পারে। গুটি চালতে চালতে বাঘের পথ রুদ্ধ করতে পারলে বিপক্ষের জয় হয়। কিন্তু বাঘ সবগুটি খেয়ে ফেললে বাঘের জয় হয়। বাঘবন্দী যুদ্ধের খেলা। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গুটির চাল দিতে হয়। বাঘবন্দী খেলায় শিকারের কৌশল রয়েছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

২৬. লাঠি সারা খেলা

একাধিক বালক দলবদ্ধভাবে খেলতে পারে। রাখাল বালকদের মধ্যেই খেলাটির চল বেশি। প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাঠি থাকবে। এদের মধ্যে একজন প্রথমে তার হাতের লাঠিটি অন্যদের অগোচরে লুকাবে। লুকানো শেষ হলে অন্যরা অতি সর্ন্তপণে লাঠিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। প্রথমে যে লাঠিটি খুঁজে পাবে সে গোপনে লাঠিটি ছুঁয়ে দিয়ে বসে পড়বে। এরপর অন্যরা খুঁজে বের করবে। যে প্রথমে খুঁজে বের করবে সে প্রথম স্থান অধিকার করবে। পরের জন দ্বিতীয় এভাবে স্থান নির্ধারিত হবে। পশু পাখি শিকারের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার আদিম পদ্ধতি খেলাটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। শিকার খুঁজে বে করার প্রবণতা খেলাটি মুখ্য বিষয়।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

২৭. গুলতি খেলা

শিশু কিশোরদের কাছে গুলতি একটি জনপ্রিয় খেলা। সাধারণত দ্বিমুখী গাছের ডালের সাথে (একটু সাইজমত কেটে) বাই-সাইকেলের টাইয়ার কেটে ব্যান্ড বানিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। এরপর মাটির গুলি তৈরি করে শুকিয়ে সেটাকে গুলতির গুলি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো খেজুরের আটি, তেতুলের বীচি ও গুলি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গুলতির সাহায্যে পাখি শিকারও করা যায়। তবে শিশু কিশোররা এটিকে খেলা হিসেবেই গ্রহণ করে থাকে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

www.pathagar.com

২৮. মুচি মুচি খেলা

মুচি মুচি খেলার জন্য ৫ জন খেলোয়াড়রের দরকার হয়। ৩/৪ হাত দুরত্ব রেখে বর্গাকৃতি ৪টি কোণা চিহ্নিত করা হয়। ৪ কোণায় ৪জন দাঁড়ায়, একজন দাঁড়ায় ভেতরে এ শেষোক্তজনই 'মুচি'। কোণায় ৪জন সতর্কভাবে পরস্পর কোণা পরিবর্তন করে চলে এবং মুখে নিম্নোক্ত ছড়া আওড়াতে থাকে,

মুচি মুচি কে রে
পা ধোয়ায়ে দে রে-
কাল যাব বাথানে
জুতো গড়ায় দেরে।

তখন মুচি ও চেষ্টা করবে পরিত্যক্ত কোণা দখল নিতে। কেউ যদি কোণাচ্যুত হয়ে পড়ে তবে সে নতুন মুচিতে পরিণত হবে। কেউ যদি কোণাকুণি পরস্পরের স্থান নিরাপদে বিনিময় করতে পারে তাহলে মুচির ঘাড়ে এক গোল হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি এগিয়ে চলে।

নিজস্ব সংগ্রহ।

২৯. ঢেঁকি খেলা

ঢেঁকি খেলায় দুজন অংশগ্রহণকারী থাকে। একজন দুহাত মাটিতে ঠেকিয়ে পেছন দিকে দুপা মাটিতে ভর দিয়ে মাজা উঁচু করে ঢেঁকির মতো অবস্থায় দাঁড়াবে। অপরজন ঢেঁকির দুপায়ের ফাঁকে দাঁড়িয়ে পিঠে থাবা দিয়ে বলে,

ঢেঁকি লো?
কি লো।
কনে গিলি?
ধান ভানতি
কি ধান?
শালি ধান।
শালি ধানে কি হয়?
চিড়ে হয়।
ভানো তো দেখি
ঢেকুসকুস, ঢেকুসকুস.......

সাথে সাথে ঢেঁকি বার বার মাথা উঁচু করবে। আবার মাটিতে হাত ঠেকাবে মনে হবে যেন ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানা হচ্ছে।

লোক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ঢেঁকি। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি জীবনের সাথে ঢেঁকি জড়িয়ে আছে। ধান,গম, চিড়ে কোটা, চালের গুড়া তৈরীতে ঢেঁকি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উপযুক্ত লোকক্রীড়ার মাধ্যমে ঢেঁকির ব্যবহার প্রতিফলিত হয়েছে।

কথক : জাহাঙ্গীর আলম, মুন্সিগঞ্জ বাজার, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, বয়স : ৩৫ বছর

www.pathagar.com

৩০. ওপেনটি বায়োস্কোপ

প্রথমত দুজন ছেলে/মেয়ে অর্থাৎ দুজন রাজা যাদের একজনের নাম চাল এবং অন্যজনের নাম ডাল সামনা-সামনি দাড়িয়ে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরে। অন্যদিকে ৭/৮ জন ছেলেমেয়ে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে লম্বা শিকলি লাইন করে দুরাজার মাঝখানের পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া আসা করতে থাকে। এসময় দুরাজা নিম্নোক্ত ছড়াটি কাটতে থাকে :

ওপেনটি বাক্স
রাইটানা টেকস
সুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বিবির বৈঠক খানা
রাজ বাড়িতে যায়ে
পান সুবোরি খায়ে
পানে আছে মৌরি বাটা
ইসকাবনে চাবি আটা।

ছড়াটি শেষ হওয়ার সাথে রাজাদের হাত নিচে নেমে আসবে এবং একজনকে আটকে ফেলবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে চাল না ডাল? সে যেকোনো একটা বলবে। তারপর তাকে আলাদা জায়গায় বসতে বলা হবে। এভাবে শেষজন পর্যন্ত ছন্দের তালে তালে খেলাটি এগিয়ে যাবে। যে রাজার দলে লোক সংখ্যা বেশি হবে সে রাজা জয়ী হবে।

৩১. জামাই চুরি খেলা

মাটিতে চার কোণায় চারটি গোলকৃতি ঘর কাটা হয়। মাঝখানে ও অনুরূপ গোলাকৃতি একটি ঘর কাটা হয়। চারদিকের ঘরে চারজন দাড়াবে। মাঝখানের ঘরে থাকবে চোর। চারজন পরস্পরের মধ্যে লাফ দিয়ে ঘর বদল করবে। আর চোর সুযোগ বুঝে যে ঘরে প্রবেশ করবে সেই ঘরের মানুষ অধিকার হারিয়ে চোর হয়ে মাঝের ঘরে দাড়াবে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৩২. লাঠি খেলা

লাঠিখেলা চুয়াডাঙ্গার একটি ঐতিহ্যবাহী বিনোদনমূলক উপাদান। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রথমে পুরোদল একসাথে মাঠ উদ্বোধন ও ঝাঁকের খেলা দিয়ে লাঠি খেলা শুরু হয়। একটি দলে ২০ থেকে ৩০জন খেলোয়াড় থাকে। লাঠি খেলায় প্রস্তুতি, কৌশল এবং শক্তি প্রদর্শনই মুখ্য। আগুন নিয়ে খেলা, তিন রকমের মারের খেলা, বাঁশের খেলা, রাম দা-র খেলা, তরবারির খেলা, টাঙি বা হাত কুড়ুলের খেলা, চাকুর খেলা, ফালা বা ফলার খেলা, দড়ির খেলা, মারামারির খেলা, ডাকাতি খেলা ইত্যাদি চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান লাঠি খেলা।

এছাড়াও বিচিত্র ধরণের লাঠি খেলা আছে। এর মধ্যে বত্রিশ আনির খেলা, বাগান খেলা, রংপশারি, কাউন্সিল খেলা, তুড়মি ও আড়খেলা উল্লেখযোগ্য। লাঠির

www.pathagar.com

অনেকগুলো কসরতের মধ্যে উল্লেখ্য হলো বেনট, পাট্টা, আলী প্যাঁচ, রংভাজ,উস্তাদি, পাঁয়তারা গরম, সেলামি ইত্যাদি। লাঠি খেলার মধ্যে কিছু নাচেরও ব্যবস্থা আছে, যেমন সখা নৃত্য, নৌকা বাইচ নৃত্য, হাজরা, পেট্টা নৃত্য, আলী নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, মানুষ পোতা নৃত্য, ঢেঁকি নৃত্য, জেকের নৃত্য, ময়ূর নৃত্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আগে মহরম উপলক্ষে মূলত লাঠি খেলার জমজমাট আসর বসত। তা ছাড়া গ্রাম্য মেলা, জমিদারদের পুণ্যাহ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপলক্ষে লাঠি খেলার আয়োজন করা হতো। জমির দখল নিয়ে যে কাইজা বা মারামারি তাতে লাঠি খেলোয়াড়দের একটা সামাজিক ভূমিকা ছিল। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান শতকের চার দশক পর্যন্ত দামুড়হুদার গ্রামাঞ্চলে লাঠিয়াল, তীরন্দাজ ও সড়কিবাজ হিসেবে অনেকেই খ্যাতিমান ছিলেন এবং তাঁদের নাম কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লাঠি খেলায় ঢোল, কাঁসি, তাসা, ঝুমঝুমি, ফ্লুট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়। লাঠিয়ালরা দৃষ্টিনন্দন পছন্দ মতো দলীয় পোশাক পরে থাকে।

চুয়াডাঙ্গা উপজেলার হাট কালুগঞ্জ, সুমিরদিয়া, কেদারগঞ্জ, বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা জোয়ার্দার পাড়া, দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা, মোক্তারপুর, জয়নগর, সুলতানপুর লাঠিখেলার দলের সন্ধান পাওয়া যায়। চুয়াডাঙ্গার হাট কালুগঞ্জের কুদ্দুস, কেদারগঞ্জের ঝড়ু, সুমিরদিয়ার ওদুদ মণ্ডল ও মজিবর রহমান এবং দামুড়হুদা উপজেলার জয়নগর গ্রামের শুকুর আলির দক্ষ লাঠি খেলোয়াড় হিসাবে নাম আছে।

তথ্যদাতা : মজিবর রহমান [জন্ম : ১৯৬৮], সুমিরদিয়া, চুয়াডাঙ্গা।

৩৩. হা ডু-ডু

খেলায় দুটি পক্ষ থাকে। খোলা জায়গায় একটি নিদিষ্ট মাপের 'কোর্ট' তৈরি করা হয়। বয়স ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা অনুযায়ী কোর্টের মাপ ৬×৫ হাত ১১×৭ হাত বা ১৪×৭ হাত হতে পারে। উভয় পক্ষে ৭জন, ৯জন বা ১১জন খেলোয়াড় থাকে। খেলায় স্থানটি একটি সরল রেখা দ্বারা সমান দুই কোর্টে বিভক্ত থাকে। এই রেখার দুই দিকে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের খেলোয়াড় অবস্থান করে। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের খেলোয়াড় মাঝ রেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপর পক্ষের সীমানায় প্রবেশ করে।

দম বন্ধ অবস্থায় মুখে ছড়া বা কিছু আবৃত্তি করতে করতে যদি প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নির্বিঘ্নে নিজের কোর্টে ফিরে আসতে পারে তাহলে বিপক্ষ দলের ঐ খেলোয়াড়টি মারা পড়ে। বিপরীত পক্ষের সীমানায় প্রবেশের পর ঐ প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা যদি অনুপ্রবেশকারী খেলোয়াড়কে ধরে ফেলেতে পারে এবং খেলোয়াড়টির দম ফুরিয়ে যায় তখন অনুপ্রবেশকারী খেলোয়াড়টি 'মর' হয়। এভাবে একটি দলের সব খেলোয়াড় যখন মর যায়, তখন অন্য দলটি জয়ীর সম্মান লাভ করে।

খেলাটি প্রাচীন বাঙালি সমাজের সংগ্রামশীলতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। প্রতিপক্ষের বৃহ্য ভেদ করে আক্রমণের দ্বারা পরাজিত করে ফিরে আসার কৌশলের ও স্মৃতি বহন করে চলেছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

www.pathagar.com

৩৪. ঘুড়ি ওড়ানো

ঘুড়ি ওড়ানো চুয়াডাঙ্গার আবহমানকালের একটি অতি আনন্দদায়ক ও প্রাচীনতম লোকক্রীড়া। হেমন্তের উত্তরে বাতাস শুরু হয়ে গেলে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করে এবং চলে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত। ঘুড়ি তৈরিতে সাধারণত কাগজ, বাঁশের শলাকা, বাবলার আঠা বা বলা গাছের ফলের আঠা ব্যবস্থার করা হয়। অবশ্য বর্তমানে গাম বা আইকা ব্যবস্থার করা হয়। এক সাথে অনেক ঘুড়ি উড়ানোর সময় সুতো কাটাকাটির প্রতিযোগিতা হয়। বাতাসের টানে অনেক সময় সুতো ছিঁড়ে কয়েক মাইল পর্যন্ত ঘুড়ি উড়ে যায়। কাটা ঘুড়ি ধরার জন্য কমবয়সী ছেলেদের উল্লাস ও দৌড় ঝাঁপ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে পতেঙ্গা ঘুড়ি, চিলে ঘুড়ি, সাপ ঘুড়ি, ঢং ঘুড়ি, সাপ ঘুড়ি মানুষ ঘুড্ডি। বিমান ঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রচলন দেখা যায়।

আকাশ পথে কোনো অশুভশক্তি যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রাচীনকাল থেকে ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশে শব্দ করা হতো। অর্থাৎ ঘুড়ি ওড়ানো ক্রীড়াটি অশুভশক্তি বিতাড়নী জাদু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৩৫. গাছ ছোঁয়া খেলা

স্বল্প উঁচু একটি গাছ খেলার স্থান হিসেবে বেছে নিতে হবে। ৮/১০ জন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে একজন বুড়ি নির্বাচিত হবে। ১৫/২০ হাত দূরে আরেকটি গাছ সীমানা হিসেবে বেছে নিতে হবে। এবার বুড়ি দৌড়ে সীমানা গাছ ছুতে যাবে। এ সুযোগে অন্য খেলোয়াড়রা তাদের নির্দিষ্ট গাছে উঠে বসবে। যদি, বুড়ি সীমানা গাছ ছুঁয়ে দৌড়ে এসে গাছে উঠার আগে কাউকে ছুয়ে দিতে পারে বা গাছে অবস্থানরত কাউকে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে বুড়ি হয়ে যাবে এবং বুড়ি ঐ দলের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক সময় মানুষ বনে জঙ্গলে বসবাস করত অথবা বনের ধারে গরু, মহিষ চরানোর সময় নেকড়ে বা ভাল্লুকের কবলে পড়লে গাছে উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। খেলাটি বন্য প্রাণীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়ের স্মৃতি চিহ্ন বহন করেছে।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৩৬. ব্যাঙ লাফানো খেলা

শান্ত পুকুর, মরা নদী বা খাল-বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বালকরা খেলাটি খেলে থাকে। মাটির ভাঙা হাড়ি পাতিলের খাপড়া বা চাড়া চৌকোনা করে সাইজ করে নিতে হবে। যার এক একটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১ ইঞ্চি ১১/২ ইঞ্চি। ছেলেরা এ চাড়া বা খাপড়া এমনভাবে পানির উপরে ছুঁড়ে মারে যাতে সেটি ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে অনেক দূর যেতে পারে। চলতে চলতে সেটি আপনা-আপনিই ডুবে যায়। পানির উপর দিয়ে চাড়াটি ছুটে চলার সময় কতবার লাফ দিল এবং কত দূরে গেল তার উপরই নির্ধারিত হয় হারজিৎ।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

www.pathagar.com

৩৭. ইকড়ি মিকড়ি খেলা

ইকড়ি মিকড়ি ছড়ার খেলা। ছড়া বলার সাথে সাথে খেলাটি শুরু হয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চক্রাকারে হাঁটু মুড়ে বসে সামনে মাটিতে দুহাত উপড় করে রাখে। অপেক্ষাকৃত একজন বয়স্ক খেলোয়াড় প্রধান হয়। সেইই নিম্নোক্ত ছড়াটি আবৃত্তি করে,

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
ভাইয়া হে, বন্ধু হে,
আমার ছাতা ধর হে,
ছাতার উপর ঘুঘুটা
লাফ দিয়েছে বাবুটা,
বাবুদের হাড়ি
সোনার চাল কাঁড়ি।
এলপাত বেলপাত
তুলে ফেল তোমার
সোনার হাত।

প্রধান খেলোয়াড় এক একটি শব্দ বা শব্দাংশ উচ্চারণের সাথে সাথে এক একটি হাতের পাঞ্জা স্পর্শ করে। ছড়ার শেষ শব্দটিতে যার যে হাত স্পর্শ করে সে হাত তুলে পেট বা বগলে চেপে রেখে গরম করে। পুন:পুন ছড়াটি আবৃত্তি করে শেষ হাত পর্যন্ত তুলতে হয়। এবার প্রধান খেলোয়াড় সবার হাত পরীক্ষা করে দেখে হাত গরম হয়েছে কিনা যার হাত ঠাণ্ডা থাকে সে চোর হয়। এতেই তার পরাজয়।

ইকড়ি মিকড়ির প্রথমাংশ Game of Chance এর পর্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত এক জনকে চোর সাব্যস্ত করা এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার অভিনয়ের মধ্যে সামাজিক বিচার প্রথার অনুকরণ লক্ষণীয়।

নিজস্ব সংগ্রহ।

৩৮. গাদন খেলা

নরম মাটিতে বাশেঁর লাঠি (লাঙলা লাঠি) দিয়ে খেলাটি খেলতে হয়। দুই বা ততোধিক খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে পারে। প্রথমে একজন সজোরে তার হাতের লাঠিটি মাটিতে পুতে দেয় এরপর দ্বিতীয় জন চেষ্টা করে আঘাত করে পূর্বে মাটিতে পুতা লাঠিটি ফেলে দিতে পারে তাহলে লাঠিটি আঘাত করা খেলোয়াড়ের হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় খেলোয়াড় আসবে এবং একই নিয়মে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের লাঠিতে আঘাত করবে। যদি লাঠিটি ফেলে দিতে পারে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির হয়ে যাবে নতুবা দ্বিতীয় ব্যক্তির হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি এগিয়ে চলে। সবশেষে লাঠিগুলো যখন একজনের দখলে চলে আসবে তখন খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে।

খেলাটির মধ্যে দখলি প্রক্রিয়ার ছায়া প্রতিফলিত হয়। জোর যার মুল্লুক তার এই প্রবাদের বাস্তব রূপায়ণ খেলাটির প্রধান শর্ত। বাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার খেলাটির মূল বিষয়।

নিজস্ব সংগ্রহ।

www.pathagar.com

৩৯. লাটিম খেলা

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্জলেই কমবেশি লাটিম খেলা প্রচলন রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্জলে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে পারে। লাটিম তৈরিতে সাধারণত কাঠ ও পেরেকের সূচালো অংশ ব্যবহৃত হয়। লাটিম ঘুরাতে পাকানো সুতা ব্যবহার করা হয়। এই সুতা 'লেছি' বলে। প্রথমে একজন লাটিমে সুতা পেঁচিয়ে সজোরে মাটিতে ছেঁড়ে দেবে এবং লাটিমটি ঘুরতে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় একই প্রক্রিয়ায় মাটিতে ঘূর্নায়মাণ লাটিমে আঘাত করবে। যদি প্রথম লাটিমে পেরেকের সূচালো মাথা গেথে দিতে পারে তবে লাটিমটি দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের হয়ে যাবে। এভাবে দ্বিতীয়জন আবার লাটিম মাটিতে ঘুরাবে এবং অন্যজন আঘাত করবে। এভাবে লাটিমগুলো যখন দখলে চলে আসবে তখন খেলার জয় নির্ধারিত হবে। আবার একাকি লাটিম ঘুরিয়ে ও আনন্দ উপভোগ করা যায়।

নিজস্ব সংগ্রহ।

৪০. দোলনা খেলা

গ্রাম্য বালক-বালিকারা গাছের উঁচু ডালে দড়ি ঝুলিয়ে নিচে এক টুকরো কাঠ বা মোটা লাঠি বেঁধে দোল খেলা করা যায়। এতে পেছন থেকে একজন ঠাক্কা দেয়। ফলে অনেক দূর পর্যন্ত দোল খাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমে একে একে সবাই দোল খেতে পারে। বর্তমানে বাসা বাড়িতে ও পার্কে দোলনা টাঙিয়ে দোলের ব্যবস্থা করা হয়।

কথক : নিজস্ব সংগ্রহ।

৪১. এক্কাদোক্কা

মেয়েদের সর্বাধিক প্রচলিত একটি যদি হয় চুকিৎকিৎ, তবে অন্যটি নিঃসন্দেহে এক্কাদোক্কা। এমন বাঙালি মেয়ে পাওয়া যাবে না যে নাকি এই দুটো খেলার একটিতেও অংশ নেয়নি।

এক্কাদোক্কা খেলায় মেঝেতে বা মাটির উপরে দাগ টেনে কোট বা ঘর আঁকা হয়। তারপর মাটির ভাঙা পাতলা চাকতি নিয়ে খেলা শুরু হয়। অংশগ্রহণকারিণী নির্দিষ্ট ঘর লক্ষ করে চাকতিটি নিক্ষেপ করে। এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর অতিক্রম করে। একেবারে শেষে শেষ ঘরটিতে দাঁড়িয়ে চাকতিটিকে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করতে হয়। চাকতিটি যে ঘরে গিয়ে পড়ে, সেই ঘরটি নিক্ষেপকারিণীর কেনা হলো বলে ধরা হয়। একমাত্র কেনা ঘরটিতেই খেলোয়াড় দুটি পা রাখার অধিকারিণী। একে একে সবকটি ঘর কেনা হয়ে গেলে খেলায় জয় লাভ ঘটে। চাকতিটি নির্দিষ্ট ঘরে ফেলতে না পারলে তার দান চলে যায়। অথবা চাকতি দাগের উপর পড়লে সে দান ধরা হয়না। ইতিমধ্যে যে ঘর কেনা হয়, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে সেই ঘর ডিঙিয়ে চলতে হয়।

এক্কাদোক্কা খেলা দুজনে বা দলবদ্ধভাবেও খেলা হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বার্থ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হওয়ার রীতি। এই খেলায় ভূমি ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যের জমিতে তার অধিকার নেই, সেখানে সে একপায়ে লাফিয়ে চলে। একমাত্র নিজের জমিতে অধিকার বলে দুই পায়ে দাঁড়াতে পারে।

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে যাত্রা এক অমূল্য সম্পদ। ঐতিহ্যমণ্ডিত কোনো লোকবিষয়কে নাট্যরূপ দিয়ে তার যে গীতাভিনয় প্রদর্শন করা হয় তাকেই যাত্রা বলা হয়। গ্রামের পাশে মাঠ বা হাট-বাজার সংলগ্ন খোলা জায়গায় টিন ও বাঁশ দিয়ে তৈরি প্যাণ্ডেলে যাত্রার আসর বসে। দৃশ্যপটহীন খোলা মঞ্চে সোচ্চার কণ্ঠে অতিরিক্ত অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে অভিনয়, সঙ্গীত ও বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠিত হয় যাত্রা। অতীতে পল্লীঅঞ্চল যাত্রার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

প্রাচীন লোকসাহিত্যের ক্রমবিবর্তিত রূপ হচ্ছে যাত্রা। যাত্রার প্রথম যুগে পৌরাণিক কাহিনীর প্রাধান্য ছিল। বিশ শতকের প্রথম ভাগে যাত্রার ভেতর দিয়ে কিংবদন্তী, ইতিহাস, দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম ও সমাজ সংস্কারের কথা প্রচারিত হচ্ছে। এখন সামাজিক অনাচার, সমস্যা, সংকট ও প্রণয়োপাখ্যান ইত্যাদি নিয়ে অনেক জনপ্রিয় পালা রচিত হয়েছে। বর্তমানে বিনোদনের অনেক আধুনিক মাধ্যমে প্রবর্তন এবং দর্শক শ্রোতাদের রুচির পরিবর্তনের কারণে যাত্রার চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পেলেও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এর জনপ্রিয়তা এখনো কমেনি। যাত্রায় সুসংবদ্ধ কাহিনীর সংযোগ ও সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তা এখন একটি উন্নতমানের শিল্প মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। গীত ও অভিনয়ে পারদর্শী লোকের সমন্বয়ে যাত্রা পরিবেশিত হয়। গত এক শতাব্দীতে চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনেক যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল। মৃত্যুঞ্জয় অপেরা, শঙ্করী অপেরা শক্তিমিলন অপেরা (চুয়াডাঙ্গা), রংমহল অপেরা (জামজামি), সরোজগঞ্জ যাত্রা ইউনিট (তিতুদহ), পল্লীশ্রী অপেরা (আসমানখালি), হিরোবয়েজ যাত্রা গোষ্ঠী (লক্ষ্মীপুর), গাড়াবাড়িয়া যাত্রা ইউনিট, মিলনী অপেরা, রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠী ইত্যাদি যাত্রাদল যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি লাভ করেছিল। মোমিনপুরে শখের যাত্রাদল ছিল। কয়েক দশক আগেও গ্রামাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা যাত্রাদলকে সমস্ত শীতকাল ধরে জেলার সর্বত্র গান করতে দেখা যেত। এসব যাত্রাদলে যেসব পালা অভিনীত হয়েছে তাদের মধ্যে– সুলতানা রিজিয়া, সিরাজউদ্দৌলাহ্, সোহরাব রুস্তম, টিপু সুলতান, ভাওয়াল সন্ন্যাসী, একটি পয়সা, বর্গী এলো দেশে, চাঁদবিবি, অশ্রু দিয়ে লেখা, দেনাপাওনা, বেহুলা- লখিন্দর, বিদুষীভার্যা, জানোয়ার, মমতাময়ী মা, ফাঁসির মঞ্চে, অরুণ বরুণ কিরণমালা, বাংলার বধু, আনারকলি, লাইলী মজনু, রূপবান যাত্রা, আলোমতি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে 'রূপবান যাত্রা' চুয়াডাঙ্গা এলাকার গ্রামগঞ্জে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। পালাটির পুরোনাম 'রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা'। 'রূপবান' যাত্রার 'ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে' গানটি একদা হাট-বাজার মুখরিত করে রেখেছিল। সেই জনন্দিত পালার একাংশে রূপবান তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বাদশা-কন্যা

www.pathagar.com

তাইজেলকে উদ্দেশ্য করে বলে:

প্রাণ সখীরে, মন না জেনে প্রেমে মইজো না।
আগে না জানিলে গো তারে,
প্রেম করিলে পড়বে ফেরে
শেষে কাঁদলে আরত সারবে না॥
পিরীতে এমনি গো ধারা,
এক প্রেমেতে দুইজন মরা–
নইলে প্রেম আর দুইদিন রবে না॥
আমি করি বন্ধুর গো আশা,
ও কি তাইজেল সর্বনাশা,
এত জ্বালা প্রাণে সহে না।
এত দুঃখ প্রাণে সহে না॥
শোন তাইজেল গো,
মন না জেনে প্রেমে মইজো না॥

১. ভাসান যাত্রা পালা/বেহুলা লখিন্দর পালা

বন্দনা : ওমা পুরাণে তোর নাম শুনি
ওরে পুরাণে তোর নাম শুনি
এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
আয় গো মাতা সরস্বতী মাগো
কণ্ঠে কর ভর
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
আকাশেরও তারাবন্দি মাগো
পাতালেরও বালি। ২বার
রে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
ওরে বসিতে আসনও দিব মাগো
মস্তকেরই পর
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
ওরে চারকোণায় চার দেবতা বন্দি
মধ্যে করলাম ভর। ২বার
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে

www.pathagar.com

ওমা তারিণী ॥
ওরে এই আসরে করবেন দোয়া
লক্ষী সরস্বতী
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
ওরে তারপরে বহনও বন্দি মাগো
দশ ভাইয়েরও পায়
দশ ভাই আমার করবেন দোয়া গো
আমাদের এই আসরে
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥
ওরে তারপরে বহনও বন্দি মাগো
উস্তাদেরও পায়
উস্তাদ আমার আবুসদ্দি গাইন
পুলতাডাঙ্গায় বাড়ি
ওরে এইবার ত্বরাইতে হবে
ওমা তারিণী ॥

(চাঁদ সওদাগরের প্রবেশ)

চাঁদ সওদাগর : সারাদিন বসে ভাবছি কি করি, কোথায় যায়? দিনে দিনে পুত্র লখিন্দর বড় হয়ে গেল কিন্তু বিবাহের কোনো সদগতি হলো না। দেখি সনকা কি বলে। কোথায় সনকা? (সনকার প্রবেশ)

সনকা : প্রাণোনাথ আপনি কেন আমাকে ডাকছেন?

চাঁদ সওদাগর : বলছি, দিনে দিনে পুত্র লখিন্দর বড় হয়ে গেল কিন্তু বিবাহের কোনো সৎ উপায় হলো না। এককথায় তোমার মতামত কী?

সনকা প্রাণোনাথ তোমারও যে মতো আমারও সেই মতো। তবে একটা কথা।

চাঁদ সওদাগর : আবার কী কথা?

সনকা : আমি একে একে ছয় পুত্রকে বিসর্জন দিলাম কালিদহের জলে। শেষ পুত্র বাপ লখিন্দরকে নিয়ে গৃহে আছি ভুলে। দেবীর পূজা দিয়ে তবে দেব বাপ লখিন্দরের বিয়ে।

চাঁদ সওদাগর : (সনকাকে লাথি দিয়ে) সনকা দেবীর পূজা কখখনো দেব না। আমার একে একে ছয়পুত্র কালিদহের জলে বিসর্জন দিয়েছি। শেষ পুত্র লখিন্দরকে বিসর্জন দিলেও দেবীর পূজা দেব না।

সনকা : (গান)

ওহে প্রাণেশ্বর, ধরি আপনার কর,
পূজা দাও হে আগে দেবী মনসার।

www.pathagar.com

দেবীর পূজা হলে দিব বাছার বিয়ে
নইলে বাছা আমার যাবে গো মরে
ওহে প্রাণেশ্বর, ধরি আপনার কর,
পূজা দাও হে আগে দেবী মনসার।

চাঁদ সওদাগর : সনকা------কখখনো সে পূজা পাবে না।

সনকা : (গান)

ও তুমি দেবীর পূজা কর গো
ও প্রাণের সওদাগর
আরে ও প্রাণের সওদাগর ॥ ২বার
ও আমি একে একে ছয় ছয় পুত্র গো
ও নাথও দিলাম বিসর্জনও গো
ও প্রাণের সওদাগর ॥
ও আমার মা বুলা ধন হারিয়ে যাবে গো
ও নাথ কে ডাকবে মা বলে গো
ও প্রাণের সওদাগর ॥
ও আমার কে ডাকিবে মা মা বলে গো
ও নাথও আর তো কেহ্ নাইও গো
ও আমার হারানো ধন চোখের মনি গো
ও নাথও সেওনা যাবে ছেড়ে গো
ও প্রাণের সওদাগর
ও তুমি দেবীর পূজা কর গো
ও প্রাণের সওদাগর ॥

চাঁদ সওদাগর : সনকা! কখখনো আমি মনসার পূজা দেব না।

সনকা : (গান)

ও প্রাণো কান্ত হও হে শান্ত
ধরি আপনার পায়
ও সামান্য ভেবো না নাথও
কাল সাপিনী মনসা
ও প্রাণের কান্ত হও হে শান্ত
ধরি আপনার পায়
ও প্রাণের কান্ত ॥
হস্তে ধরি পায়ে পড়ি গো
ও পূজা দেবে মনসারই গো
একে একে ছয়ও পুত্র গো
কালিদহের জলে বিসর্জন
মনসারই কোপানলে গো

www.pathagar.com

ছয় পুত্র ডুবল জলে গো।

চাঁদ সওদাগর : হু হু আঃ আঃ। সনকা আমি কখখনো দেবীর পদে ফুল দিয়ে পূজা করব না।

(গান)

যাও যাও দূর হয়ে
সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলো না
বলো না বলো কথা হবে না হবে না
কোথায় মনসা কানির মুন্ডু নেব টেনে
এখনি দেখাব তাকে চন্দ্র কেমন বেনে
সে কোথায় এনে দাও আমায় ॥
এনে দাও এনে দাও বলি
আমার এনে দাও না
হ্যানতালে করিব সোজা বাঁকা হলি ছাড়ব না
করিব তোর জীবন দন্ড রক্ষাতো সে পাবে না ॥

সনকা : (গান)

যাই যাইও প্রাণও নাথ দূর হয়ে যাই
যে হস্তে বলেছিলে চ্যাং মোড়া কানি
সেই হস্তে দিবে পূজা নামে চন্দ্র বেনে
ও পূজা দিলে না
পূজা পেলাম না ॥

চাঁদ সওদাগর : (গান)

ও পূজা দিব না
পূজা পাবে না।

সনকা : আমি একটা লোহার বাসর ঘর তৈরি করে বাপ লখিন্দরকে বিবাহ দেব। তুমি আমাদের পুরাতন বিশ্বকর্মকারের কাছে একটা পত্র দাও।

সনকা : আপনি যা ভালো মনে করেন। দাসীকে দিয়ে একটা পত্র পাঠিয়ে দিই। কোথায় দাসী?

দাসী : এই যে রাণীমা কি বলছেন।

সনকা : বিশ্বকর্মকারের কাছে একখানা পত্র দিতে হবে।

দাসী : ঠিক আছে রাণীমা।

(গান)

পত্র দিতে হলো আমার
বিশ্বকর্মকারের কাছে গো
এক পত্র, দুইও পত্র ও গো
তিনও পত্রের কালে গো

www.pathagar.com

পত্র পেয়ে বিশ্বকর্মকার আমার
ভাবে মনে মনে গো
পত্র দিতে হইল আমার
বিশ্বকর্মকারের কাছে গো ॥

বিশ্বকর্মকার : আরে ও গিন্নি শুনছো--একটা কাজ-- ।

গিন্নি : আবারও কাজ?

বিশ্বকর্মকার : সে কাজ নাই। চাঁদ সওদাগরের বাড়িতে কাজ। পাতলা ধারের অস্ত্রপাতি কয়ডা দাও।

(গান)
ও আমার কে ডাকল রে
বিশ্বকর্মকার বলে
ধীরে ধীরে আসছি আমি
মুথা বাইশ ঘাড়ে করে
বিশ্বকর্মকার নামটি ধরি
যা ইচ্ছা তাই করতে পারি
ঢেঁকির শলাও ভালো চাচতে পারিরে
বিশ্বকর্মকার বিশ্বকর্মকার বলে ডাকল কে
ধীরে ধীরে আসছি আমি
মুথা বাইশ ঘাড়ে করে ॥
বিশ্বকর্মকার বিশ্বকর্মকার বিষের হাড়ি
গড়তে পারিনে বাবা ভাঙতে পারিরে
বিশ্বকর্মকার বিশ্বকর্মকার বলে ডাকল কে?

বিশ্বকর্মকার : আমি যাচ্ছি চম্পাইনগরে। চাঁদ সওদাগরের বাড়ি বাসর ঘর বানাতি। তুমি কেডা গো তোমার তো চিনতি পারলাম না।

মনসা দেবী : দাদা তা নয়, বলো চিনতি পারলাম না।

বিশ্বকর্মকার : ও হ্যাঁ তোমায় চিনিছি। তুমি সেই তেতো দিদির বোন মিঠু দিদি।

মনসা দেবী : দাদা তুমি কোথায় যাবা?

বিশ্বকর্মকার : আমি যাব আনাঘাট।

মনসা দেবী : তাহলে দাদা আমার একটা গান শুনিয়ে যাও।

বিশ্বকর্মকার : তাহলি গান শুনবি শোন।

(গান)
ও সাথী গো বারে বারে আর আমায় ডেকোনা
জীবনের প্রথম দিন এসেছিলে একবার
তাই শুধু দেখাদেখি তোমার আর আমার
করে গেলে ছলনা এ কিছু বল না

www.pathagar.com

এ বড় যন্ত্রণা প্রাণেতে সহে না
বারে বারে আর আমার ডেকো না ॥
আর বসন্ত আসিলে কোকিলা ডাক দেয়
যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে বিরহ বেদনায়
আমার মনের স্মৃতি জীবনেরই সাথী
জীবনেরই সাথী আর হব না ॥
তোমরা যখন ছোট ছিলে
কোলে আর কাখায়
কত দেশ বিদেশ ঘুরলাম
তোমাদেরই আশায়
আশারও প্রদীপ দিনে দিনে নিভে যাবে
কভু জ্বলবে না
ও সাথী গো
বারে বারে আর আমায় ডেকো না ॥
দিদি তুমি তাহলে থাকো আমি ঘুরে আসি।
সওদাগর বাবা সওদাগর বাবা ধরেন অস্ত্র ধরেন।

চাঁদ সওদাগর : তোমার অস্ত্র তুমিই নামাও।

বিশ্বকর্মকার : এই নামো, নামো, নামো। সওদাগর বাবু তাহলে বলেন আমাকে কি জন্য ডেকেছেন?

চাঁদ সওদাগর : আমার একটা বাসর ঘর বানাতে হবে। সাতালি পর্বতে লোহার নির্মল বাসর ঘর প্রস্তুত করতে হবে।

বিশ্বকর্মকার : (গান)

আমি পারব না হে সওদাগর
পারব না হে সওদাগর
কেমন করে বানাব লোহার বাসর ঘর
একতলা দোতলা হলে
উঠতাম আমি ঠেলে ঠুলে
সেখান থেকে পড়ে গেলে রে
ভাঙবে রে পাঁজরের হাড়
বউ হবে তার কড়ে নাড়।
ও সাতালি পর্বতে আমি উঠব কেমনে
বাবারে তাই পড়ে মনে
ও আমার দ্বারাই তা হবে না রে
এ ঘর বানবে সুতার গঙ্গাধর
আমি কেমন করে বানব
লোহার বাসর ঘর
কেমন করে বানব

www.pathagar.com

লোহার বাসর ঘর।
সওদাগর বাবু বাসর তো বানবেন তা আপনার কি কি কাঠ আছে?

চাঁদ সওদাগর : আম, জাম, কাঁঠাল, সেগুন।

বিশ্বকর্মকার : রাখেন রাখেন সওদাগর বাবু। ও সব আমার অস্ত্রই কাটবে না।

চাঁদ সওদাগর : তাহলে কি কাঠ তোমার অস্ত্রে কাটবে।

বিশ্বকর্মকার : কলা, কঁচু, পেঁপে কাঠ।

চাঁদ সওদাগর : এসব কাঠ দিয়ে কি কি হবে?

বিশ্বকর্মকার : কলা গাছ কেটে আড়াই দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতি হবে। পানি থেকে তুলে লাথি দিলি তক্তার গাদা। কঁচু কাঠ জাললার শিক, আর পেঁপে কাঠে হবে খুটি আর একটা কাঠ লাগবে সওদাগর বাবু।

চাঁদ সওদাগর : আর কি কাঠ?

বিশ্বকর্মকার : আমি ভয়তি বলব না নির্ভয়তি বলব।

চাঁদ সওদাগর : নির্ভয়ে বলো।

বিশ্বকর্মকার : ম-ম-মনসার কাঠ।

চাঁদ সওদাগর : সাবধান বিশ্বকর্মকার। যার ভয়ে ভিতু হয়ে আমি সাতালি পর্বতে বাসর ঘর প্রস্তুত করতে চাচ্ছি আর সেই মনসার কাঠ ! না না আমার কোনো কাঠের প্রয়োজন নেই। আমি বাসর ঘর তৈরি করব লোহা দিয়ে।

বিশ্বকর্মকার : আচ্ছা সওদাগর বাবু তাই হবে।

বিশ্বকর্মকার : (গান)

বাসর ঘর বাঁধিলাম বাঁধিলাম
সাতালি পর্বতে বাসর বাঁধিলাম ॥
লোহার আটন লোহার ছাটন
লোহার পিট কাবারি ॥
এই বাসরে বাস করিবে
বেহুলা লখিন্দর
বাসর ঘর বাঁধিলাম বাঁধিলাম
সাতালি পর্বতে বাসর বাঁধিলাম ॥
বাসর বান্ধা সাঙ্গ হলো
উঁকি মেরে চাই।
দেন সওদাগর বাবু আমাদের দান দক্ষিণা দেন।

চাঁদ সওদাগর : পরে দেব।

বিশ্বকর্মকার : দেন কে দিচ্ছেন দেন।

চাঁদ সওদাগর : আমিই দেব। একটু পরে। কোথায় সনকা? একবার ধুমা পরীক্ষা করে নাও।

www.pathagar.com

সনকা : এই যে প্রাণেশ্বর। আমি তাই করছি। কোথায় গো দাসী। বাসরে একবার ধুমা পরীক্ষা করে এসো।

দাসী : (গান)

ধুপের ধুমা দেয় শনিকা রাণী
লোহার বাসর ঘরে গো
তবে একও ধুমা দুইও ধুমা
তিনও ধুমার কালে গো
ধুমস্থলে বাসর খানা হারে
হইল যে আন্ধার গো
কি করি কাম বিধি হলো বাম
এত দিনের পরে গো ॥

সনকা : প্রাণোনাথ বাসর ঘরে ধোঁয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। কোথাও কোনো ছিদ্র নেই।

চাঁদ সওদাগর : আচ্ছা তাহলে বিশ্বকর্মকার আপনার কত দিতে হবে?

বিশ্বকর্মকার : মেলা টাকা ছয় আনা।

চাঁদ সওদাগর : এই নাও। পথ দিয়ে যাবে একটু আবোল তাবোল বলতে বলতে যেয়ো।

বিশ্বকর্মকার : আবোল তাবোল আবোল তাবোল। ওরে বাপরে বাপ বাপ বাপ।

চাঁদ সওদাগর : আবার কি হলো তোমার। ভয় নেই, এবার তুমি হরিনাম করতে করতে বাড়ি চলে যাও।

বিশ্বকর্মকার : (গান)

একবার হরি বলে ভাই সকলে
ডাকরে একবার ॥
হেলা করে হারাইলে
আসা যাওয়া হবে সার
হরি বলে ভাই সকলে
ডাকরে একবার ॥
ভজ ভাই শ্রীহরি চরণ
ভব ক্ষুধা দূরে গেলে
সমন হয় বারণ
হেলা করে হারাইলে
আসা যাওয়া হবে সার
হরি বলে ভাই সকলে
ডাকরে একবার ॥

মনসা দেবী : তুমি কোথায় গিয়েছিলে বিশ্বকর্মকার?

বিশ্বকর্মকার : এই ছুঁড়ি আমি তোর পরিচয় দেব না।

www.pathagar.com

মনসা দেবী : পরিচয় দেবে না আমি তোমার ঝাঁড়ে বংশ নির্বংশ করে ফেলব। আমার নাম মনসা দেবী।

বিশ্বকর্মকার : ওমা আমি গিয়েছিলাম চম্পাইনগরে চাঁদ সওদাগরের বাসর ঘর বানাতি।

মনসা দেবী : আমার নাগ যাওয়ার ছিদ্র রেখেছে?

বিশ্বকর্মকার : না তো মা আমি ছিদ্র তো রাখিনি।

মনসা দেবী : তাহলে আবার যাও আমার নাগ ঢোকার ছিদ্র করে এসো।

বিশ্বকর্মকার : মা আমি আবার কি করে যাব? এই কেবলমাত্র চাল ডাল দেনা পাওনা নিয়ে বিদায় হয়ে আসলাম।

মনসা দেবী : তোমাকে যেতেই হবে। বাইশ আনার ছল করে যাও।

বিশ্বকর্মকার : তাই যাচ্ছি মা। (বাসর ঘরে গিয়ে শব্দ করে ঠক ঠক ঠকাশ)।

চাঁদ সওদাগর : কে? কে আমার বাসর ঘরে এত রাতে?

বিশ্বকর্মা : আমিই সওদাগর বাবু।

চাঁদ সওদাগর : এই কেবলই তোমার দান দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করলাম। আবার তুমি কেন এসেছো?

বিশ্বকর্মা : আমি বাইশ ফেলে গিয়েছিলাম।

চাঁদ সওদাগর : তাহলে তুমি শব্দ করলে কেন?

বিশ্বকর্মা : একটা পেরেক বেরিয়ে ছিল তাই বাইশ দিয়ে বসিয়ে দিলাম।

সনকা : ওগো কে কথা বলছে? আমাদের বিশ্বকর্মকার না? এত রাতে আবার কি হলো?

চাঁদ সওদাগর : হ্যাঁ, আমাদের বিশ্বকর্মকার বাইশ ফেলে গিয়েছিল তাই নিতে এসেছে।

সনকা : (গান)

আরে ও বিশ্বকর্মকার
ও তুমি কেবলি না গেলে
আবার আইলে যে
ও তোমার চালও দিলাম ডালও দিলাম
ঐনা দিলাম বিদায় করে রে
আরে ও বিশ্বকর্মকার
ও যাবার পথে মনসার সাথে গো
ঐনা হয়েছে বুঝি দেখা গো
ও বিশ্বকর্মকার
ও আমার একে একে ছয়পুত্র গো
ও দিলাম কালির জলে বিসর্জন রে
ও আমার মা বুলা ধন
হারিয়ে যাবে গো ওরে

www.pathagar.com

ও আমার কে ডাকবে মা বলে গো
বিশ্বকর্মা
ও তুমি আমার ধর্মের ভাই রে
ঐনা ধর্মের কাজও কর রে
ভাইয়ে জানে বোনের মায়া গো
আর কেহ না জানে রে
ও আমার নাইকো মাতা
নাইকো পিতা গো ওরে
নাইকো সহোদর ভাইও রে
ও বিশ্বকর্মা রে।

বিশ্বকর্মা : না না রাণীমা আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।

মনসা দেবী : বিশ্বকর্মা কি সংবাদ বলো? আমার নাগ যাওয়ার পথ কি করেছ?

বিশ্বকর্মা : হ্যাঁ, মা উত্তর দিকে ঈশেন কোণে পানের বোটা চুনের ফোঁটা রেখে এসেছি। তোমার নাগগণ যদি ছাড়ে হায় পানের বোটা চুনের ফোঁটা পুড়ে হবে ছাই।

চাঁদ সওদাগর : সনকা বাসর বান্ধা তো হয়ে গেল। এখন বাপ লখিন্দরকে বিয়ে দিতে হবে। আমাদের পুরাতন ঘটকের কাছে একটা পত্র পাঠাও।

সনকা : তাই করছি প্রাণনাথ।

(গান)

পত্র দিতে হইল আমার
ঘটকেরও কাছে গো
পত্র পেয়ে দ্বিজবর ঘটক
আসছে ধীরে ধীরে গো
পত্র দিতে হইল আমার
ঘটকেরও কাছে গো ॥

ঘটক : (গান)

দক্ষিণ দেশে ঘর
নামটি দ্বিজবর
ঘটক সেজে এলাম
এহি সমাচার।
কে গো আমায় ডেকেছেন।

চাঁদ সওদাগর : আমিই তোমাকে ডেকেছি। আমার শেষ পুত্র বাপ লখিন্দরের বিয়ে দেব তাই তোমাকে ডেকেছি।

ঘটক : (গান)

ঘটকালি আর করব না রে ভাই
আমার পেটের জ্বালায় যায়

www.pathagar.com

ঘটকালি আর করব না রে ভাই
ভাতে দেয় ছেঁড়া পাতা
খেতে দেয় কচু ঘুটা
খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হলি
চুলকে উঠে গলা
আমি ঘটকালি আর করব না রে ভাই।

চাঁদ সওদাগর : ঘটক তোমাকে অনেক বকশিশ দেব। এই নাও আমার ছেলে লখিন্দরের ফটো। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পেলে আমাকে খবর দেবে।

(গান)
চলল ঘটক ফটো লয়ে
কন্যার অন্বেষণে গো
চলল ঘটক ফটো লয়ে
নিশানী নগরে গো
তবে নিশানী নগরে যেয়ে
না পাইল কন্যা গো
চলল ঘটক ফটো লয়ে
কন্যার অন্বেষণে গো।

ঘটক : সওদাগর বাবু বাড়িতে আছেন?

সাইমান সওদাগর : আরে ঘটক সাহেব আসেন আসেন কি সংবাদ?

ঘটক : আমি এসেছি চম্পাইনগরের চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের সাথে আপনার কন্যা বেহুলার বিবাহের জন্য।

আমেলা সুন্দরী : (গান)

ও ঘটক ঐ কথা আর বলো না
ঘটক ঐ কথা আর বলো না
সাপ খেকো ঘরে কন্যা বিয়ে দেব না।
দিয়েছিলাম বিয়ে
ওরে কি বলিব কোথায় যাবে ঘটক
কি বলিব তোমারে
সাপে খেকো ঘরে কন্যা বিয়ে দেব না।
আহারে নিদারুণ বিধি মাগো
এই ছিলো কপালে
ও ঘটক ঐ কথা আর বলো না
সাপে খেকো ঘরে কন্যা বিয়ে দেব না।

ঘটক : তাহলে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। না দিলে আমি আমি---

www.pathagar.com

চাঁদ সওদাগর : তিন চার দিন গত হতে চলল এখনও ঘটক ফিরে এলো না। কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটল?

ঘটক : এই যে সওদাগর বাবু, আমি চলে আইছি।

চাঁদ সওদাগর : কাজ কি মঙ্গল?

ঘটক : মঙ্গল তো দূরের কথা। ঠেকে গেল বুঝি। দেশ দেশ দেশান্তর ঘুরে এলাম কন্যার অন্বেষণ হলো না।

চাঁদ সওদাগর : কোথায় সনকা? একবার এদিকে এসো শোন। ঘটকের দিয়ে কাজ হলো না। নিজের কাজে নিজেই যেতে হবে।

সনকা : প্রাণনাথ আপনি যাবেন? যাওয়ার সময় আমি ছয়টি লোহার কলাই দেবো। যে মেয়ে এই কলাই রাধন করেদিতে পারবে তার সাথেই আমার ছেলের বিয়ে দেব।

চাঁদ সওদাগর : (গান)

ও শোন ঘটক দ্বিজবর
ওরে শোন ঘটক দ্বিজবর
তোমার দ্বারাই হলো না কাজ
নিজেই যাই একবার ॥
বেহাই সাহেব বাড়ি আছেন?

সাইমান সওদাগর : আরে বেহাই সাহেব যে আসেন, আসেন। হুকো নেন পেড়ে বসুন, পিঁড়ে নেন, কানে গুজুন, বুনদা নেন মাথায় ঘষুণ।

চাঁদ সওদাগর : আসতে না আসতেই চালাকি শুরু করলেন? যাইহোক, আপনার মেয়ে বেহুলার সাথে আমার ছেলে লখিন্দরের বিয়ে দিতে চাই।

সাইমান সওদাগর : বেহাই সাহেব আপনি যা বলেছেন আর বলবেন না। আমার মেয়ে আপনার ছেলের সঙ্গে আর বিয়ে দেব না।

চাঁদ সওদাগর : তাহলে বিয়ে দেবেন না?

সাইমান সওদাগর : শোনেন বেহাই সাহেব মেয়ে বিয়ে আমি দিতে পারি আপনি যদি আমার শর্তে রাজি থাকেন।

চাঁদ সওদাগর : কি শর্ত?

সাইমান সওদাগর : নিশানীনগর থেকে চম্পাইনগর পর্যন্ত পাকা রাস্তা, মেয়ে ওজনে স্বর্ণ দিতে হবে আর সাজো ধানের ফুল।

চাঁদ সওদাগর : (গান)

বেহাইয়ের কথা শুনে লাগল ভুল-২বার
কোথায় গেলে পাব আমি
ও সাজো ধানের ফুল।

www.pathagar.com

ও বেহাই আমার ১৬ মনে ঘিও জুটবে না রাধাও নাচবে না। আমি এত কিছু দিতে পারব না। আপনার মেয়ে যদি নাও দেন। (চাঁদ সওদাগর বাড়ি চলে যাচ্ছে সামনে বেহুলা)।

বেহুলা : তাঐ সাহেব আপনি আসলেন হাসি বদনে যাচ্ছেন মলিন বদনে?

চাঁদ সওদাগর : হ্যাঁ মা আমি এসেছিলাম আমার ছেলে লখিন্দরের সাথে তোমার বিবাহ দেবার জন্য। তোমার বাবা তোমারওজনে সোনা চাচ্ছে এত সোনা আমি কোথায় পাব?

বেহুলা : তাঐ সাহেব আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার ছেলের হাতে যে আংটি আছে তাতেই হয়ে যাবে। আপনি রাজা হয়ে পড়েন।

চাঁদ সওদাগর : তুমি যদি থাকো সহায়, তাহলে আমার কিসের ভয়? আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। (বাড়ির ভেতরে চাঁদ সওদাগরের প্রবেশ)

চাঁদ সওদাগর : বেহাই আপনার কথায় আমি রাজি।

সাইমান সওদাগর : বেহাই বসেন বসেন। জলপান করেন।

চাঁদ সওদাগর : বেহাই আমার কাছে যে কলাই আছে তা যদি কেউ রান্না করে দিতে পারে তার বাড়িই আমি জলপান করবো।

আমেলা সুন্দরী : দেন বেহাই কলাই দেন আমি রান্না করে দিই। বেহাই এ যে দেখছি লোহার কলাই।

(গান)

শুনিনি যে কোনো ঠাঁই- ২বার
শাস্ত্রেতে নাইরে লোহার কলাই রন্ধন হয়।

বেহুলা : মা আমার কাছে দাও আমি কলাই রন্ধন করব।

(গান)

সরে বসো মা তুমি
ও আমার জননী
আড়াই নুড়োর জ্বালে কলাই
রন্ধন করব এখনি।
আলেক নুড়ো হাতে করে বেহুলা
চাষা বাড়ি যাই গো
চাষা বাড়ি যেয়ে বেহুলা
আগুন না পাইল গো
আলেক নুড়ো হাতে করে বেহুলা
কামার বাড়ি যায় গো
কামার বাড়ি যেয়ে বেহুলা
আগুন যে পাইল গো।

www.pathagar.com

সাইমান সওদাগর : বেহাই জলপান করে নেন। বাড়ি গিয়ে বেহাইনকে বলবেন সামনে শুক্লপক্ষেই শুভদিনে বিবাহের দিন ধার্য করলাম।

চাঁদ সওদাগর : ঠিক আছে বেহাই তাহলে আমি আসি।

(চাঁদ সওদাগর নিজ বাড়িতে প্রবেশ)

চাঁদ সওদাগর : কোথায় সনকা, বাপ লখিন্দরের বিবাহের দিন ধার্য করে আসলাম।

সনকা : প্রাণোনাথ বাপ লখিন্দরের বিয়ে কোথায় ঠিক করলেন?

চাঁদ সওদাগর : নিছানিনগরে সাইমানী সওদাগরের কন্যা বেহুলা সুন্দরী।

সনকা : প্রাণোনাথ লখিন্দরের বিয়ের আগে নাপিত দিয়ে চুল ক্ষৌরি করতে হবে।

চাঁদ সওদাগর : তাই হবে নাপিতের কাছে পত্র পাঠাও।

সনকা : (গান)

পত্র দিতে হলো আমার
নাপিতেরও কাছে গো।

নাপিত : (গান)

ও তোরা বলে দেনা রাখালগণ
চম্পাইনগরে যাব লাগবে কতক্ষণ ॥
আমাকে কে ডেকেছেন গো?

চাঁদ সওদাগর : আমিই ডেকেছি। আমার ছেলে লখিন্দরের চুল ক্ষৌরি করতে হবে।

নাপিত : না আপনার ছয় ছেলের চুল ক্ষৌরি করে আপনি টাকা দেননি।

চাঁদ সওদাগর : ঠিক আছে। এবার সব টাকা দিয়ে দেব।

নাপিত : আচ্ছা ঠিক আছে।

সনকা : (গান)

ও তুমি ভালো করে ক্ষৌরি কর
ও কি নাপিত হে।
ও তোমার নুরুন যেন হেলে না
ও কি নাপিত হে।
ও তোমার মাছের কাল্লা দিয়ে ভাত দেব
ও কি নাপিত হে।
ও তোমার মুরগীর মাংশ দিয়ে ভাত দেব
ও কি নাপিত হে।

(লখিন্দর বিয়ে করতে গেল)

www.pathagar.com

চাঁদ সওদাগর : বেহাই আগে বিয়ে দেবেন না পাওনা বুঝে নেবেন?

সাইমান সওদাগর : না, আগে সোনা ওজন হবে।

চাঁদ সওদাগর : তাহলে দাড়িপাল্লা নিয়ে আসেন।

(বিয়ে করে লখিন্দর বাড়ি চলে আসলো)

সনকা : কোথায় বাবা লখিন্দর।

লখিন্দর : এই যে জননী তোমার চরণে আমি প্রণাম করি। কি জন্য ডেকেছো মা আমাকে?

সনকা : তোমাকে বাসর শয্যায় যেতে হবে।

লখিন্দর : (গান)

ঐযে বাসর দেখে প্রাণ আমার কান্দে মা
কি বলব বাসরের কথা মা
ঐ বাসর দেখে লাগে ব্যথা মা।
এ প্রাণ ও প্রাণ আছে গাঁথা মা
ঐ বাসরে গেলে মাগো
পুত্রধন আর পাবে না
ঐ বাসর দেখে প্রাণ আমার কান্দে মা।

সনকা : বাবা লখিন্দর তুমি একা যাবে কেন? তোমার সাথে মা বেহুলাও যাবে। কোথায় মা বেহুলা?

বেহুলা : আমাকে ডেকেছেন মা? আপনার চরণে শত শত প্রণাম।

সনকা : চির সুখী হও মা।

(গান)
ও যাওগো মা বেহুলা যাও
লোহার বাসর ঘরে যাও গো যাও
লোহারও বাসরে যাবা মা
থাকবা হুশিয়ার
মনসার সাথে বিবাদ মা
থাকবা হুশিয়ার
একা পুত্র বাপ লখিন্দর মা
সপিলাম তোমারে।

বেহুলা : (গান)

কি দোষেতে যাব মাগো আমি
লোহার বাসর ঘরে গো
কোনো দোষের দুষি নাই মা
দুষি করো মোরে গো ॥

www.pathagar.com

আহারে নিদারুণ বিধি
এই ছিল কপালে গো।

লখিন্দর : চলো বেহুলা আমরা বাসর শয্যায় গমন করি।

বেহুলা : (গান)
ও হাত ধরে লয়ে চলো সখা
আমি তো পথ চিনিনে
আজ হতে প্রাণপতি
তোমার পূজা করি অতি
শীঘ্রগতি ও হাত ধরে লয়ে চলো
সখা আমি তো পথ চিনিনে।

লখিন্দর : (গান)
আস্তে তোল পা বেহুলা
ধীরে ফেল পাও গো।

বেহুলা : (গান)
আস্তে তুলি পা প্রাণোনাথ
ধীরে ফেলি পা ওগো

লখিন্দর : (গান)
চুলের সাঁকো হীরের ধারে
কাটেনা যেন তোমার পাও গো।

বেহুলা : (গান)
আমার সাঁকো হীরের ধারে
কাটবে না আমার পাও গো।

লখিন্দর (গান)
আমার সাথে যাবে বেহুলা রাণী
ঐনা বাসর ঘরে গো।

বেহুলা (গান)
মনে বড় আশা ছিল নাথো
যাবো আপনার সাথে গো।

লখিন্দর : (গান)
তোমার আশা মিটাবো বেহুলা
ঐনা বাসর ঘরে গো।

বেহুলা : (গান)
মাতা-পিতা ত্যাজ্য করে নাথো
যাব আপনার সাথে গো॥

www.pathagar.com

আস্তে তোল পা বেহুলা
ধীরে তোল পাও গো ৷৷

লখিন্দর : বেহুলা তোমার মাথায় ওটা কি?

বেহুলা : আমার মাথায় মনসার দেয়া ঘটপট।

লখিন্দর : বেহুলা যে মনসার ভয়ে ভীত হয়ে আমরা যাচ্ছি সাতালি পর্বতে বাসর ঘরে আর সেই মনসার দেয়া ঘটপট তোমার মাথায়? ফেলে দাও বলছি।

বেহুলা : প্রাণোনাথ এই ঘটপটের মধ্যেই আপনার জান।

লখিন্দর : ঘটপটের ভেতরে কখনোই মানুষের জান থাকতে পারেনা। আমিই ফেলে দিলাম।

বেহুলা (গান)
হায় নাথ ওকি করিলে
মনসার ঘটপট কেন ভাঙিলে
মনসার ঘটপটের মধ্যে
আপনার জীবন ৷৷

লখিন্দর : এই দেখ বেহুলা আমাদের বাসর ঘর।

বেহুলা : কি সুন্দর এই বাসর ঘর। কে বেঁধেছে এই ঘর?

লখিন্দর : বেহুলা এই বাসর ঘরে আজ সারারাত জেগে থাকতে হবে।

বেহুলা : কিভাবে সারারাত জেগে থাকব?

লখিন্দর : তোমার গলার হার দিয়ে পাশা বানিয়ে আমরা পাশা খেলব।

বেহুলা : প্রাণোনাথ আমরা যে পাশা খেলব হারজিতের সাক্ষী থাকবে কে?

লখিন্দর : স্বর্গে আছে ধর্মরাজ তাঁকে স্মরণ কর।

বেহুলা : (গান)
ধর্ম ধর্ম বলে বেহুলা
ডাকিতে লাগিল গো
স্বর্গে ছিল ও ধর্মরাজ
কর্ণেতে শুনিল গো।

ধর্মরাজ : কে আমাকে ডেকেছো গো?

বেহুলা : আমি আপনাকে ডেকেছি। আমরা স্বামী-স্ত্রী পাশা খেলব। কে হারে কে জেতে তার সাক্ষী হবে আপনার।

ধর্মরাজ : ঠিক আছে।

বেহুলা : (গান)
আমার খেলতে হলো পাশারে

www.pathagar.com

পাশা নাই মোর ভাগ্যের দশা
নারী হয়ে পুরুষের সাথে গো
খেলতে হলো পাশারে
পাশা নাই মোর ভাগ্যের দশা ॥
আমার যদি হও তুমি পাশারে
অঞ্চলে বান্ধিবো
ও মনসার যদি হও তুমি পাশারে
দরিয়ায় ভাসাবো
আমার যদি হও তুমি পাশারে
দুগ্ধে ধুয়ে নেব
মনসার যদি হও তুমি পাশারে
অগ্নিতে পোড়াব।

লখিন্দর : অরুণ কুলোয় চাল আর বরুণ কুলোয় ডাল তুমি রান্ধন কর আমি একটু নিদ্রা যায়।

বেহুলা (গান)
তুমি উঠো মম প্রাণোনাথ
গা তোল ভোজন কর
রান্ধন হলো ভাত
ভাত হইল কড়কড়
রাত হইল ভার উঠো হে ।

মনসা : সর্প সর্প বলে মনসা
ডাকিতে লাগিল গো
কোথায় রইলে ধোড়া বঙ্ক ওগো
এসে কর দেখা গো।

ঢোঁড়া বঙ্ক : জননী জননী তোমার পদে আমার শত শত প্রণাম করি। বল আমাকে কি জন্য ডেকেছো?

মনসা : বাবা, চম্পাইনগরের চাঁদ সওদাগর বলেছিল দেবী মনসা তোমার পদে ফুল দিয়ে পুজো করে তবেই পুত্র আর পুত্রবধু বাসর শয্যায় গমন করাব। জলের ঘাটে বেহুলা সতী অঙ্গীকার করেছিল দেবী মনসা তোমার পদে ফুল দিয়ে পতি লয়ে বাসর শয্যা গমন করব। কিন্তু সেই সতী পতি পেয়ে আমার কথা ভুলে গেল? তাই তোমার এখন চম্পাইনগরে যেতে হবে লখিন্দরকে দংশন করতে।

www.pathagar.com

ঢোঁড়া বঙ্ক : জননী তুমি চাঁদ সওদাগরের একে একে ছয়পুত্র খেয়েছো। শেষ পুত্র লখিন্দরকে নিয়ে গৃহে আছে ভুলে। তোমার কি একটুও মায়া মমতা নেই। আমি যেতে পারব না।

মনসা : বাবা তোমার যেতেই হবে। তা না হলে আমার পূজার কোনো সৎ উপায় হবে না।

ঢোঁড়া বঙ্ক : জননী যেতেই হবে? আমার নেই কোনো নাগ নেই কোনো ফণা। আমার কামড় খেয়ে কখনোই মরবে না।

মনসা : বাবা ধোড়া বঙ্ক আমি তোমায় যে যোগে কামড়াতে বলব সেই যোগে কামড়াতে হবে।

(গান)

শোন বঙ্করাজ যোগের কথা শোন
ওরে সন্ধ্যা রাতে কামড়ালে
মরণ নাহি হয়।
ভারি রাতে কামড়ালে
নাহি মরণ হয়।
প্রভাত কালে কামড়ালে
অমনি ঢলে মরে
শোন বঙ্করাজ যোগের
কথা শোন।

ঢোঁড়া বঙ্ক (গান)

ও বড় যোগ হয়েছে আজ রাতে
আয়কে যাবি লখাইকে খেতে
চান্দের বেটা দুর্লভ লখাই গো
আছে বাসর ঘরে
আয়কে যাবি লখাইকে খেতে।

ঢোঁড়া বঙ্ক (গান)

সাক্ষী থেকো ধর্মরাজ ওরে
লোহার বাসরে চলল ও সর্প বঙ্করাজ।

বেহুলা : তোমরা কারা গো?

ঢোঁড়া বঙ্ক : তোমাদের জম।

বেহুলা : (গান)

তোমারও না দেখে গো মামা
ও মামা কান্দে আমার হিয়া

www.pathagar.com

কাঞ্চনও বাটিতে দুগ্ধ
এসে করো পানও রে।

ঢোঁড়া বঙ্ক : তাহলে খাবো। ও দাদা মেছো সাড়ে তিনহাত পেছো।

ঢোঁড়া বঙ্ক : ও দাদা দাগ কেনে?

সর্প বঙ্করাজ : বেনের মেয়ে জানে কত ছন্দি মানিক দুয়াড়ি পেতে আমাকে করেছে বন্দি।

ঢোঁড়া বঙ্ক : মা তোমার বঙ্করাজ হয়েছে বন্দী।

মনসা : (গান)
ও চান্দের লখাই ক্যানে মলো না
আমার বঙ্করাজ ক্যানে ফিরে এলো না।
বাবা ধোড়া তুই কালী দিদিকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।
(গান)
ও মেছো যাও চাতরে
আনিতে কালীরে
মেছো যা মেছো যারে
ও তোর কালী দিদির তৃরে
সাত সমুদ্দুর পারে যেয়ে
থেকো দন্ডি ধরে
উচ্চস্বরে ডাকরে মেছো
তোর কালী দিদি বলে।

ঢোঁড়া বঙ্ক (গান)
ও মা পড়েছে বিষম ফেরে
ওগো কোথায় কালী দিদি গো।

কালী : (গান)
ও দাদা বলগা যেয়ে মার কাছে -২বার
তোমার সেই কালো মেয়ে মারা গিয়েছে।

ঢোঁড়া বঙ্ক : ও দিদি মা বিশ্বাস করল না। দিদি তোমার যেতেই হবে।

কালী : জননী জননী তোমার চরণে প্রণাম করি।

মনসা : মা তুমি চির সুখী হও।

কালী : মা তুমি আমাকে কেন ডেকেছো?

মনসা : চম্পাইনগরে চাঁদ সওদাগর আমার পুজা দিয়ে পুত্র-পুত্রবধু বাসর শয্যায় পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা রাখেনি। আমার পুজার সদ্বউপায় করার জন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি।

www.pathagar.com

কালী : আমাকে কি করতে হবে মা?

মনসা : চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরকে দংশন করতে হবে।

কালী : মা আমি সন্তানের মা হয়ে কি করে সন্তানের গায়ে দংশন করব মা? আমি পারব না।

মনসা : তোমাকে পারতেই হবে। তুমি বনের পশু। তোমার এত দরদ কেন?

(গান)

ওরে বনের পশু
তুমি কি এত দরদ জানো রে
আগে যদি জানতাম আমি
তুমি এমন মেয়ে
আতুর ঘরে মারতাম আমি
গলায় লবণ দিয়া রে
ওরে ও বনের পশু
তুমি কি এত দরদ জানো রে।

কালী : ঠিক আছে মা। আমি যাচ্ছি।

(গান)

ও তুমি সাক্ষী থেকো যামিনী
সাক্ষী থেকো যামিনী
লোহার বাসরে চলল
কাল সাপিনী
লোহার বাসরে চলল
কাল রাগিনী।

কালী : (গান)

ও বেহুলা কাল উঠিল তোমার বাসরে
বেহুলা জম উঠিল তোমার বাসরে
উঠো উঠো বেহুলা সতী গো
কত নিদ্রা যাও।
সোনার খাটে শুয়ে লখাই গো
রূপার খাটে পা রে
বেহুলা কাল উঠিল তোমার বাসরে
বেহুলা জম উঠিল তোমার বাসরে।

কালী : মা আমি এতটুকু ফাঁকে ঢুকতে পারলাম না।

মনসা : তুমি এসো ধোপার পাটে কেঁচে তোমাকে সরু বানিয়ে দিই।

কালী : আমি কি অপরাধে কামড়াবো মা।

www.pathagar.com

মনসা : (গান)
গায়ের ময়লা তুলে মনসা
মশা তৈরি করে গো
এক মশা দুইও মশা গো
ভুন ভুনিয়ে শব্দে
মশা চলিতে লাগিল গো।

কালী (গান)
যেমন কন্যা তেমন বর ওরে
রূপেতে কইরাছে আলো গো
লোহার বাসর ঘর।

কালী : (গান)
ও কালীর নয়ন জলে
বুকও ভেসে যায়
কেমনে হানিবো কামড়
দুর্লভ লখাইর গায়।
মাথায় যদি হানি কামড় গো
ঝুনিয়া নারকেল
আর চোখে যদি হানি কামড় গো
আসমানেরই তারা
আর নাকে যদি হানি কামড় গো
কালার হাতের বাঁশি
আর মুখে যদি হানি কামড় গো
চন্দ্র মুখের হাসি।
গলায় যদি হানি কামড় গো
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
পেটে যদি হানি কামড় গো
সারিন্দেরও খোল
বাছার পিঠে যদি হানি কামড় গো
রাধার হাতের বেলুন
ও বাছার পায়ে যদি হানি কামড়
হেটে যাওয়া ঘোড়া।

মনসা : ওহ বেহুলা! আমার পায়ে কি হলো জ্বলে যাচ্ছে।
রাত্র যোগে বাসর ঘরে
অঙ্গ আমার বিষে জ্বলে
মইলাম মইলাম--------।

www.pathagar.com

২. গাজির পালা বা গাজির গান

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নানা গ্রামে গাজির গানের জনপ্রিয়তা এবং এর ব্যাপক প্রচলনের খবর জানা যায়। গাজি কালু-চম্পাবতীর পালা, দিদার শাহের পালা, এরেং বাদশার পালা, জামাল বাদশার পালা, তাইজেল বাদশার পালা, হামিয়ান বাদশার পালা, রেপোটো বাদশার পালা, শনি আর লক্ষ্মীর পালা, বাহরাম বাদশার পালাসহ আরও কিছু পালা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে প্রচলিত অছে।

সাম্প্রতিককালে যাঁরা গাজির গানে 'আশা' ও 'চামর'ধারী সক্রিয় গায়কের ভূমিকায় রয়েছেন তাঁদের পরিচয় দেওয়া হল। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের হবিবর গায়েন [জন্ম: ১৯৬৭], সাহেবনগর গ্রামের আবুল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৬], বুড়োপাড়া গ্রামের ওমর আলি গায়েন [জন্ম: ১৯৬৪], নবীননগর গ্রামের নিজাম গায়েন [জন্ম: ১৯৩৪], বড় শলুয়া গ্রামের মহিদুল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৯], ফুলবাড়ি (ছয়ঘরিয়া) গ্রামের কর্নেল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৭]। আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বিল্লাল [জন্ম: ১৯৬০]। দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের আলাউদ্দিন গায়েন [জন্ম: ১৯৫৪], ধানঘড়া গ্রামের ওমর আলী গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪] ও ডাবলু মুহুরী [জন্ম: ১৯৬৬], জুড়ানপুর গ্রামের আজিবর গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪]। জীবননগর উপজেলার কাশিপুর (আব্দুলবাড়িয়া) গ্রামের সিরাজ গায়েন [জন্ম: ১৯৪৯] ও খলিল গায়েন [জন্ম: ১৯৬৪], বেণীপুর গ্রামের তোফাজ্জেল গায়েন [জন্ম: ১৯৪৯], ফরিদ গায়েন জন্ম: ১৯৬৪], ও কুদ্দুস গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪], বাঁকা গ্রামের সুধীর গায়েন [জন্ম: ১৯৩৪], অজিত গায়েন [জন্ম: ১৯৩৯], খলিল গায়েন [জন্ম: ১৯৪৪]। চুয়াডঙ্গা জেলায় শুধু গাজির গান এবং জারি গান এখনও যথাযথ মর্যদায় সমাসীন আছে।

গাজী কালাচাঁদ পীরের গান [বন্দনা অংশ]

কোথা মা এসো মাগো এই আসরে- ২ বার
আমরা ভরসা করি মা তোমার চরণ ধরি
তাই আমরা ডাকি মাগো এই আসরে- ২ বার
আমরা অবোলা বালা নাহি জানি মাগো প্রেম খেলা
তাই আমরা ডাকি মাগো কর জোড়ে এই আসরে- ২ বার।
আমরা রমণীগণে ডাকি মা তোমারে বারেবারে
উচ্চস্বরে ডাকি মাগো তরাও আমারে
কোথা মা এসো মাগো এই আসরে- ২ বার।
ও রেখো মা রেখো চরণে কুলের কলঙ্কিনী জয় বিষহরি।

প্রথমে বন্দনা করলাম আল্লাজীর চরণে
ওগো আল্লাহ করবেন দয়া আমার এই আসরে- ২ বার।
চার কোণায় চার দেবতা বন্দী- বন্দী সরস্বতী
কোথায় রইলে মা জননী আমার কণ্ঠে কর ভর।
ওগো কোথায় রইলে মা মনসা ধরি তোমার পায়- ২ বার।
আহারে আহারে ওরে রেখো চরণে বিষহরি।

www.pathagar.com

২

শ্বেত বরণী বীণাপানি এসো ঘরে মা আমার
গত নিশি জেগে আছি মা তোমার চরণ তলে
দিবানিশি জেগে আছি তোমার চরণ পাব বলে
ও ভক্তিভাবে ডাকি মাগো কৃপা কর আজ আমার
এসো গো মা সরহাসিনী এসো গো মা বিন্দু ঝরা
এসো গো মা রূপ রসনা মোরা কি বল হয় হারা ॥

তাই গাজীকালু ফকির হয়ে

মা : ও ফকির হয়ো না
সোনার খিলকা সাজবে না
তোমরা দুই ভাই হলে ফকির
আমি প্রাণে বাঁচব না ॥

কার বা দরজায় যাবা ও বাপ
কেবা দয়া করে- ২ বার।
পরের মায়ের মা বলিবা ও বাপ
আমার প্রাণে সবে না
সোনার গলে খিলকা তোমার সাজবে না ॥
আগে যদি জানতাম রে বাপ
তোরা যাবি ছেড়ে
আঁতুর ঘরে মেরে ফেলতাম
গলায় লবণ দিয়ে
তোমার বাবার সিংহাসন
পড়ে রবে খালি
ও ফকির হয়ো না
তোমার গলায় খিলকা সাজবে না ॥
যেমন বাম ভাগে রেখে ঝোলা
গলায় পরছে তুমি মালা
হলিমলি ও ভাই দুলছে দুনয়নে
ছের বেছের বলে জিন্দাপীর আমার
তুলে নিচ্ছে ছেরে
মানিক মুক্তা অভিযুক্ত করেছে গাঁথুনী
পীরের পশমে পশমে দিচ্ছে আল্লাহর ধ্বনি---

www.pathagar.com

গাজী কালাচাঁদ : মা তোর দয়ার গাজী ফকির হয়ে চলল মা
ওমা চিনে চিনলি না
হায় বেটা হায় বেটা বলে কাঁদবি
ওমা কেন্দে পাগল হবি ॥
হায় হায় করে কাঁদবি তখন
ও মা'জান গো
ওমা কেন্দে পাগল হবি
হায় বেটা হায় বেটা বলে
কেন্দে পাগল হবি।
রাম শোকে দশরথ কেন্দে পাগল
ওমা এরকম পাগল হবি
দাসীরে এয়েছে ফকির
ছেড়েছে জিকির
হৃদয় যাচ্ছে ফেটে
বল দেখি মা ফকিরের জিকির কেনো
লাগে এত মিঠে ॥

না জানি কোনো বাদশার ছেলে
নবীন বয়সে হয়েছে ফকির
তাইতি জিকির এত মিঠে
দাসীরে এক মুষ্ঠি আতপ চাল
পাঁচটি মানিক আর জোড়া ধুতিবস্ত্র
নিয়ে যেয়ে সেই ফকিরকে বিদায় করে এসো
যাবে কিন্তু হাসতে খেলতে–
কোথায় গো ফকির বাবাজী
আমাকে দোয়া কর।

তথ্যদাতা : আবদুল মজিদ [জন্ম : ১৯৭১] গ্রাম: চিৎলা বাগানপাড়া, উপজেলা: দামুড়হুদা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৩০.০৮.২০১৪

বিল্লাল [জন্ম : ১৯৬০]। গ্রাম: পাইকপাড়া, উপজেলা: আলমডাঙ্গা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২৪.০৭.২০১৪

মানোয়ার গায়েন, গ্রাম: গড়গড়ি-গোবিন্দপুর, উপজেলা: আলমডাঙ্গা, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২৪.০৫.২০১৪

৩. নসিমন পালা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৭ সালে সরকারিভাবে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণা দেওয়ার পরে বাংলাদেশে মৌলবাদী ইসলামের অনুসারিরা সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়। তখন থেকে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে স্বল্প শিক্ষিত অজ্ঞ এক শ্রেণির ধর্মের লেবাসধারী ওয়াজ-নসিয়তকারিরা সুপরিকল্পিতভাবে

www.pathagar.com

দাপটের সাথে বাংলা, বাঙালি ও বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শহর-নগরের বাইরে গ্রামজনপদে জনমনে বিরূপ ধারনা প্রচার করতে থাকে। সেই সাথে স্ব স্ব এলাকার লোকশিল্পীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইমান-আকিদার বাইরে শেরেক-বেদাত-নাফরমানি এ সব কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়। মূলত সেই সময়ের পর থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকজ-সংস্কৃতির বিপুল এবং বিশাল ধারা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। 'গাজির গান' ধর্মীয় অনুসঙ্গের কারণে এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চর্চা, অপেক্ষাকৃত ভাল পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া এবং বাউল সম্প্রদায় দলে ভারী হওয়ায় বাউল গান এই ক্ষেত্রে টিকে আছে।

এই পরিস্থিতিতে শিল্পী-মনের তাগিদ এবং সংগীত-পিপাসু শ্রোতাদের কথা ভেবে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে 'সোনাভানের পুথি' ও 'রূপভান যাত্রা'র রূপকল্পকে অনুসরণ করে বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ অঞ্চলে 'নসিমন যাত্রা' বা 'নসিমন পালা' রচনার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলসহ এই গান পাবনা, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু থেকে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে সব রকম লোকজ-সংস্কৃতির চর্চা এক রকম থমকে গেছে বলা যায়। নসিমন পালার বন্দনা অংশটি এখানে দেওয়া হল।

বন্দনা

বন্দে গাইব মোরা রূপ সনাতন,
পহেলা বন্দনা করি আল্লাহ নিরঞ্জন ॥
আমরা প্রথমে বন্দনা করি গো
আল্লাজীর চরণে
আপনি আল্লাহ করবেন দয়া
আমার এই আসরে ॥
মক্কা মসজিদ ঘরে
সেই ঘরেতে নামাজ পড়ে
মোমিন মুসলমান ॥
উত্তরে বন্দনা করি
হিমালয় পর্বতে
সেই পর্বতের হাওয়া এসে
এই দেশে হয় পানি ॥
পূবেতে বন্দনা করি
পূবে উদয় ভানু
একদিকে হয় উদয় ভানু
চৌদিকে হয় আলো ॥
দক্ষিণে বন্দনা করি
ক্ষীরদা সাগরে
সেই সাগরে চালায় তরী

www.pathagar.com

সাধু সওদাগরে ॥
চৌদিকে বন্দনা করলাম
আসর করলাম স্থিতি
এই আসরে করবে দোয়া
লক্ষ্মী স্বরসতী ॥
তারপরে বন্দনা করি
উস্তাদের চরণে
আমার উস্তাদ বিজয় সরকার
খাসকররায় বাড়ি ॥
তাঁরও চরণে আমার
হাজারও সালাম ॥
বন্দনা করিতে আমার
অনেক হইল দেরি
এই আসরে গা'ব মোরা
নসীমন সুন্দরী ॥

তথ্যদাতা : মোঃ তাহাজ উদ্দিন [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রাম: গোপালপুর, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা সদর।
মোঃ আকতার আলী, গ্রাম: বোয়ালমারি, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা সদর।
কথক ও শিল্পী: মোঃ আব্দুস সাত্তার [জন্ম: ১৯৫৪], গ্রাম: পেরোচখালী, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা।
সংগ্রহের তারিখ : ১৫.০৯.২০১৩।

খ. লোকনৃত্য

হিজড়া নাচ

হিজড়া আমাদের পরিবারেরই একজন। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ খেয়াল আর অভিশাপে আমাদের পরিবারের একজন হয়েও এরা সমাজচ্যুত এবং এক ব্যতীক্রম জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের জীবন-জীবিকা ভিন্নতর। সমাজের আর পাঁচটা মানুষের পেশার সঙ্গে হিজড়াদের পেশাগত দিকটা একেবারে তাদের নিজস্ব বলয়ে সৃষ্টি করা।

হিজড়াদের মূল পেশা হচ্ছে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তান বা শিশু নাচিয়ে অর্থ আয় করা। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে নাচানোর সময় হিজড়ারা বিভিন্ন ধরণের গান গেয়ে থাকে, যা শিশু নাচানোর গান হিসেবে পরিচিত। এ গানগুলো তাদের নিজস্ব সৃষ্টি করা। হিজড়ারা ছেলেমেয়ে নাচানোর সময় যে গান গেয়ে থাকে তার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল —

আয়রে আনন্দের বাছা
আয় না কোলে
আয়রে জাদু আমার খেলন করে,
নীলমণি গো জাদু গো মণি আমার
আমি দোয়া দান করি,

বেঁচে থাকো জাদুমণি
সোনার চাঁদ আমার।

হিজড়ারা ছেলে বা মেয়ে নাচানোর সময় সাধারণত কয়েকজন এক সঙ্গে সুর করে গান গেয়ে থাকে। আর গান শুরু করার আগে পরিবারের গৃহিণীর কাছ থেকে একটা ভালো কুলা, তাতে কিছু চাল, ডাল ও পান সুপারি নিয়ে থাকে। গান পরিবেশনের সময় এ হিজড়াদের মধ্যে যে কেউ একজন সামগ্রীসহ কুলা হাতে তুলে নিয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ এবং গান গেয়ে থাকে। নাচার সময়ে অসাধারণ ভঙ্গিতে কুলাটা ঘুরাতে থাকে। কিন্তু কুলার কোনো দ্রব্য মাটিতে পড়ে যায় না। গান শেষে কুলার উপরের দ্রব্যাদি হিজড়ারা নিজ ঝুলিতে ঢেলে নেয়। এরপর ছেলে বা মেয়ে অর্থাৎ শিশু সন্তান নাচানোর জন্য বকশিস, শাড়ি কাপড় ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী দাবি করে আদায় করে থাকে। যা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎ অপ্রতুল।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের হিজড়াদের আর্থসামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডাঙ্গা শহর সংলগ্ন সাতগাড়ি গ্রামে, দর্শনা ও আলমডাঙ্গায় হিজড়াদের বসবাস রয়েছে এবং বহু কাল ধরে কমবেশি হিজড়া সম্প্রদায়ের এ পেশা প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বেছে নেয় নানা পেশা। বাঙালি আদিকাল থেকে জীবনের তাগিদে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের গোড়া থেকেই সমাজ ও সভ্যতা নির্ভর করেছে নানান শ্রেণির লোকপেশাজীবী কুশীলবদের উপরে। শত বছর পেরিয়েও বর্তমান সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রীর উৎপাদন এবং পরিবেশনের জন্য তাদের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। সেকালের বাঙালির কাছ থেকেই একালের বাঙালিরা লাভ করেছে নানাপেশা; কিংবা বলা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে নতুবা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই মানুষ গ্রহণ করেছে নানাপেশা। চুয়াডাঙ্গা জনপদের বিভিন্ন লোকপেশাজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সুতার/কাঠমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, গোয়ালা, ধুনুরি, গাছি, ঘরামি, রাজমিস্ত্রি, ঢুলি-বাদ্যকর-বাজুন্দার, দরজি, নাপিত, শানওয়ালা, সাপুড়ে, ঘটক, পাখিপালক ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

১. সুতার/কাঠমিস্ত্রি

কাঠের আসবাবপত্র তৈরির সাথে যারা জড়িত সাধারণত তাদেরকে সুতার বা কাঠমিস্ত্রি বলা হয়। বহুকাল আগে থেকেই কাঠের কারিগররা কাঠের আসবাবপত্র তৈরিতে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কাঠ খোদাই বা কুন্দানোর কাজ করে আসছে। তবে আধুনিক যান্ত্রিক সরঞ্জাম কৃষিকাজে এবং পরিবহনখাতে ব্যবহৃত হওয়ায় কাঠমিস্ত্রিদের কাজের ক্ষেত্র কিছুটা কমে এসেছে– বিশেষ করে লাঙ্গল-জোয়াল তৈরি, গরুর গাড়ি-মহিষের গাড়ি-ঘোড়ার চাকা ও বডি তৈরির ক্ষেত্রে। কিন্তু কাঠের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি-অফিস-আদালতের প্রয়োজনীয় আসবাব, জানালা-দরজা তৈরিতে কাঠমিস্ত্রিদের ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য বস্তুর তৈরি আসবাবপত্র পাওয়া গেলেও কাঠের আসবাবপত্রের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। কাঠের আসবাবপত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণের প্রধান কারণ কাঠের উপর কারুকার্য খচিত খোদাই এর কাজ। খোদাইকর্মের কাজটি কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রথমে কাঠের ওপর নকশার অঙ্কন করা হয়; তারপর হাতুড়ি-বাটালি ব্যবহার করে কাঠের ওপর নকশার অঙ্কনটি কাটা হয়। তবে,বর্তমানে বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও নকশার কাজ করা হয়ে থাকে। তাই বর্তমান দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চুয়াডাঙ্গার জেলা সদর, উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন হাট-বাজার বা ছোটখাটো গ্রাম-গঞ্জেও কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অনেক গড়ে তুলেছেন খোদাইকর্মের কারখানা বা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা জেলার কাঠের তৈরি আসবাবপত্র নিজ অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অভ্যন্তরেও রপ্তানি করা হয়।

www.pathagar.com

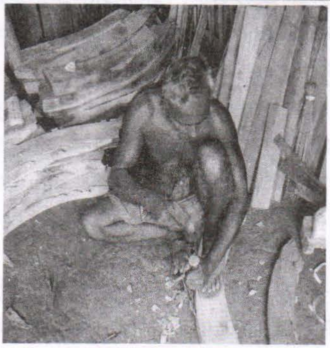

তথ্যদাতা : জটাধর কর্মকার [জন্ম: ১৯৬৪], সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, শঙ্করকুমার হাজরা [১৯৫৪], গ্রাম: নবীনগর, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, শচীন কর্মকার [জন্ম: ১৯৩৯], দামুড়হুদা বাজার, দামুড়হুদা উপজেলা, অধীর হাজরা [জন্ম : ১৯৪৪] তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৬.৯.২০১৪

২. ধুনুরি

ধুনুরিরা পেশাজীবি সম্রদায়। ধুনুরিদের হাতিয়ার 'ধুনট' নামে দেশি যন্ত্র। 'ধুনট' দেখতে অনেকটা ধনুকের মতো। চুয়াডাঙ্গা এলাকায় এটা কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এর শেষপ্রান্তে গরু বা মোষের মোটা লম্বা শিরা পদ্ধতিগতভাবে তৈরি রশি টান টান কওে আটকে রাখা হয়। কাঠের তৈরি হাতল বা মাকুর সাহায্যে দ্রুত স্পন্দের মাধ্যমে তুলা ধুনে পরিষ্কার ও শোধন করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। শীতের মরশুমে ধুনুরিরা বাড়ি বাড়ি খোঁজ করে চাহিদা মতো তুলা থেকে লেপ, তোষক, বালিশ, গদি, জাজিম, তাকিয়া ইত্যাদি দক্ষতার সাথে তৈরি করে থাকেন। জাজিম ইত্যাদি তৈরির সময়ে নারকেলের ছোবড়াকে ব্যবহার উপযোগী করার কাজেও এঁরা দক্ষ। বর্তমানে সারা বছরই এঁদের কাজের নানা রকম চাহিদা রয়েছে। সেই সূত্রে চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগরসহ ছোটখাটো হাটে-বাজারেও বাণিজ্যিভাবে স্থায়ী দোকানপাট গড়ে উঠেছে। মানুষের সৌখিনতা বেড়ে যাওয়ায় এবং আরাম-আয়েশের দিকে নজর দেওয়ায় এ ব্যবসা ভালই চলে।

তথ্যদাতা : হাফিজুর রহমান মালিক [জন্ম : ১৯৫৮], চুয়াডাঙ্গা মল্লিকপাড়া, চুয়াডাঙ্গা

www.pathagar.com

৩. গাছি

সাধারণভাবে গাছ কাটে যে তাকে গাছি বলা হয়। তবে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 'গাছি' বলতে যে রসের জন্য খেজুর গাছ কাটে তাকে গাছি বলা হয়। এপেশার সাথে সাধারণত গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষেরা জড়িত। তবে, অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এপেশার সাথে সম্পৃক্ত হন। গাছি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গাছের মালিককে রসের অর্ধেক; ক্ষেত্রবিশেষ তিনভাগের দুই ভাগ প্রদান করেন। গাছি কখনো কাঁচা রস বিক্রি করে আবার কখনও রস জ্বাল দিয়ে তা থেকে গুড় বা পাটালি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন।

গাছি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করছে

৪. ঘরামি

'ঘরামি' বলতে ঘরনির্মাণকারী [ঘরের চাল] বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, যারা কাঁচা বাড়ির খড়ের চাল নির্মাণ করে তারাই ঘরামি। ঘরামিরা ঘরের চাল নির্মাণে বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করলেও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ঘরামিরা শুধু ধানের ও গমের খড় এবং উঁচু জমিতে (স্থানীয় ভাষায় 'বাচড়া') উৎপাদিত উলুখড় ব্যবহার করে থাকে।

৫. ঢুলি-বাদ্যকর-বাজুন্দার

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ঢুলি-বাদ্যকর-বাজুন্দাররা বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে গান-বাজনার ব্যবস্থা করে। বিয়ে, পূজা, নির্বাচন-উত্তর আনন্দ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবসের র‍্যালি প্রভৃতি সময়ে বাদ্যকর [বাদ্যযন্ত্র বা বাজনা বাজায় যে] কিংবা ঢুলির [ঢোল বাজায় যে] ডাক পড়ে। তবে এরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঢুলি, বাজনদার, বাদ্যকর, ঢুলি কারিগর

www.pathagar.com

নামে পরিচিত। সমাজ ও সময়ের প্রয়োজনে প্রবহমানতায় এদের সংখ্যা কমে এসেছে – আবার কেউ কেউ অন্য পেশার সাথে যুক্ত থেকে এ পেশাও বহাল রেখেছে। সাম্প্রতিককালে চুয়াডাঙ্গা জেলায় হাতে গোণা কিছু বাদ্যকরের সন্ধান পাওয়া যায়– এঁদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন রোডের মণীন্দ্রচন্দ্র দাস, আলমডাঙ্গা সদরের নগেন্দ্রনাথ হাজরা, দর্শনা রেলস্টেশন পাড়ার কুমারেশচন্দ্র হাজরা উল্লেখযোগ্য।

মণীন্দ্রচন্দ্র দাস

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা: আলমডাঙ্গা

৬. শানওয়ালা

'শাণ' একপ্রকার ঘর্ষণযন্ত্র বা অস্ত্রাদি শাণানোর পাথর বিশেষ। সাধারণত যে ব্যক্তি ছুরি-কাঁচি-বটি-দা-এ শাণ [শো (তীক্ষ্ণ করা)+ণ] দেন তাকে শাণওয়ালা বলে। এছাড়া শাণওয়ালারা নতুন কাঁসার ঘড়াতে নকশা তৈরি এবং পুরাতন ঘড়াকে পালিশ করে নতুনের মতো রূপ দিতে পারে।

তথ্যদাতা : রতনকুমার প্রামাণিক [জন্ম : ১৯৭৭], চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার, চুয়াডাঙ্গা

www.pathagar.com

৭. সাপুড়ে

সাপ ধরে কিংবা সাপের খেলা দেখিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে জীবিকা চালিয়ে থাকে। এরা সাপুড়ে নামে পরিচিত। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জের পাশে হুনাইগঞ্জে বুনো পাড়ায় প্রতি বছর ভাদ্রমাসে সাপুড়েরা 'ঝাঁপান' এর আয়োজন করে থাকে। এই দিন এ জেলার বিভিন্ন সাপুড়েরা উপস্থিত হয়ে সাপখেলার প্রতিযোগিতায় নামে; যে সাপুড়ের সাপ বেশি উঁচুতে বেশিক্ষণ ফণা তুলে থাকে সেই সাপুড়েকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তবে সাপুড়েরা প্রধানত সাপ ধরে, গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাপের খেলা দেখিয়ে টাকা পয়সা বা চাল পেয়ে থাকে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সাপের খেলা নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই বিস্ময়ের সাথে উপভোগ করে। এরা অনেকে জ্যান্ত সাপ এবং সাপের বিষও বিক্রি করে উপার্জনের পথ হিসেবে ।

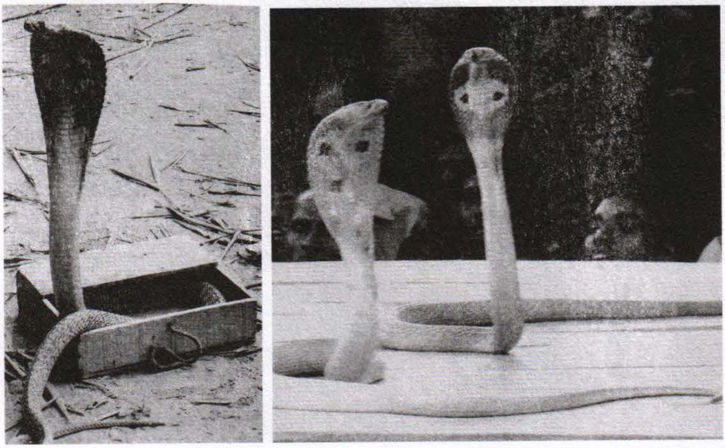

তথ্যদাতা : আলতাফ হোসেন সাপুড়ে [জন্ম : ১৯৬৪], গ্রামঃ গাইদঘাট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা

৮. ঘটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেকে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে স্থাপনে যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা করে থাকেন। সমাজে এঁরা ঘটক হিসেবে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে ঘটকের মধ্যস্থতায় পাত্র-পাত্রির বিয়ে সম্পন্ন হয়। সামাজিক হিসাবেও ঘটকের ভূমিকাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগরসহ সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলার গ্রাম-গঞ্জে বহুলোক সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে ঘটকের কাজ করে থাকেন। বিয়েতে ঘটককে কিছু উপঢৌকন দেওয়ার রীতি আছে, অবস্থাভেদে সম্মানী বাবদ টাকা-পয়সাও লেনদেন হয়।।

তথ্যদাতা : অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম : ডাউকি, উপজেলা : আলমডাঙ্গা

www.pathagar.com

৯. পাখি-পালক

চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেকে প্রথমদিকে শখের বশে পাখিপালন শুরু করলেও; এক সময়ের সৌখিনতা বর্তমানে পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার মাস্টার পাড়ার লোটাস, কেদারগঞ্জ পাড়ার আলম, সাইদ, দৌলতদিয়াড়ের সাইফুল, রেলস্টেশন পাড়ার আমজাদসহ, আলমডাঙ্গা, হাটবোয়ালিয়া, দামুড়হুদা ও জীবননগরের বেশ কয়েকজন যুবক পাখি পালনের প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ থেকে ৫ জোড়া কবুতর, বাজারিগার, ডায়মন্ড ডাভ (বিদেশি ঘুঘু), মুনিয়া কিনে এনে পালন শুরু করেন। তবে, মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে এদের সবাই এখন পাখির খামারি।

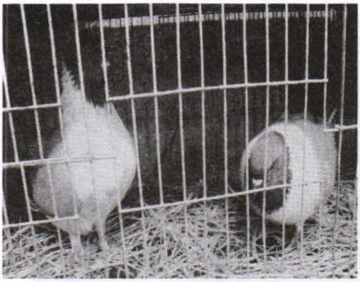

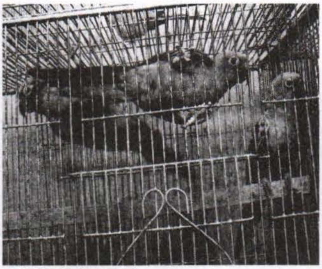

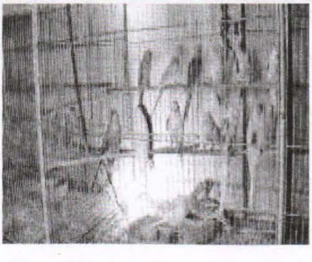

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও পাখির দেখাশোনা থেকে আরম্ভ করে বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এসব পাখিপালকেরা বুনোপাখি (ওয়াইল্ড বার্ড) এবং খাঁচার পাখি (কেজ বার্ড) দুই ধরণেরই পাখি পালন করছে। এ-সব পাখির মধ্যে দুর্লভ জাতের কয়েক রকম বিদেশি ঘুঘু, হলুদ বোখারা, শাদা বোখারা, বিউটি হোমার, কিং, নান, সিরাজি, প্লেজারসহ ২৫টি জাতের কবুতর পাওয়া যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন দোকান কিংবা খামারে। এছাড়া বিদেশি জাতের ককাটিয়াল, লং টেইল, হোয়াইট জাভাসহ নানাজাতের পাখির চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্লেষকদের মতে, চুয়াডাঙ্গার পাখিপালন যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অল্পপুঁজিতে এ অঞ্চলের অনেক তরুণ-তরুণী পাখিপালনের মধ্যে দিয়ে বেকারত্বের অভিশাপ কাটিয়ে সহজেই সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যদাতা : মোঃ সালাউদ্দিন [জন্ম : ১৯৬৮], চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামপাড়া, চুয়াডাঙ্গা।

অধ্যাপক মোঃ আবদুর রশিদ [জন্ম : ১৯৮১], গ্রাম: ডাউকি, উপজেলা : আলমডাঙ্গা।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এক সময় ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের খুব প্রকোপ ছিল যা তৎকালীন স্থানীয় জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে জেলা-উপজেলা শহরে কিছু আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ থাকলেও স্থানীয় লোকজনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকমের লোক-চিকিৎসা, গ্রাম্য কবিরাজ, পির-ফকির ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। রোগ বালাই সম্পর্কে এখনও তাদের মধ্যে অদ্ভূত কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। তাদের ধারণা-বিভিন্ন রোগ কিম্ভূত কিমাকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধরে আক্রমণ করে। তাই তাদের তদবীরের অন্ত থাকে না।

এক সময় রাত্রিকালে কবিরাজ ফকিরেরা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লাঠি হাতে রোগ তাড়িয়ে বেড়াত। তখন গোটা থানাতে একজন হাতুড়ে ডাক্তার পর্যন্ত মিলত না। পির-ফকির, ওঝা-কবিরাজের উপরই নির্ভর করতে হতো। যার রেশ আজও রয়ে গেছে। গ্রাম্য কবিরাজগণ সাধারণত বিভিন্ন রকমের গাছগাছালি চিকিৎসা করেন। যেমন কালো জিরা, অফুলা তেঁতুলের ডাল, আকন্দের পাতা, আমের ছাল, জামের ছাল, দয়া (বিচি কলা) কলার ছোঁৎরা (ছাল) ইত্যাদি। এছাড়াও পারিবারিকভাবে অধিকাংশ লোকেরাই কিছু না কিছু লোক চিকিৎসা জানে।

রোগের উৎস

এ অঞ্চলে প্রচলিত রোগ সম্পর্কিত কিছু লোকবিশ্বাস, রোগের উৎপত্তি ও লোকচিকিৎসা ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে প্রদান করা হলো:

১. মায়ের স্তন চুলকালে সন্তানের অসুখ হয়।
২. ফুঁ দিয়ে বাতি নিভালে অসুখ হয়।
৩. ডান চোখ অকারণে লাফালে অসুখ হয়।
৪. ছোট ছেলেমেয়েরা পাছা উপুড় করে দেখালে তার অসুখ হয়।
৫. প্রস্রাব বেশিক্ষণ আটকে রাখলে অসুখ হয়।

রোগ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত লোকবিশ্বাস ছাড়াও প্রত্যেক রোগের সুনির্দিষ্ট লোকবিশ্বাস ও তার প্রতিকার সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। যেমন

১। বসন্ত রোগের কারণ

এককালে গুটি বসন্ত সারা চুয়াডাঙ্গার মানুষের কাছ মূর্তিমান আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এ অঞ্চলের গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য পড়ে। নেহালপুর, সুবলপুর, ঘোষবিলা, জামজামি প্রভৃতি গ্রাম এখনও তার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে। যদিও

www.pathagar.com

এখন সারা বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের জন্য ঐ রোগ নির্মূল হয়ে গেছে। তবে সারাদেশের মতো এখনও জল বসন্ত লক্ষ্য করা যায়। আগে মানুষের ধারণা ছিল, স্বপ্নে মালা গলায় দেখলে, স্বপ্নে টাকা পয়সা পাওয়া দেখলে, ফাল্গুন মাসে বেদানা খেলে বসন্ত রোগ হয়।

প্রতিকারের উপায়

বসন্ত রোগ হলে উচ্ছে খাওয়া ভাল, কোনো প্রকার তেল মাখা যাবে না, গোছল করা যাবে না, ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলে দাগ মুছে যাবে।

২। পেটের অসুখের কারণ

ক. দৌড়াদৌড়ি করে এসে পানি খেলে পেটে ব্যথা হয়।
খ. বাতির আগুন দিয়ে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে খেলে পেটে ব্যথা হয়।
গ. জেদাজেদি করে খেলে পেটে অসুখ হয়।
ঘ. স্বপ্নে খেলে পেটে অসুখ হয়।
ঙ. চুলার উপর থেকে তরকারি খেলে পেটে অসুখ হয়।
চ. মুড়ি খেয়ে পানি খেলে পেট নষ্ট হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. জিরে দিয়ে পান খেলে পেটের অসুখ সারে।
খ. চালের কুড়া দিয়ে ধাপড়া বানিয়ে খেলে পাতলা পায়খানা ভালো হয়।
গ. সোবহান আল্লাহ তিনবার পড়ে লবণ দিয়ে জাউ খেলে পেটের অসুখ সারে।
ঘ. কাঁচা পেপের তরকারি খেলে পেট পরিষ্কার হয়ে পায়খানা হয়।

৩। চোখে অসুখ হওয়ার লক্ষণ

ক. চড়ুই পাখির ডিম ভাঙলে চোখ কানা হয়ে যায়।
খ. চোখ ছুয়ে কিরে করলে চোখ কানা হয়ে যায়।
গ. সূর্যের দিকে চেয়ে থাকলে চোখের জ্যোতি খারাপ হয়।
ঘ. ঘন ঘন দাড়ি কামালে চোখের জ্যোতি কমে যায়।
ঙ. কাশি পাড়ালে রাতকানা রোগ হয়।
চ. ল্যাম্পের আলোর শিষ চোখে লাগলে চোখ খারাপ হয়।
ছ. মেয়ে লোকের লজ্জাস্থান পুরুষে আর পুরুষের লজ্জাস্থান মেয়ে লোকে দেখলে চোখের জ্যোতি কমে যায়।

প্রতিকারের উপায়

ক. চোখ উঠলে কচি আমপাতার কস দিলে চোখ ভালো হয়ে যায়।
খ. পিঁয়াজের ঝাঁঝ লেগে নাক-চোখ দিয়ে পানি পড়লে চোখের ব্যারাম ভালো হয়ে যায়।
গ. সকাল বেলা ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখে ঝাপটা দিলে চোখ ঠান্ডা থাকে।
ঘ. চোখ উঠা মানুষ বালি মাটি পাড়ালে তার চোখ বেলে হয়। চোখ সারেও তাড়াতাড়ি।

www.pathagar.com

ঙ. কালো গরুর কলিজা খেলে রাতকানা রোগ সারে।
চ. চোখ উঠলে চোখে কাজল দিলে ভালো হয়ে যায়।
ছ. চোখে অঞ্জনি হলে ছোট ছেলের নুনু ছোঁয়ালে অঞ্জনি ভালো হয়।
জ. অন্ধকার রাতে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিলে রাতকানা রোগ ভাল হয়।

৪। চর্ম রোগের কারণ

ঘা পাঁচড়া বিষ ব্যথা গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ ব্যাধি। এসব ব্যাধি সারাতে ঝাড়ফুঁক বা ভেষজ চিকিৎসা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চর্মরোগ সংক্রান্ত নানা সংস্কার সমাজে বিদ্যমান। যেমন:
ক. ডিঙানো ভাত খেলে মুখে ঘা হয়।
খ. চালুন মাথায় দিলে মাথায় পাঁচড়া হয়।
গ. চুল কেটে গোসল না করে ঘরে গেলে খুশকি হয়।
ঘ. বেগুনের তরকারি বেশি খেলে গা চুলকায়।
ঙ. একজনের কাপড় অন্যজন পরলে ছোয়াচে রোগ হয়।
চ. রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোছল করলে পাঁচড়া হয়।
ছ. শীতকালে মুখে ঘা হয়।
জ. গান্ধি পোকা গায়ে পাঁদলে ঘা হয়।
ঝ. খালা-ফুফু রসুনের চোঁচা পোড়ালে ভাইঝি, বোনঝির গায়ে মাসিপিসি উঠে।

প্রতিকারের উপায়

ক. গান্ধি পোকার পাঁদ লেগে কোথাও ঘা হলে তিল চাবিয়ে লাগিয়ে দিলে ভাল হয়।
খ. ঘা পাঁচড়ার মধ্যে জোক লাগলে তা ভাল হয়ে যায়।
গ. ঘামাচি হলে বৃষ্টির পানিতে ভিজলে ঘামাচি ভাল হয়।
ঘ. গরুর শুকনা গোবর রান্না ঘরে পোড়ালে দাউদ ভাল হয়ে যায়।
ঙ. গায়ে চাকাচাকা উঠলে গরুর দড়ি গায়ে ঘসলে ভাল হয়।
চ. বেলের মালায় তেল নিয়ে মাথায় দিলে খুশকি দুর হয়।
ছ. শিমুলের শেকড় চাক চাক করে কেটে চিনি দিয়ে খেলে দাঁদ সেরে যায়।

৫। বাত রোগের কারণ

ক. ঘরের চালের গড়িয়ে পড়া পানি হাতের তালুতে নিলে শুইবাত হয়।
খ. যারা বল খেলে শেষ বয়সে তাদের বাতের অসুখ হয়।
গ. অমাবশ্যা পূর্ণিমার রাতে গায়ে রসের ভাব হয়।
ঘ. খেঁজুরের কাঁটা দিয়ে দাঁত খিলাল করলে বাতের ব্যারাম হয়।
ঙ. যে ব্যক্তি কাঁচা ডিম বেশি খায় তার বাতের ব্যারাম হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. কুচা মাছ খেলে বাত রোগ ভাল হয়ে যায়।
খ. হাতে পায়ে সরিষার তেল দিলে রসবাত কমে যায়।

www.pathagar.com

গ. কদম পাতা দিয়ে ছ্যাক দিলে বাতের ব্যথা কমে।
ঘ. ধুতরার পাতা বেটে লাগালে বাতের ব্যথা কমে।

৬। আমাশয় রোগের কারণ

ক. চিংড়ি মাছ বেশি খেলে আমাশয় ব্যারাম হয়।
খ. পাকা কলা খেয়ে পানি খেলে আমাশয় হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. পোড়ানো তেঁতুল গুলিয়ে খেলে আমাশয় ভাল হয়।
খ. জামের ছাল বেটে রস খেলে আমাশয় ভাল হয়।
গ. আম গাছের ছাল বেটে রস খালি পেটে খেলে আমাশয় রোগ ভাল হয়ে যায়।
ঘ. বিনা ঝালের কচুশাক রান্না খেলে আমাশয় ভাল হয়ে যায়।
ঙ. ছাগলের দুধ খাওয়ালে শিশুদের আমাশয় ভাল হয়।
চ. আমাশয় রোগীকে মাসকালাইয়ের ডাল খাওয়ালে আমাশয় রোগ সারে।
ছ. গরু দোয়ানোর পর পর কাঁচা দুধ খাওয়ালে আমাশয় সেরে যায়।
জ. থানকুনি গাছের পাতা খাওয়ালে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

৭। কৃমি রোগের কারণ

ক. বেশি বেশি চিনি খেলে কৃমি রোগ হয়।
খ. দাঁত কিড়মিড় করলে কৃমি হয়।
গ. ছোট ছেলেমেয়ে মাটি খেলে কৃমি হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. পাটের শুকনো পাতা ভিজিয়ে রেখে সকালে বাসি পেটে খেলে কৃমি সারে।
খ. মলদ্বারে গুড়ো কৃমি কামড়ালে লবণ দিয়ে পানি গরম করে শৌচকর্ম করলে কৃমি মরে যায়।
গ. শসা পাতার রস চিনি দিয়ে খেলে কৃমি রোগ সারে।

৮। যক্ষা রোগের কারণ

ক. হুক্কা তামাক বেশি খেলে যক্ষা রোগ হয়।
খ. বাবা-মার বদদোয়ায় যক্ষা রোগ হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. যক্ষা হলে হাতির শুকনা পায়খানা দিয়ে কলকে খেলে যক্ষা সারে।

৯। মৃগী রোগের কারণ

ক. ভাতের লাকড়ি দিয়ে ছেলে মারলে সে ছেলে মৃগী রোগ হয়।
খ. খই মুড়ি ভাজা কলার ডেগো দিয়ে বাড়ি দিলে মৃগী ব্যারাম হয়।

প্রতিকারের উপায়

ক. চামড়ার জুতা শুকতে দিলে মৃগী রোগ ভাল হয়।
খ. প্রসূতিকে মৃগেল মাছ খাওয়ালে বাচ্চার মৃগী রোগ হয় না।

www.pathagar.com

জ্বর-সর্দি-কাশি একটি সাধারণ রোগ। এ রোগগুলোতে নিম্নলিখিত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

ক. বন্যার পাতা তালের তালুতে পিষে রস দুই নাকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে রাখলে সব সর্দি ঝরে গিয়ে সর্দিগরমি সারে।

খ. সর্দিগরমি লেগে মাথাব্যথা ও জ্বর জ্বর ভাব হলে বন তামাকের গাছ লবণ দিয়ে বেটে হাতে পায়ে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গ. কাঁচা পিঁয়াজ চিবিয়ে খেলে বা পিঁয়াজ আর সরিষার তেল বেটে মাথার চান্দিতে লাগালে সর্দিগরমি ভাল হয়।

ঘ. জ্বর হলে তেঁতুল গুলিয়ে খাওয়ালে জ্বর ভাল হয়।

ঙ. কাশি হলে তুলসী পাতা, হরিবংশির পাতা বা গন্ধ ভাদালের পাতা সিদ্ধ করে খেলে কাশি ভাল হয়।

উপরিউক্ত রোগ-বালাই ও উপসর্গের চিকিৎসা ছাড়াও স্থানীয় কবিরাজ, ওঝা, গুণিন, ফকির, দাই, বেদে-বেদেনীরা নানা ধরণের তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক, বশীকরণ, পানি পড়া, সুতো পড়া, টোটকা চিকিৎসার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। যেমন :

পানি পড়া, সুতা পড়া ও তেল পড়া

সাধারণত ভয় লাগা, বাতাস লাগা, চুল কাটা, গায়ের ময়লা তোলা, নতুন বৌয়ের শাড়ির আচল কাটা প্রভৃতিতে পানি পড়া, সুতা পড়া ও তেল পড়া দেয়া হয়। ভয় পেলে বাড়ির মুরব্বীরা মুতা বাড়ুন (খাটো ঝাড়ু) দিয়ে সমস্ত শরীর ঝেড়ে-মুছে দিয়ে অশরীরী ও অলৌকিক আত্মার কবল থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো সময় লবণ পানির মিশ্রণ করেও খেতে দেয়া হয়। পানি পড়া ও অষ্ট ধাতুর মাদুলীতে ঔষুধি গাছ ভরে গলায় দিলে ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[১]

চোখে খড়-কুটো পড়ার চিকিৎসা ও বাচ্চাদের গোয়া রোগ ঝাড়ানো

কখনও কখনও বাতাসে ধুলো-বালি, খড়-কুটো বা পোকা উড়ে এসে আমাদের চোখে পড়ে। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এর অভিনব চিকিৎসা তন্ত্রটি এখনও চালু রয়েছে। কারো চোখে খড়-কুটো বা পোকা পড়লে এক বাটি সরিষার তেল দিয়ে নিজের নাম বলে যেতে হয়। সেই তেল হাতে মন্ত্র পড়ে কবিরাজ তাঁর হাতের তালুতে ঘষতে থাকেন। পরক্ষণেই চোখের পড়া খড়-কুটো বের হয়ে যায়। এই তেল পড়া ও মন্ত্র দিয়ে বাচ্চাদের গোয়া ঝাড়ানো রোগের চিকিৎসাও করা হয়। মন্ত্রটি হলো :

আল্লাহু আহাদ ইয়া জিবরিল,
ইয়া সামাদ ইয়া ইস্রফিল।
ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ
ইয়া মিকাইল
কুলুহু কোফকান আহাদ।
জিবরাইল ফলনার বাড়ির দেও
দুর কর ইয়া বুদ্দ্যহো।[২]

www.pathagar.com

কলেরা/ওলা উঠা

১৯৫০ সালে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের মনোহরপুর, সুবলপুর, হরিপুর, শাখারিয়া, হরিহরনগর, নেহালপুর, জামজামি, ঘোষবিলা প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপকভাবে কলেরা বা ওলা উঠা রোগ দেখা দেয় এবং গ্রামের পর গ্রাম জনমানবহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতার কারণে নিরীহ গ্রামবাসী সেসময় ফকির কবিরাজদের দিয়ে গ্রাম ঠেকানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। জীবননগর উপজেলার হরিপুর গ্রামের সায়েম আলী ফকির ও একতারপুর গ্রামের খেলাফত ফকিরসহ অনেকেই ওলা উঠা বা কলেরা রোগের চিকিৎসা দেন। ওলা উঠা বা কলেরা রোগের চিকিৎসায় চুন পড়া ব্যবহৃত হয়। এই চুন পড়া নিজ নিজ বাড়ির কলসিতে দাগ দিয়ে দিতেন, যাতে এই রোগের জীবাণু পানি বাহিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে। ফকির কবিরাজগণ অনেক সময় রাস্তায় রাস্তায় শস্য বীজ বপন করে থাকেন এবং রাতের বেলা ভক্তদের নিয়ে সারা গ্রাম পাহারা দেন। তাদের মুখে থাকে আল্লাহ-রসুলের নাম। ফকির বা কবিরাজ মাঝে মাঝে আল্লাহ হক বলে চিৎকার দেন আর সাগরেদরা একযোগে সুর করে পড়েন নানা শ্লোক। যেমন:

> আমার আপেকুল আল্লাহ, দাপেকুল আল্লাহ,
> কুলহু আল্লাহ, আপে হইতে আপ কর
> গুণাহ হইতে মাফ কর।
> তিরা কাজে নাহি কর ভুল
> আমার আপে কুল।
> নামাজ রোজা ত্যাজ্য করে এলাম ভবের বাজারে
> বেনামাজীর হাত গো আল্লাহ বাঁচাও আমারে
> আমার আপেকুল।
> সারা জাহানের মালিক তুমি আলেকুল আল্লাহ।[৩]

জীবননগর উপজেলার হরিপুর গ্রামের করম আলী ফকির একজন সিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। কলেরা হলে তিনি লাল সূতা পড়ে দিতেন। সেই সূতা ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে রাখতে বলতেন এবং রাতের বেলা কাউকে বাইরে বেড়াতে যেতে নিষেধ করতেন। এছাড়া শূন্য কলসি বা জগ বদনা রাখতে নিষেধ করতেন। কারণ শূন্য কলসিতে শয়তান আশ্রয় নিতে পারে। ফকির সাহেব রাতের বেলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন এবং সামনে যদি শূন্য কোনো জিনিস পেতেন তাহলে মন্ত্র পড়ে লাঠির বাড়ি দিয়ে ভেঙে দিতেন। এভাবে তিনি গ্রাম ঠেকিয়ে টাকা, চাল, ডাল ইত্যাদি নিতেন। করম ফকির ৬৩ বছর বয়সে ২০০৪ সালে মারা যান। তিনি ছিলেন একাধারে সাপের ওঝাঁ, গ্রাম ঠেকানো ফকির এবং ঝাঁপানের গায়ক।[৪]

বিছানায় প্রস্রাব করা

ঘুমের ঘোরে অনেক ছেলেমেয়ে বিছানায় নিয়মিত প্রস্রাব করে ফেলে। এতে যে সব ছেলেমেয়ে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে তারা যেমন বিব্রত হয়, তেমনি বিরক্ত হয়ে তাদের মা-বাবারা সন্তানদের শারীরিকভাবে মারধর এবং একই সাথে মানসিক নির্যাতনও করে থাকে। ছেলেমেয়েদের বিছানায় প্রস্রাবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার

www.pathagar.com

জন্য অনেক সময় অপেক্ষাকৃত মুরুব্বি মহিলাদের পরামর্শে মা কিংবা পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা পরিবারের অন্য কাউকে না জানিয়ে গোপনে অমাবস্যার রাত্রে এক শিশি সরিষার তেল, সামান্য কিছু গুঁড়ো হলুদ, একছড়া পাকা কলা, এক পাতা সিঁদুর তিন রাস্তার মোড়ে শেওড়া (স্থানীয় ভাষায় সড়া গাছ) অথবা বট গাছের তলায় রেখে আসা হতো। ভোর রাত্রে রেখে আসা সিঁদুরের পুরোটাই, সামান্য হলুদ, সামান্য তেল, শেওড়া গাছের গুড়িতে মাখিয়ে দেওয়া হতো। আর পাকা কলা যদি অবশিষ্ট থাকে তবে মাত্র একটি কলা নিয়ে এসে শিশুটিকে খালি পেটে খাইয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা বেলা হলে সরিষার তেলের পুরোটাই এবং হলুদ একসাথে মিশিয়ে শিশুটির সারা গায়ে মাখিয়ে তাকে গোছল করিয়ে দেওয়া হয়। মনে করা হয় এতে তার বিছানায় প্রস্রাব অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

এ ছাড়া অনেক মৌলভি, মৌলানা, ইমাম সাহেব বা হুজুর আছেন যাঁরা ঝাড়-ফুঁক, পানি-পড়া, তেল-পড়া, সুতো-পড়া, ইত্যাদির সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। বিছানায় প্রস্রাব করার চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের শরণাপন্ন হলে তাঁরা সাধারণত তেল-পড়া, পানি-পড়া, কালজিরা-পড়া এবং একগুছি লাল গিঁট দিয়ে সুতো পড়ে দেন। এক্ষেত্রে লাল সুতোর গুছি গোছলের পরে কোমরে বাঁধতে হয় এবং সাত দিন সকালে বিকালে হাত-মুখ ধুয়ে তেল-পড়া হাতে-মুখে মাখতে হয় এবং পানি-পড়া ও কালজিরা-পড়া খেতে হয়। মনে করা হয় এভাবে বিছানায় প্রস্রাবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

দাঁতে যন্ত্রণা বা দাঁত ব্যথা

ছোটবড় কমবেশি সবারই দাঁতে যন্ত্রণা বা দাঁত ব্যথা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এক চিমটে লবণ নিয়ে যন্ত্রণাকাতর দাঁতের জায়গায় কিছু সময় শক্ত করে টিপে ধরে রাখলে দাঁতের যন্ত্রণার উপশম হয়। এ ছাড়া দাঁতের মাড়িতে ছিদ্র হয়ে যন্ত্রণা এবং ফোলা থাকলে সামান্য তামাক পাতা চুন দিয়ে ভাল করে হাতের তালুতে ডলে আক্রান্ত দাঁতের ওপর রেখে দুই চোয়ালের সাহায্যে শক্ত করে চেপে রাখলে ব্যথা এবং যন্ত্রণা দূর হয়।

তথ্যদাতা : মোঃ তোপাজ্জেল হক আর চিশতি, গ্রাম ছয়ঘরিয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২৩.০৩.২০১৩

মন্টু মিয়া, বয়স : ৫৮ বছর, গ্রামঃ বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ১২.১০.২০১৩

খ. তন্ত্রমন্ত্র

ঘা-পাঁচড়া ও বিষ ব্যথার মন্ত্র :

ঘা-পাঁচড়া, বিষ ব্যথা গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ ব্যাধি। এসব ব্যাধি সারাতে ঝাড়-ফুঁক বা ভেষজ চিকিৎসা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এসব রোগ সারাতে যেসব মন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার উল্লেখ করা হলো :

মুর্শিদ রূপ-স্বরূপ দুই ভাই
নিজগুণে দয়া করিয়া

www.pathagar.com

আমার এই ব্যাধি ভাল করে দাও
ভাল যদি কর
দোহাই ধর্মের
দোহাই মুন্ডমালার
দোহাই মা বরকতের
দোহাই মা খাকীর
দোহাই মা মুর্শিদের।[৫]

পোড়া, ফোড়া, ঘা ঝাঁড়ার মন্ত্র :

তেলের নাম মেঘনাল
বানের নাম ফুঁকো
হাড় মাংস ছেড়ে দিয়ে
ঢাকনির গায় লুকো।
রুগী এড়ে রুগীর ছাড়
রুগী নেই জয়,
রুগী ছেড়ে যাও কোথায় শ্রী কবিরাজ
লক্ষী আর স্বরসতী
পাতালে পড়ে ম'ল বাতসী
দোহাই বড় পীর সাহেব
রহিমের গার ঘা শিগগির ছাড়।[৬]

ঘাড়ে ফিক ঝাঁড়ার মন্ত্র :

উত্তরে এলো ফিক
ঘাড়ে করল ভর
রাম লক্ষণ সীতার আজ্ঞে
ফিকির ব্যথা ছাড়।[৬]

শাকের পোকা ঝাঁড়ার মন্ত্র :

শাক রাঁধে মিয়া খায়
আর পোকামাকড় দূরে যায়।[২]

পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র :

বিভিন্ন ধরণের পিঠা পায়েস তৈরি গ্রামাঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক আয়োজন। সেই পিঠা তৈরি করতে গিয়ে অনেক সময় গুণীন বা কবিরাজের নজরে পড়লে পিঠাই বান মেরে দেন, তাতে পিঠা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে পাকান পিঠে, আকসি পিঠে ও চালে গুড়ার রুটি তৈরির সময় গৃহিণীদের বিভিন্ন ছ্যুৎ লাগা ও তন্ত্র মন্ত্র থেকে সাধনতা অবলম্বন করতে হয়। অনেকের ধারণা নিম্নের মন্ত্র দ্বারা পিঠা নষ্ট করা সম্ভব :

www.pathagar.com

১

আলো ধানের কালো পিঠা
তিন গাইনে বানে আটা।
একটা ধানে দুইটা তুষ
পিঠা তলায় ভূষাভূষ।[৫]

২

হেলুয়া রুটি বেলুয়া পাক
যেমন রুটি তেমন থাক।[৫]

চোখ ঝাঁড়ানোর মন্ত্র :

চোখ উঠা, চোখ ফোলা ও ব্যথাসহ যাবতীয় সমস্যায় নিম্নের মন্ত্রটি পাঠ করে ঝাঁড়-ফুঁক করা হয় :

নদীর পারেতে যবে জানকী যাইল
সেই যমে চক্ষুশূল তাহার জন্মিল।
যন্ত্রণায় অস্থির সীতা করেন রোদন
রামচন্দ্র বেদনা তাহার করেন নিবারণ।
কার আজ্ঞা-হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞা
কার আজ্ঞা-কাউরে কামাক্ষ্যা দেবীর আজ্ঞা।[২]

শিং মাছের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র :

নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা-জলাশয়ে মাছ ধরার সময় প্রায়শঃ শিং মাছের কাঁটা ফুটলে বিষ পানি করার জন্য নিম্নের মন্ত্রটি পড়ে থাকে :

শিঙ্গিবিঙ্গি চোষের মুড়ি
কোথায় পালি তুই বিষের হাড়ি
বিষের হাড়ি পাইয়া
শিঙ্গি গেলো ধাইয়া
আগে যায় গুরু, পিছে যায় শিষ্য
ঝাড়িয়ে ঝুড়িয়ে নামাও
কেছুয়া শিঙ্গির বিষ।
আরে বেটা কালিয়া তুই যাস কেন পালিয়া
তোর বিষ মারবো, জলম দিয়া ঝাড়বো
আগে যায় গুরু, পিছে যায় শিষ্য
ঠাস করে মারব কালা কনচের বিষ।[১]

মাছ ধরার মন্ত্র :

বড়শিতে মাছ ধরার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পড়া হয়ে থাকে :

থুতকুড়ি থুতকুড়ি
জিন্দা মাছের বুরবুরি

www.pathagar.com

যেখানে মাছের ঘর
সেখানে বর্শা পড়।[১]

হাত চালানোর মন্ত্র :

কোনো জিনিস হারিয়ে বা চুরি হলে সনাক্ত করার জন্য গুণীন দবারা হাত চালানো হয়। গুণীন যে মন্ত্রটি পড়ে হাত চালায় তা হলো :

হাত চালান হাত চালান
আতালে পাতালে বাঁশরী চালান
চল হাত চল
যেখানে বিষ থাকে
সেখানে চল।
যদি বিষ থুয়ে এদিক ওদিক যাস
ঈশ্বর মহাদেবের জট খাস
ভূ-মস্তকে খসে পড়।[১]

গবাদি পশুর লোকচিকিৎসায় তন্ত্রমন্ত্র :

এ অঞ্চলে মানুষের লোকচিকিৎসার পাশাপাশি গবাদি পশুর চিকিৎসায়ও তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে গবাদি পশুর লোকচিকিৎসা দিয়ে থাকে। মোঃ সোলায়মান আলী পেশাদারী কবিরাজ নন। চিকিৎসা দিয়ে টাকাও নেন না। সেকারণে সমাজে তার কদর অনেক বেশি। গরুর কল ঝাঁড়ার পাশাপাশি তিনি মানুসের ঘা-পাঁচড়া, ফোঁড়া, আগুনে পোড়া, ঘাড়ে ফিক লাগা ইত্যাদি রোগের ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

গরুর কললাগা বা কল ঝাড়া :

গরুর কললাগা একটি মারাত্নক রোগ। চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্বত্রই এই রোগ কম বেশি দেখা যায়। এই রোগ হলে গরু মাঝে মাঝে কাশি দেয়, শ্বাসকষ্ট হয়, যার ফলে খাদ্য গ্রহণে অনিহা দেখা যায়। এতে করে গরুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে গরু মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। অনন্যউপায় গবাদি পশুর মালিকেরা কবিরাজ বা বৈদ্যের কাছে যেতে বাধ্য হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি :

এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি অভিনব ও আশ্চর্যজনক। গরুর মালিক যৎসামান্য সরিষার তৈল কবিরাজের কাছে দিয়ে যায়। কবিরাজ গরুর বর্ণনা শোনার পর ঐ তৈল দ্বারা নিজের গলা মালিশ করে মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। ওদিকে দূরে থাকা গরুর কললাগা রোগ ভাল হয়ে যায়। ১ম, ২য় ও তৃতীয় দিনে প্রয়োজন হলে গরুর কল ঝাড়া হয়।

গরুর কল ঝাড়ার মন্ত্র :

একের উপর টেকের বাসা
কাহা কুল্লার ছা,
একটাই করে ঝটপট

www.pathagar.com

একটইই করে কা
কলিমুদ্দির শ্যামল গরুর কল লেগেছে
শিগগির ছেড়ে যা।[৫]

গরু মহিষের ফলা লাগা ঝাড়ফুঁক :

কৃষকের প্রধান অবলম্বন হলো হালগরু। কথায় আছে, হাল গরু বীজ ধান/সেই বেটা কৃষাণ। জমি চাষ করতে গিয়ে অনেক সময় অসাবধানতাবশত গরু মহিষের পায়ে লাঙলের ফলা লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফলে হালের বলদ বা মহিষ খোড়া হয়ে যায় এবং কৃষক পড়েন বেকায়দায়। তবে এর প্রতিকারের ব্যবস্থাও রয়েছে গ্রামাঞ্চলে। অনেকে ফলা ঝাঁড়ার মন্ত্র জানেন। ফলা লাগার সাথে সাথে ওঝা বা কবিরাজের কাছ থেকে ফলা লাগা ঝেঁড়ে নিলে গরুর ক্ষত ভাল হয়ে যায়।

ফল ঝাড়ার মন্ত্র :

খচারা খচ খচাতি যয়
খচারা তিনি বুনি
কামরুক কামাক্ষ্যার আজ্ঞা।[৫]

সুন্নতে খৎনা বা মুসলমানীর লোক চিকিৎসা :

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সুন্নতে খাৎনাকে মুসলমানী অনুষ্ঠান বলা হয়। সাধারণত ৫-৯ বছর বয়সী ছেলেদের মুসলমানী দেওয়া হয়। বেজোড় বছর বয়সে খাৎনা দেওয়া উচিত বলে স্থানীয়রা মনে করেন। ৫, ৭, ৯ বছর বয়সেই এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। জোড় অর্থাৎ ৬, ৮ বছর বয়সে শিশুকে মুসলমানী হয় না। লোকশ্রুতি আছে, জোড় বছরে মুসলমানী দিলে ছেলের ভবিষ্যতে বিপদের ঝুকি থাকে। মুসলিম ধর্মীয় রীতিতে প্রত্যেক বালেগকে মুসলমানী করানোর নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। মুসলমানী বা খাৎনায় সামর্থ্য অনুযায়ী অনেকে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।

মুসলমানী করানোর পদ্ধতি :

মুসলিম রীতি অনুযায়ী দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই খাৎনা প্রচলন রয়েছে। তবে সব অঞ্চলেই খাৎনার একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সাধারণত গ্রাম্য হাজাম দিয়ে উক্ত কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে হাজামী সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তে ডাক্তারি পদ্ধতিতে সুন্নতে খাৎনা করানো হয়। মুসলমানী বা খাৎনার অনুষ্ঠানটি অনেকটা বিয়ের গায়ে হলুদের মতো করে করা হয়। বাচ্চাকে সুন্দর করে গোসল করিয়ে নতুন লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরানো হয়। তারপর পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন ডেকে মুখে ক্ষীর দেওয়া হয়। গোসলের সময় শুভাকাঙ্খীরা কাদাখেড়ও করে থাকে। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য হাজাম একটা চাকু, একটা বাঁশের শলাকা (যা পুরুষাঙ্গের বাড়তি চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কতটুকু চামড়া কেটে ফেলতে হবে তার পরিমাপের জন্য), একটি বাঁশের চিমটা, (যা দিয়ে বাড়তি চামড়া চিমতে ধরা হয়), একটা কুলোয় ঘুটের ছায় রাখা হয়। বাচ্চাকে প্রথমে একটি নকশী কাঁথার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত নানা বা দাদা একটা পান পাতা দিয়ে বাচ্চার চোখ বন্ধ করে রাখে। তাঁরা সাহস জোগানোর কাজটি করে

www.pathagar.com

থাকেন। অনেক সময় তাঁরা বাচ্চাকে বিভিন্ন তামাশামূলক শ্লোক বলে বাচ্চার মনকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যেমন :

'হাজাম বাড়ার শালা
নুনু কেটে ফেলা।'

হাজাম বাচ্চাকে পড়তে বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ এরই এক ফাঁকে হাজাম তাঁর কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেন। মুসলমানীর পর থেকে পরবর্তী সাত্‌দিন বাচ্চাকে খুব সাবধানে রাখা হয়। তাকে ভাল ভাল খাবার (কচি মুরগীর ঝোল, হাফ সিদ্ধ ডিম, ফল,পরোটা) খাওয়ানো হয়। হাজাম ছায় ও সরিষার তৈল পড়া দিয়ে যান, যা রোগীর ক্ষত স্থানের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। সাতদিন পর ক্ষতস্থান যখন শুকিয়ে আসে তখন বাচ্চাকে গোসল করানো হয়।[৭]

খাৎনা করানোর জন্য হাজাম নির্ধারিত ফিস ছাড়াও চাল, ডাল, পান-সুপারি, নতুন লুঙ্গি বকশিশ হিসেবে নিয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগেও এতদঞ্চলে মুসলমানী বা খাৎনায় সনাতনী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

তথ্যদাতা

১. আব্দুল গনি [জন্ম : ১৯৪০], (ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসক), গ্রাম: সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর
২. হানু বুড়ি [জন্ম : ১৯৩৮], পেশা : কবিরাজি, গ্রাম: গয়েশপুর, উপজেলা: জীবননগর
৩. মোঃ রমজান তরফদার [জন্ম : ১৯৪০], গ্রাম: সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর
৪. মোঃ ইউসুফ আলী বিশ্বাস [জন্ম : ১৯২৯], গ্রাম: সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর
৫. মোঃ আবুল হাসেম মোল্লা [জন্ম : ১৯৪৯], গ্রাম: সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর
৬. মোঃ সোলায়মান আলী [জন্ম : ১৯৫৭], গ্রাম:সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর
৭. মোঃ সুলতান উদ্দিন [জন্ম : ১৯৪৭], পেশা : হাজাম, গ্রাম: সুবলপুর, উপজেলা: জীবননগর

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা শব্দের অর্থ সংশয়, খটকা, সন্দেহ, ধোঁকা বা হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোক। প্রাচীন কাল থেকে ধাঁধা লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ধাঁধার ভেতর গ্রাম জনপদের লোকজীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন এবং মানসিক ক্রীড়া প্রকাশ করা হয়। ধাঁধা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় জিজ্ঞাসাকারী ও উত্তরদাতার।

এখানে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ধাঁধাগুলোর মধ্যে গ্রামের মানুষের সংসারজীবন, পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বলয়ের বহুবিচিত্র উপাদান ও অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাসের নানান রূপরেখা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। পল্লীবাংলার জনমানুষের মনে ধাঁধা বিশ্ব-জিজ্ঞাসা, জীবন-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-জিজ্ঞাসার অনেক কৌতুহল ও চিন্তার ফসলকে প্রকাশ করে।

বাংলার বৃহত্তর সমাজীবনে এককালে গ্রাম্য মজলিসে বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ও বিয়ে-শাদীর আসরে ধাঁধা বা হেঁয়ালির প্রচলন ছিল বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হিসাবে। ধাঁধা নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই সমান কৌতুহলজনক ও আনন্দ-কৌতুকের অন্যতম বিষয়। বর্তমানে বিশ্বায়নের দ্রুত অভিঘাতে ও সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে আবহমানকাল ধরে বাঙালি সংস্কৃতির এই জীবন্ত সম্পদ চর্চার অভাবে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল থেকে ধাঁধা দ্রুত হারিয়ে যেতে বসেছে। চুয়াডঙ্গা অঞ্চলের সংগৃহীত কিছু ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা হল।

১
আকাশে ঘর পাতালে দোর
বাতাসে সুখে দোলে
তার নিজের নাম উই
গাছের মাথায় ঝোলে। উত্তর : বাবুই পাখি

২
আগে হলো চাল ভাজা
তারপরে মুড়ি তারপরে খই
তারপরে কেঁচো শেষে হলো সাপ,
বাপরে বাপ, পাইনে কোনো থই। উত্তর : সজনে ফুল ও ডাটা

৩
আট ঠ্যাং ষোল হাঁটু
মাছ ধরতে যায়রে লাটু
শুকনো ডাঙায় পাতে জাল
মাছ ধরে খায় চিরকাল। উত্তর : মাকড়শা

www.pathagar.com

৪

আমার নাই তোমার নাই
বলে দিলাম বেঝো নাই । উত্তর : নাভি

৫

আমরা পাঁচ ভাই
এক সাথে খাই। উত্তর : হাতের পাঁচ আঙুল

৬

আশি কোটা নব্বই ঘর
এক কন্যার ষোল ঘর
ওড়ে ভন ভন
চলে শন শন
হাজার সেপাই
ভয় ডর নাই।
মিষ্টি ছাড়া খায় না
শত্রুকে ছাড়ে না। উত্তর : মৌমাছি

৭

আশ্চর্য দেখতে পেলে
মা ছাড়া বড় ছেলে । উত্তর : মুড়ি

৮

ইল শুকালো বিল শুকালো গাছের আগায় পানি
তার ভেতরে ক্ষীর সরবত খোদার মেহেরবানী। উত্তর : নারকেল

৯

উপরে মাটি তলায় মাটি
মাঝখানে সুন্দর বেটি। উত্তর : হলুদ

১০

উড়ে যায় পাখি
নাড়ি ধরে রাখি। উত্তর : ঘুড়ি

১১

এ পারে ঢেউ ও পারে ঢেউ
মাঝখানে বসে আছে রাঙা বউ। উত্তর : পদ্মফুল

১২

এক উঠোনে বসত করি দুই ভাই
কেউ কারো দেখা না পাই। উত্তর : চোখ

www.pathagar.com

১৩
এক দেশ টান দিলি
অন্য দেশ নড়ে। উত্তর : পানি।

১৪
এক মনে ধ্যান করে
ধ্যানে বসেই স্নান করে
স্নানেই তার আহার ভোজন
বলতে পারে সে কোন জন। উত্তর : মাছরাঙা পাখি

১৫
একই ঘরে তিন ভাই খেলে
বড় ভাই চলে ধীরে
ছোট ভাই জোরে চলে। উত্তর : ঘড়ি

১৬
একটুখানি গাছে
লাল পেয়াদা নাচে। উত্তর : পাকা ঝাল/লঙ্কা

১৭
একটুখানি মামা
গায়ে লাল জামা। উত্তর : পেঁয়াজ

১৮
একটুখানি মিঠাই
ঘর ভরে ছিটাই। উত্তর : আলো

১৯
এরাও মা-মেয়ে,
ওরাও মা-মেয়ে
ওরা তিন জন কে
বলো মুখের দিকে চেয়ে। উত্তর : মা, মেয়ে ও নাতনি

২০
কম দিলে খাওয়া যায় না
বেশি দিলে বিষ
মা বলেছে বুঝেশুনে
ঠিক মত দিস। উত্তর : লবণ

২১
কালো কালো ভোমরা কালো ঘাস খায়
রাত হলে ভোমরা বাক্সে ঘুমায়। উত্তর : ক্ষুর, কাঁচি

www.pathagar.com

২২

কাঁন্দে করে নাচায়
লাঠি মারে পাছায়। উত্তর : ঢোল

ভিন্ন পাঠ :
কাঁন্দে করে নাচে গায়
বিনা দোষে চাঁটি খায়। উত্তর : ঢোল

২৩

খাওয়ার বেলা খাই
কিন্তু তুলতে নাই। উত্তর : পটল

২৪

খাঁচার ভেতর রাজার মা
পাঁচ মাথা তার দশ পা। উত্তর : পালকি [চারজন বেহারা ও একজন যাত্রী]

২৫

গলা আছে তলা নেই
পেট আছে নাড়ি নেই। উত্তর : মাছ ধরার পলো

২৬

গাছের নাম হীরে
ফুল ধরে ফল ধরে
আরও ধরে জিরে। উত্তর : কদম গাছ

২৭

গায়ে বাঘের দাগ কাজলপরা চোখ
মাটিতি বসে বসে মুচড়ায় গোঁফ। উত্তর : কাঠবিড়াল

২৮

ঘরে থাকে দুয়োর এঁটে
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে। উত্তর : দরজার খিল

২৯

ঘরের পাশে টুলুর বাসা টুলটুলিয়ে চায়
ধরতে গেলে আঁচড়ে দেয় সে তো বড় দায়। উত্তর : গোলাপ ফুল

৩০

চার ঘড়া উপুড় করা
ভেতরে তার মধু ভরা। গরুর দুধ/ওলান

www.pathagar.com

৩১
চারি দিকে বেত কাঁটা
মধ্যিখানে সাহেব কোটা। উত্তর : আনারস

৩২
চেনা কিন্তু আজব ভারি
এক গাছে তিন তরকারি। উত্তর : কলা, মোচা থোড়

৩৩
ছড়ার উপর ছড়া
এক ছাঁচে গড়া। উত্তর : কলার কাঁদি

৩৪
ছাগলের গলায় দড়ি
সন্ধে বেলায় খোঁজ করি। উত্তর : কেরোসিনের বোতল

৩৫
ছেলের মাথায় আগুন জ্বলে
পেট গুড়গুড় করে
মনের সুখে টান মেরে যায়
ধুমো ওড়ে নিশ্চিন্তপুরে। উত্তর : হুঁকো

ভিন্ন পাঠ :
আগুন জ্বলে ধোপাখালি
ধুমো ওড়ে সেই উখলী। উত্তর : হুঁকো

৩৬
জন্ম যেথা ছেড়ে চলে দেশ-দেশান্তরে
ইচ্ছে হলে যখন তখন শতধারায় ঝরে।
পাখনা নেই উড়ে চলে মুখ নেই ডাকে
বুক চিরে আলো দেয় সবাই চেনে তাকে। উত্তর : মেঘ ও বৃষ্টি

৩৭
জাতার উপর জাতা
হাঁটুর উপর ভর
মাজায় মাজা লাগিয়ে
গলা জড়িয়ে ধর। উত্তর : কলসি

৩৮
তিড়িং বিড়িং হাত পা ভাই
দুই চোখ আছে মাথা নাই। উত্তর : কাঁকড়া

www.pathagar.com

৩৯

তুমি থাকো ডালে
আমি থাকি জলে
আমাদের দেখা হবে
মরনের কালে। উত্তর : লঙ্কা/মরিচ ও মাছ

৪০

তেল চুকচুক পাতা
ফলের উপর কাঁটা
পাকলে মিষ্টি মধুর
ভিতরে বীচি গোটা গোটা। উত্তর : কাঁঠাল

৪১

তোমার আছে তুমি ধরো না
অন্য লোকে ধরে। উত্তর : নাম

৪২

দিলি ফাঁক করে
না দিলি রাগ করে। উত্তর : ফকির ও ভিক্ষার ঝোলা

৪৩

দুই কূলে জাল ফেলে
এক কুড়ি দুই ছেলে
মাছ যদি জালে আসে
কেউ কাঁদে কেউ হাসে। উত্তর : ফুটবল

৪৪

দুই পা ধরে কাটুসকুটুস করে
কাজ শেষ করে তারে দেয় ছেড়ে। জাঁতি

৪৫

নাচি আমি মাথা কুটে থাকি বাড়ি বাড়ি
গিন্নিবান্নি লাথি মারে তবু না রা কাড়ি। উত্তর : ঢেঁকি

৪৬

নারীর হাতে নড়েচড়ে
সাতশো মুখে ঝরে পড়ে। উত্তর : চালুনি

৪৭

নিজ মুখে পরকে খাওয়ায়
ভুলেও নিজে কখনো না খায়। চামচ

www.pathagar.com

৪৮
নেড়া না গাছতলায়
মাথায় যদি পড়ে
ভেতরে নরম ক্ষীর
শক্ত হাড় ওপরে। উত্তর : বেল

৪৯
পাতা আছে গাছ নেই
কথা আছে মুখ নেই। উত্তর : বই

৫০
পাথরের চাকা পাথরের খুরি
খুরি বলে আমি এখানে ঘুরি। উত্তর : যাঁতা

৫১
পানকৌড়ি ডুব দেয়
পথের চিহ্ন রেখে যায়। উত্তর : সুঁচ দিয়ে কাঁথা সেলাই

৫২
পুব পশ্চিমে দুটি ভাই
দেখাদেখি মোটে নাই। উত্তর : কান

৫৩
পেট আছে পা নেই
মুখ আছে মাথা নেই। উত্তর : বোতল

৫৪
বাতাসে পাতা নড়ে
মাটির তলায় ডিম পাড়ে। উত্তর : গোল আলু গাছ ও আলু

৫৫
ভেতরে মিঠে উপরে তিতে
বলতে যে পারবে সে আমার মিতে। উত্তর : বাতাবি লেবু

৫৬
ভেড়ার মতো ভেবায়
বাঘের মতো বসে
ডুবে যেন পাথর
শোলার মতো ভাসে। উত্তর : ব্যাঙ

ভিন্নপাঠ :
বাঘের মতো গা

www.pathagar.com

চারটে কিন্তু পা
ভেড়ার মতো ডাকে
চুপচাপ থাকে।
লাফিয়ে সে আসে
শোলার মতো ভাসে
ডুবে যেন পাথর
পারলে তারে ধর। উত্তর : ব্যাঙ

৫৭

মন ভোলানি সুরে ডাকে দুই রঙের পাখি
উল্টে পড়ে গেলেও তারে একই নামে ডাকি। উত্তর : ঘুঘু

৫৮

মা বেঁড়ে বাপ বেঁড়ে
ছেলে বেড়ায় লেজ নেড়ে। উত্তর : ব্যাঙের বাচ্চা

৫৯

মা রইল নানির পেটে
আমি গেলাম বদরগঞ্জের হাটে। উত্তর : কলা

৬০

মাটির নিচে থাকে বুড়ি
কাপড় পরে তিন কুড়ি
কাপড় কখনো কাচে না
কাপড় তবু ময়লা হয় না। উত্তর : রসুন

৬১

মাটির ভাঁড় কাঠের গাই
গলা কেটে দুধ খাই। উত্তর : খেজুর গাছ

৬২

মা-র দুধ খায় না
তবু মা-র পাছ ছাড়ে না। উত্তর : মুরগিব বাচ্চা

৬৩

রঙে ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা
হাত নেই পা নেই নেই কোন বোঁটা। উত্তর : কুঁচ

৬৪

রাঙা বিবি জামা গায়
ভাঙলি বিবি দুখান হয়। উত্তর : মসুর ডাল

www.pathagar.com

৬৫

রাজার বাড়ির পাতিহাঁস
খায় খোলা তার ফেলে শাঁস। উত্তর : চালতা ফল

৬৬

রাতে আসে রাতে যায়
বাঘ ছাগল মানুষ খায়। উত্তর : মশা

৬৭

শিকার ধরে করে না আহার
ছুঁড়ি-বুড়ির সাজনে বাহার। উত্তর : চিরুনি

৬৮

শীতকালে খোঁজ নাই
গরমকালে হাতে চাই। উত্তর : হাত পাখা

৬৯

সকল দিকে লোহার কাঁটা
ভেতরে মিষ্টি খাবার আঁটা। উত্তর : কাঁঠাল

৭০

সবাই তারে পুড়িয়ে মারে
তবু আহা উহু করে না রে। উত্তর : মোমবাতি।

৭১

সারাদিন মাটি খায়
সন্ধ্যে হলে ঘরে যায়। উত্তর : লাঙল

৭২

সে এমন রসিক চান
নাকে বসে ধরে কান। উত্তর : চশমা

৭৩

হরিণের লেজ নেই
শিকারীর পা নেই
যে দেখে তার মাথা নেই। উত্তর : কাঁকড়া ও সাপ

৭৪

হাত আছে পা নেই
গলা আছে মাথা নেই। উত্তর : জামা

www.pathagar.com

৭৫
হাত নেই পা নেই নেই পেট পিঠ
মশলাপাতি খেয়েদেয়ে পড়ে থাকে চিৎ। উত্তর : পাটানোড়া

৭৬
হাত নেই পা নেই পিঠ দিয়ে চলে
এক দেহ দুই মাথা ভেসে থাকে জলে। উত্তর : নৌকা

৭৭
হাত নেই পা নেই যায় বহু দূরে
মানুষ নয় প্রাণ নেই কথা কয় প্রাণের সুরে। উত্তর : চিঠি

৭৮
হাত পা মাথা পিঠ চোখ কান নাই
এমন কোনো জন্তু আছে বলে দাও ভাই ॥ – মানুষ

৭৯
হাসতি হাসতি যায়রে নারী পর-পুরুষের কাছে
ঢোকার সময় কান্দাকাটি ঢুকে গেলে হাসে। উত্তর : চুড়ি

তথ্যদাতা

মন্টু মিয়া, [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রাম: বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
মনোয়ারা খাতুন, [জন্ম : ১৯৫৬], গ্রাম: বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
গোলাম ফারুক জোয়ার্দার [জন্ম : ১৯৬২], গ্রাম: সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
আমেনা খাতুন [জন্ম : ১৯৪৩], গ্রাম: বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা
রুবি খাতুন [জন্ম : ১৯৫৫], গ্রাম: ফার্মপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
আলেয়া বানু [জন্ম : ১৯৭০], গ্রাম: বেলগাছি সিগনাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা
রবগুল [জন্ম : ১৯৮৯], গ্রাম: নুরনগর, উপজেলা চুয়াডাঙ্গা সদর
আজিম শাহ [জন্ম : ১৯৫৬], গ্রাম: বহালগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর
হায়দার আলি [জন্ম : ১৯৭৮], গ্রাম: বাস্তুপুর, দামুড়হুদা
আরাফাত আলি [জন্ম : ১৯৭২, গ্রাম: চন্দ্রবাস, দামুড়হুদা
ছমিরন নেছা, জন্ম : ১৯৬২, গ্রাম: বিষ্ণুপুর, পেশা : গৃহিনী, উপজেলা দামুড়হুদা
শরিফা খাতুন, [জন্ম : ১৯৭০], গ্রাম: তিওরবিলা, পেশা : গৃহিনী, উপজেলা আলমডাঙ্গা

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

বাংলা ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান। প্রবাদ-প্রবচন প্রকাশের বিশেষ রূপ ভাষাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এর প্রয়োগ ভাষায় যেমন মাধুর্য ও সুষমা আনে, তেমনি আনে অর্থবহতা, বোধগম্যতা। নানা উপমা, উপদেশ, রস-সমৃদ্ধ বাকবিধি, সমস্যার সরলীকরণ বা ব্যাখ্যান প্রবাদ-প্রবচনগুলোর দ্বারা সাধিত হয়। এর নিজস্ব গতিময়তা আছে, উচ্চারণভঙ্গী আছে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে যথাস্থানে, যথাসময়ে এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করলে প্রবাদ-প্রবচনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বক্তব্যকে চিত্তাকর্ষক করে পরিবেশন করার জন্য যে ভাষার কারিগরি, প্রবাদ-প্রবচনে সেই কৌশল বা রীতিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শহুরে মিষ্ট ভাষায় সাধারণ বাচনভঙ্গিতে প্রয়োগ করলে প্রবাদ-প্রবচন তার মাধুর্য হারায়। গ্রাম্যজীবনের তথ্য, অনুষঙ্গ, উল্লেখ প্রবাদের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের এক প্রান্তের অধিবাসী যে উদ্দেশ্য বা ভঙ্গিতে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করে, অন্যপ্রান্তের অধিবাসীরা সেই একই উদ্দেশ্যে বা ভঙ্গিতে তার ব্যবহার করে থাকে।

প্রবাদ-প্রবচনে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বা ছবি বা ঘটনা তুলে ধরে আর তা থেকে খানিকটা রূপকের সাহায্য নিয়ে সমাজ বা জনজীবন বা ব্যক্তি-জীবনের বড় একটা সত্যের দিকে নির্দেশ করে। তাই প্রবাদ-প্রবচনের একটা বড় লক্ষণ হলো এর এই সচল সম্ভাবনা। সে তার দৃষ্টান্তকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবন সত্যের প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রবাদ-প্রবচন তার শব্দাবলির সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেনা। তা রসাভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্তি লাভ করে। আক্ষরিক অর্থ বা উপস্থিত অর্থ উত্তীর্ণ হয়ে ব্যাপক প্রয়োগের শক্তি লাভ করা যে প্রবাদ-প্রবচনের খুব বড় একটা বৈশিষ্ট্য তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রবাদ-প্রবচনে উপমা বা বর্ণনায় অপ্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের যেমন ছড়াছড়ি তেমনি গ্রাম্য অনুষঙ্গ, উল্লেখ প্রসঙ্গ ইত্যাদিতে গ্রাম্যতার আশ্রয় শুধু নয়, তার প্রকাশ রুচি বিগর্হিত শব্দাবলির প্রয়োগ কখনও শিষ্ট সমাজে আলোচনার অযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ, কখনো সম্প্রদায় বা শ্রেণি বিশেষের প্রতি অভব্য ও নির্দয় কটাক্ষে, কখনো বহুতর অন্যায় সংস্কার বা Prejudice-র প্রকাশে। ফলে প্রবাদ-প্রবচনের কথায় যেমন তাদের আগল নেই, বক্তব্যেও নেই তেমনি কোনো সংকোচ। অবলীলায় উচ্চারিত এসব প্রবাদ-প্রবচনে দেখা যায় তারই জীবন-ঘনিষ্ট বাস্তব রূপ।

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার ধ্বনি, রূপমূল, উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত কাঠামোর সৌসাম্য এবং উচ্চারণ সচেতনতা ও শব্দ-প্রয়োগে ঔচিত্যবোধের কারণে ভাষার বাগভঙ্গী খুবই জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। সেজন্য চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনের লালিত্যমণ্ডিত বর্ণময় প্রকাশ প্রাণবন্ত ও বাঙ্ময়।

www.pathagar.com

প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এর উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার নির্যাস। বক্তব্যের অবশ্যম্ভাবী প্রকাশের তাগিদে অনেক লোকজ শব্দ প্রবাদ-প্রবচনে ব্যবহার হয়ে থাকে যা সাধারণ সমাজের শালীনতা ও নাগরিক রুচিবিচারের দৃষ্টিতে অশ্লীল অভিধায় নিন্দিত হতে পারে। কিন্তু এসব প্রবাদ-প্রবচন লোকসমাজ নিজেই সৃষ্টি এবং রক্ষা করেছে। তাদের রুচি বিচারের দায়িত্ব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর লোক সমাজের উপরেই পড়ে। নাগরিক সমাজের রুচির দ্বারা এদের বিচার আসলে সম্ভব নয়।

প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারিক প্রয়োগ একালের শহুরে শিক্ষিত সমাজের মানুষের মুখে তেমন দেখা যায় না। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে এসব প্রবাদ-প্রবচন অশ্রুতপূর্ব। গ্রামীণ জনসমাজে এবং কিছু কিছু শহরবাসীদের মধ্যে এই বিশেষ বাক্যরীতি এখনও চালু রয়েছে। তবে বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে এবং বিশ্বায়নের দ্রুত অভিঘাতে ও সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন যেভাবে ঘটছে তাতে আবহমানকাল ধরে বাঙালি সংস্কৃতির জীবন্ত এই ধারা চর্চার অভাবে অচিরেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চুয়াডঙ্গা অঞ্চলের কিছু প্রবাদ-প্রচন এখানে উল্লেখ করা হল।

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী
জুতারে কয় আলমারি ॥ – অজ্ঞতা।

আকালে আমার কি করবে
চিনে-কাওনেই ছমাস যাবে। – সতর্ক আশাবাদ ব্যক্ত করা।

আকাশে গুড়গুড়ে পাখি
উড়লেই চিল হয় নাকি ॥

আগে ফাঁসি, তার পরে বিচার,
এই হল কলির আচার ॥ – যে কোনো প্রকারে উদ্দেশ্য হাসিল করা।

আদুরে বিবি চাদর গায়
ভাত পায় না ভাতার চায়। – অকর্মণ্য নারীর আকাঙ্ক্ষা।

আদ্দেক কলি মরদে বোজে
ভেঙে কলি মাগি বোজে। – অল্প বুদ্ধির নারী।

আনাড়ি বৈদ্যে জীবন নষ্ট
কাঠমোল্লায় ইমান নষ্ট। । – অপারগ লোকের দারস্থ হয়ে বিপদ ডেকে আনা।

আনাড়ির ঘোড়া আগে দৌড়ায়। – অপরিণামদর্শী।

আপনি গেলে ঘোল পায় না
চাকরকে পাঠায় দুধের তরে। – কৃপণের কাছে প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

আ'মরি মিনসে লোক হাসালে
গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে ॥

আমি যার করি আশ
সেই করে সর্বনাশ। – সুযোগ পেয়ে ক্ষতি করা।

আসকে খায় ফোঁড় জানে না ॥ অকর্মণ্য

ইন্দুরি ধান খায়
মেকুরির চোখ টাটায় ॥ – অন্যের সুখ দেখে ঈর্ষা করা।

উড়তি না পা'রে পোষ মানা ॥ – নিরূপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করা।

এই দিন থাকপে নারে
এই দিনও যাবে
কুষ্টা দিয়ে চুল বান্দে যে
সেও ভাতার পাবে। – গরীবের আশাবাদ।

এক দিনকার জ্বরে
গা দেখল পরে। – অনাকাঙ্ক্ষিত বেইজ্জতি।

এখানেও বেগুন দেখি তোরে
গাঙ পার হলি কেমন করে। – আশানুরূপ ফল না পাওয়া।

এতকাল দেখলাম ছিড়া খ্যাতা
আজকে দেখি ফুটানি কথা। – রহস্যজনকভাবে অবস্থার পরিবর্তন।

এদিকি ভাসুর ওদিকি কুকুর
যাব কোনদিক। – সব দিকেই বিপদের আশঙ্কা।

এমন কলাও জানো–
কলাঝাড়ে নাঙ সা'রে
ডা'গো ধরে টানো ॥ – ছলনাময়ী নারী সম্পর্কে মন্তব্য।

এমনি ছুঁড়ি বর পায় না
তার ওপর নানান বায়না।

ওঝা আনলাম মাকে ভাল করতি
ওঝা চায় মাকে নিকে করতি।–এক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে আরেক বিপদে পড়া।

কপালে আছে বান্দী
সেই দুঃখে কান্দি।

www.pathagar.com

কপালে আছে কঠিন ফাঁড়া
বউ গিয়ে মরে উত্তর পাড়া।

কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে
গতর গেল পাথর ধুয়ে।

কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে
খাতি বসে পাত পেড়ে।

কানা গরুর চিনা পথই ভাল।

কানাকানির পরে জানাজানি।

কানা বক শুকনো গেড়ে
খাই না খাই আছি পড়ে।

কামারের কাজ কুমোরে করে
ধরতে না জানলি পুড়ে মরে।

কাপড়ের তলে কথা কয়
সে তো মানুষের জাত নয়।

কি বুলব কলির কথা
ভাতার না ধরতি হলো প্রসবের ব্যথা।

কুয়োর ব্যাঙ সাগরের খবর জানেনা।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

কোনো কালে বিয়োবে পো
ন্যাকড়া-কানি তুলে থো॥

কোনো কাল রূপসী
জাড়কালে জাড়কাঁটা
গরমকালে ঘামাচি।

খাওয়া-দাওয়ার গন্ধে
জামুই আসে আনন্দে।

খাউনে মাগির বল বাড়ে
বসে বসে ঠ্যাং নাড়ে।

www.pathagar.com

খাচ্ছিস খা
মোটে বকিস না।

খাবা ভালো শুবা ভোগে
খ্যাতা ছাড়বা না।

খায় দায় মোছঅলা
বান্দা পড়ে দাড়িঅলা।

খায় দায় হাড় চোষে
নড়ে না কপাল দোষে।

খোঁড়া ভাতার বুড়ো বিয়াই
কোনো দিকি সুখ নেই।

গাঙ পার হয়ে ভেলায় লাথি।

গুরু মোতে দাঁড়িয়ে
শিষ্য মোতে গাছে চড়ে।

গুড়ের গন্ধ পেয়ে
পিঁপড়ে আসে ধেয়ে।

গেছো ইঁদুর লেজ দেখলিই চিনা যায়।

ঘটকালি করতি যাইয়ে
নিজি নিকে করে আসা।

ঘরের ঘি পেলে
প্রদীপ দেয় জ্বেলে।

ঘর জামুই [জামাই] বান্দির পো
ভাত খাস তো থালা ধো।

ঘর যাওনী সরে পড়ে
দুয়োর ধরনী ধরা পড়ে।

ঘরের মানুষ রইল ঘরে
বউ নিয়ে পালালো চোরে।

চাষার কেবল এগারো মাস দুঃখ
আর সকল মাস সুখ।

www.pathagar.com

চিৎ করলি বুক খান
উপুড় করলি পিট খান।

চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা।

ছাগলের কল্যাণে হাতি মানা।

ছিনালে মাগি আর থাড়ো গাই
গেরস্তর আর বাঁচন নাই।

ছিনালের চাল
রাঁধে মোরগ বলে ডাল।

জাতে জাতে ভাতে ভাতে
ইঁদুরির বিয়ে ইঁদুরির সাথে।

জায়গা জেনে বসি
জমি চিনে চষি।

জুলাপ খায় কিডা
আর হা'গে মরল কিডা।

জ্বরের (জ্বরকে) ডরাই নে,
কাঁপুনির (কাঁপুনিকে) ডরাই।

ডরালি ডর
না ডরালি কিসির ডর।

ঢাক বাজিয়ে ইঁন্দুর ধরা।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি।

ঢাকের বাদ্যি থামলি মিঠে।

ঢুলি যদি ঢোল না পায়
নিজির প্যাট নিজি বাজায়॥

তলে তলে তল গুজা
বিবি করে তিরিশ রোজা।

তাল বাড়ে ঝোপে
খেজুর বাড়ে কোপে।

www.pathagar.com

তুই পড়িস পড়
আমার কলসি যেন না ভাঙে।

তুই যে গেড়ের মাছ
আমি সেই গাঁয়ের চিল।

তেল ঠাপায় না
খোলির সের আট আনা।

থাকে যদি চূড়ো বাঁশি
মিলবে কত রাধা হেন দাসী ॥

দরবারে মুখ না পায়
ঘরে এস মাগ ঠ্যাঙায়।

দায় ধার নেই
আছাড়িতে জুত আছে।

দাঁতের নাম-বংশ নেই
চিড়ে খাওয়ার যম।

দিনির বেলা হরি হরি
রাত হলি কুমড়ো চুরি।

দুখীর কপালে সুখ নেই
বিয়ে বাড়িতেও ভাত নেই।

ধর্মের ঘরে কুঁড়ের বাথান।

ধেয়ে এসে খেয়ে যায়
এঁটো পাতটাও নিয়ে যায়।

নতুন নতুন পোয়াতি
না জানে বিয়াতি।

নষ্ট মাগির বড় গলা
শুনতে কান ঝালাপালা।

নাও ঘোড়া নারী
যে চড়ে তারই ॥

নাক কাটা শউর
কান কাটা জামুই।

www.pathagar.com

নাটানে গরুর কাটানে লাথি।

নিজিও লেকপে না
লোকের ছেলের দুয়াত ভাঙবে।

নিজির গু কুমড়ো বড়ি
পরের গু'র গন্ধে মরি।

নেচে মরে রামু
চিড়ে খায় শামু।

পরবার নেংটি নেই
দরগায় খাতি চায়।

পরের বাড়ির পিঠে
খাতি বড় মিঠে।

পুতির মুতি কড়ি
মেয়ের গলায় দড়ি।

পুবে আড়া
ভরবে গাড়া ॥

প্যাটে খিদে থাকলি পরে
শুধো ভাতও রোচে।
বল্লায় কামড়ালি
বুড়োও নাচে ॥

ফকিরির সাথে নিকে করে
কত চালির ভাতই না খালাম।

ফরসা কাপড়ে ভরসা বাড়ে।

বউ এল ঘরে
সুখ গেল উড়ে।

বউয়ের উপর হয়ে রুষ্ট
বেরাল মেরেই সন্তুষ্ট ॥

বউটি ভাল বটে
ঠোকনা খা'য়ে বাটনা বাটে।

www.pathagar.com

বড় হাঁড়ির আমানিটুকুও মিঠে।

বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে।

বাজে কাজে কাটনা কামাই।

বান্দেরের হাতে পাকা আম
বান্দর বলে রাম রাম।

বাপের কালে ঘোড়া নাই
কান্দে চড়ে লাগাম চাই।

বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নি।

বাড়িঅলার বাড়ি নয়
উঠোন অলার ফটফটি।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচাজ্জি।

বিশে বিদ্যা তিরিশে ধন
নইলে পস্তায় সারা জীবন।

ভাত পায়না আমড়া চাটে
হাগতি গেলি পুটকি ফাটে।

ভাত পায় না চায় নাগর
আমানি খা'য়ে প্যাট ডাগর।

ভাতের খিদে কি ভুজোয় মরে।

ভাগের কাঁঠাল জ্বর গায়ে খাব।

ভাসুরির আমার যেমন বুদ্দি
ধান লাগায় চাঁ'চোর মদ্দি।

ভিটে বেচে পিঠে খাওয়া।

মরদ বড়ো তেজি
মারতি রোখেন বেজি।

মশা মারতি গালে চড়।

মাগির ভাতার মরদ
মরদের ভাতার কড়ি

www.pathagar.com

যার বলে লড়ি।

মাচায় ধান নেই
ডোলে সলা ইন্দুর।

মাছ চেনে গভীর জল
পাখি চেনে উঁচু ডাল।

মাদুর নেই তার উত্তরে শিথেন।

মামুগের ঘরে আগুন লা'গেছে
এই সলোকে পার হ'।

মুখে যার ছাগল দাড়ি
খায় সে আবার পান-সুপারি।

যমের মা'র গঙ্গা স্নান।

যার গোলায় ধান
তার গেড়েয় কৈ মাছ।

যার ঘুড়া তার ঘুড়া নয়
চ্যারাকালির ঘুড়া ॥ – স্বামীর ওপর বউয়ের মাতব্বরি।
চ্যারাকালি> চেরাগউলি>চেরাগঅলা>চেরাগওয়ালা। চেরাগ নারী যৌনাঙ্গের প্রতীক।

যার লাগি করি জো
সে বলে পৈতেনে শো।

যা শত্রু পরে পরে
মোর গায়ে যেন ধুলো না পড়ে।

যে বলে মরতে জানি
সমুদ্র তার হাঁটু পানি।

যে বাড়ি খাইছি কানে
আর কি যাই গেরস্থর ধানে।

যেমন মা তেমন ঝি
তেমনি দেখো নাতনিটি ॥

লাউ কুমড়ো থাকতি
কনে সর্ষের মধ্যি তেল।

www.pathagar.com

শুক ম'লো মুখির দোষে
শালিক ম'লো সেই তরাসে।

শুরুতিই সাঁতার জল
পার হই কেমনে বল।

সকল নোড়াই শালগ্রাম হলি
হলুদ বাটি কিসে।

সজনে শাকে নুন জোটে না
পান্তা ভাতে ঘি।

সৎ মা'র মুখ নাড়া
মরার উপর যেন খাঁড়া।

সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া
অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুড়া।

সতীন ম'ল ভাল হলো
দুকোন খ্যাতা আমার হলো।

সর্ব কর্মে রাধা
ভাতারকে ডাকে দাদা।

সাত বাড়ি না বেড়ালি
মেকুরির ছা'র চোখ ফোটে না।

সাদরের পান্তাও ভালো
অনাদরের ঘি ভাতও ভালো নয়।

সাপের কাছে বেজি নাচে
তবে জানি ওঝা আছে।

সুন্দুরী বউয়ের নানান গিদেনি।

সে আরেক জ্বালা
অজাত বড়ো হলি বাপকে ডাকে শালা।

সোনার থালে দুধভাত
খাতি না জানলি উৎপাত।

হাতে বৈঠা ঘাটে নাও ॥

www.pathagar.com

তুলনীয় : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ॥

হাবা ছেলে নাদান ভাই
তার কোনো নিদান নাই।

হাবাতে গেল ভিক্ষে করতি
কুকুর লাগলো পাছে।

হা'গে খায় খাইয়ে মোতে
তারে দেখলি জোমে কোঁতে।

তথ্যদাতা

মনোয়ারা খাতুন [জন্ম : ১৯৫৬], গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর
মন্টু মিয়া [জন্ম : ১৯৫৪], গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর
আলেয়া বানু [জন্ম : ১৯৭০], গ্রাম : বেলগাছি সিগনাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা সদর
গোলাম ফারুক জোয়ার্দার [জন্ম : ১৯৬২], গ্রাম : সরিষাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর
আমেনা খাতুন [জন্ম : ১৯৪৩], গ্রাম : বেলগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর
রুবি খাতুন [জন্ম : ১৯৫৫], গ্রাম : চুয়াডাঙ্গা ফার্মপাড়া, চুয়াডাঙ্গা সদর
রবগুল [জন্ম : ১৯৮৯], গ্রাম : নুরনগর, উপজেলা চুয়াডাঙ্গা সদর
আজিম শাহ [জন্ম : ১৯৫৬], গ্রাম : বহালগাছি, চুয়াডাঙ্গা সদর
সুফিয়া খাতুন [জন্ম : ১৯৯১], গ্রাম : ঘোষবিলা, উপজেলা আলমডাঙ্গা
শরিফা খাতুন, [জন্ম : ১৯৭০], গ্রাম : তিওরবিলা, পেশা : গৃহিনী, উপজেলা আলমডাঙ্গা
রোজেকা খাতুন [জন্ম : ১৯৯২], গ্রাম : ঘোষবিলা, পেশা : ছাত্রী, উপজেলা আলমডাঙ্গা
খাদিজা খাতুন, [জন্ম : ১৯৮২], গ্রাম : বড়বলদিয়া, উপজেলা দামুড়হুদা
ছমিরন নেছা, [জন্ম : ১৯৬২], গ্রাম : বিষ্ণুপুর, পেশা : গৃহিনী, উপজেলা দামুড়হুদা

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালির মানস গঠন ও জীবন-যাপনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। নানা রকম আধি-ব্যাধি, কলেরা-বসন্ত, মহামারী-মড়ক, রোগ-শোক, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা, দৈব-দুর্বিপাক, ফসল উৎপাদনে নানা রকম দুর্যোগ অকস্মাৎ জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্থ, বিপদ-সংকুল ও দিশেহারা করে ফেলেছে। প্রবীণ, প্রাজ্ঞ এবং লোকজ্ঞানী মানুষরাও এসব ক্ষেত্রে কোনো দিশারির ভূমিকা পালন করতে পারেনি। মানুষের দুঃখ ও গ্লানিময় জীবনের এ সব ক্ষেত্রে সে কোন কার্যকারণ খুঁজে না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার লোকজনও নানারকম অশুভ শক্তি ও অলৌকিক প্রভাব সম্পর্কে নিয়তি নির্ভর অন্ধ বিশ্বাসের উপর আস্থা রাখে।

জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তাই জীবনের নানা ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার মানুষজনও নানারকম লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার অনুসরণ করে থাকে। সাধারণভাবে মনে করা হয় সামনে দিয়ে কাল বিড়াল গেলে অমঙ্গল হয়। বেশি করে চা খেলে গায়ের রঙ কাল হয়। বাঁ হাতের তালু চুলকালে টাকা আসার সম্ভাবনা থাকে। কেউ যদি কারো শরীর ডিঙিয়ে যায়, তা হলে দেহের বৃদ্ধি থেমে যায়। শূন্যে কাঁচি চালালে ঝগড়া হয়। মাথার উপর দিয়ে কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলে অমঙ্গল হয়। সন্ধ্যার পরে নখ কাটতে নেই। বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটতে নেই। রাত্রে শিস দিতে নেই। শিশুর গালে কাল টিপ দিলে কুনজর লাগেনা। নুন হাতে চুল ধরলে চুল পেকে যায়। শনিবারের দিন লোহার জিনিস কিনতে নেই। সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময়ে গর্ভবতী মহিলার বাইরে যেতে নেই। চোখের পাতা কাঁপা কুলক্ষণ। কারো হেঁচকি উঠলে অন্য কেউ তাকে স্মরণ করছে বিশ্বাস করা হয়। সকাল বেলা জোড়া শালিক দেখলে সেদিন কুটুম আসতে পারে। কোনো কাজে রওনা হওয়ার সময়ে টিকটিকির ডাককে মঙ্গলজনক মনে করা হয়। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিনে ডিম বা কলা খাওয়া ঠিক নয়, তা হলে পরীক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গামছা এবং গেঞ্জি সেলাই করে পরতে নেই। রাত্রিবেলা আয়নায় মুখ দেখলে জ্বর হয়। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়, তাই ভাঙা আয়না ফেলে দিতে হয়। হিন্দু সমাজের বিবাহাদিতে পাত্রপাত্রীর মিল-অমিলের বিষয়ে ঠিকুজি কোষ্ঠী গণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। রাত্রিবেলা সুঁচ, হলুদ এবং লবণ ধার দিতে নেই। ঘরে চাল না থাকলে ভিক্ষুককে চাল নেই না বলে বলা হয় চাল বাড়ন্ত। ঘর ঝাঁট না দিয়ে দিনের কোনো কাজ শুরু করা হয় না। ফকিরকে ঝোলার মধ্যে ভিক্ষার চাল ঢেলে দিতে হয়। ঘর ঝাঁট না দিয়ে ফকিরকে ভিক্ষা দেওয়ার নিয়ম নেই। ভিক্ষা দিতে গিয়ে দুচার দানা চালও মাটিতে ফেলতে নেই, বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল মাটিতে পড়লে তারা ভাতের কষ্ট পাবে। স্বামীর খাওয়ার আগে মেয়েরা কখনও অন্ন গ্রহণ করত না। মেয়েরা স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির কোনো গুরু জনের নাম

www.pathagar.com

উচ্চারণ করত না। প্রয়োজনবোধে নামের হেরফের করে ব্যবহার করত। নতুন বউ বা বিবাহযোগ্যা কন্যা বা ছোট ছেলেমেয়ে নতন কাপড়ের আঁচল বা কোনো সামান্য অংশ পুড়িয়ে নিয়ে পরলে কুনজর লাগা বা কোনো অনিষ্টের ভয় থাকে না। বিয়ের সময়ে বৃষ্টি হলে ধরে নেওয়া হয় বর বা কনে ছোটবেলা ব্যাঙ মেরেছে। বৃষ্টির সময়ে রোদ উঠলে খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়। ভরা কলস দেখে যাত্রা করা শুভ এবং শূন্য কলস দেখলে যাত্রা অশুভ। ভাঙা কুলো ব্যবহার করতে নেই। কুকুর ঘাস খেতে থাকলে দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা থাকে। বালিশের উপরে বসতে নেই, সেই বালিশে শোয়ার পরে ঘাড়ে টনটনে ব্যথা হয়। সকালবেলা কৃপণ কিংবা নিঃসন্তান লোকের সাথে দেখা হলে সারাদিন তার ভাল যাবে না। সাপকে সাপ না বলে পোকা বা লতা বলা হয়। কান্নার সুরে কুকুর ডাকলে দেশে রোগ-বালাইয়ের সম্ভাবনা থাকে। ফসল ক্ষেতে মেয়ে লোকের যাওয়া নিষেধ। পটল, বেগুন বা লাউ ক্ষেতে মরা ঘোড়া কিংবা গরুর মাথা টাঙিয়ে রাখলে ফলন ভাল হয়। ফসল ক্ষেতে যাতে কু নজর না লাগে সে জন্য একটা কালো হাঁড়িতে চুন মাখিয়ে ঢ্যারা দাগ দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়।

বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয় শনি সাত, মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। অর্থাৎ শনিবারে বৃষ্টি শুরু হলে সাত দিন স্থায়ী হবে, মঙ্গলবারে হলে তিন দিন আর অন্যান্য দিন এক দিন করে বৃষ্টি হবে। আকাশে রঙধনু দেখা গেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

নতুন গাছে ফল ধরলে, নতুন গরুর হলে দুধ দোয়ানোর পরে মসজিদে ইমাম সাহেবকে দেওয়া হয়। বাড়িতে বসবাসকারীদের কল্যাণের জন্য নতুন বাড়িতে ওঠার সময়ে মিলাদ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করলে পাড়ায় মিষ্টি বিলানো হয়। বাড়িতে নতুন বউ এলে বা ছেলে-মেয়ে হলেও এভাবে পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়ে আনন্দ উদযাপন করা হয়। অবশ্যে এর পিছনে মঙ্গল কামনা ও দোয়া প্রার্থনার ইচ্ছাও থেকে যায়।

সাধারণত মনে করা হয় নিরক্ষর মানুষই বুঝি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার মেনে চলে, তা সঠিক নয়। আধুনিক যুগের শিক্ষিত মানুষও অনেক সময় কমবেশি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রভাবমুক্ত নয়। আগের দিনে মানুষ মূলত অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে এবং কার্য-কারণ-সূত্র নির্ণয় করতে না পেরে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার মেনে চলত, কিন্তু বর্তমানে বাঙালি জাতি আধুনিক যুগে প্রবেশ করেও সংঘাতময় জীবনের জটিলতা, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যুগযন্ত্রণা, জীবনের সাফল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, ব্যক্তিজীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সন্দিহান ইত্যাদি কারণে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে পুরোনো যুগের বহু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিতে পারেনি।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

মানুষ আদিকাল থেকে বেঁচে থাকার জন্য নানা কৌশল, অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার কর্ম জীবনকে সহজ করে তুলেছে। সেই অর্থে সাধারণভাবে এই ব্যবহারিক ক্রিয়া পদ্ধতিকে লোকপ্রযুক্তি বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনে এভাবেই কর্মজগতে স্বাভাবিকতা এসেছে। বর্তমান যুগে শহরে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবনযাত্রার অনেক উন্নতি ও সুবিধা হয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বিশাল ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনও লোকপ্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। কৃষি সংক্রান্ত চাষাবাদে, শস্য মাড়াই, ফসলের জমিতে সেচ কাজে, রান্নাবান্নাসহ গৃহস্থালির নানান কাজে, মাছধরার কাজে ব্যবহারের নানান উপকরণ, নৌকা ও জলযান সংক্রান্ত এবং তাঁত ও বয়ন শিল্পসহ জীবনযাত্রার বহুক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্বত্রই সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে লোকপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১. কৃষিকাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

জমিতে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে জমি চাষের জন্য লাঙল অপরিহার্য উপাদান। লাঙলের সূত্রে জোয়াল, জমি সমতল করার কাজে মইয়ের ব্যবহার, মাটির মোটা এবং বড় বড় খণ্ডকে ছোট করার জন্য মুগুর, ক্ষেতের চারা পরিচর্যার জন্য বিদে [বিদা], ফসলের আগাছা পরিষ্কার করার জন্য নিড়ানি, নিড়ানোর সময়ে রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথাল, ক্ষেতের মাটি কোপানো বা সমান করা, জমির আইল দেওয়া বা বাঁধ বাঁধার কাজে কোদাল ব্যবহার করা হয়। সেঁউতি বা দোন-এর সাহায্যে নিচু জায়গা থেকে ধানসহ নানান ফসল ক্ষেতে পানি সেচ দেওয়া হয়। পরিণত ফসল কাটার জন্য কাস্তে, মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে বয়ে আনার জন্য গরুর গাড়ি, সেই সূত্রে গোরুর চাকা, ইত্যাদি অপরিহার্য লোকপ্রযুক্তির উপরকণ যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় ক্ষেতের ফসলে যাতে অপদৃষ্টি না লাগে তার জন্য চাষিরা খড়কুটোর তৈরি ছেঁড়া-জামা গেঞ্জিপরা, চুন-কালি মাখা মানুষের মাথাঅলা এক কাকতাড়ুয়া বানিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে অনেক সময় বসিয়ে দেয়। একে প্রতিরোধক লোকপ্রযুক্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে।

লাঙল

লাঙল ভূমি চাষে ব্যবহার্য অন্যতম দেশীয় সরঞ্জাম। বহুকাল আগে থেকেই লাঙল সনাতনী কৃষি উৎপাদনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সাধারণত দুটি শক্ত-সমর্থ গরু দ্বারা এটিকে টানা হয়, মাঝে মাঝে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষও এটিকে টেনে থাকে। এখনও বিদ্যমান পোড়ামাটির প্লেটে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলায় লাঙল ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। লাঙলে কয়েকটি অংশ

www.pathagar.com

রয়েছে যেমন: হাতের মুঠো, হাতল, প্রধান দন্ড, ফলা, খিল, ঈশ, কীলক ইত্যাদি। লাঙল টেনে এর সরু ফলা দিয়ে মাটি খুড়ে জমি চাষযোগ্য করে তোলা হয়। ছুতার লাঙল তৈরি করে। সাধারণত বাবলা কাঠের গুড়ি দিয়ে লাঙল নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারসহ যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে লাঙল এখন বিলুপ্তির পথে।

জোয়াল

হালচাষের একটি অপরিহার্য একটি উপাদান হলো জোয়াল। এটি যানবাহনের কাজে গরুর গাড়ির সাথেও ব্যবহৃত হয়। চারহাত লম্বা বাঁশের দন্ড বা কাঠ দিয়ে জোয়াল তৈরি করা হয়। এর দু'প্রান্তে দু'টি ছিদ্র থাকে এবং মাঝখানে দুটি ছিদ্র করে খিল লাগানো থাকে। প্রান্তের ছিদ্র দিয়ে বলদ জুড়ে দিয়ে দড়ি এমনভাবে খিলের সাথে যুক্ত করা হয় যাতে গরু বেরিয়ে যেতে না পারে।

বিদা

বিদা জমিতে নিড়ানি ও মাটিকে সহজ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। চারা অবস্থায় ধান-পাটের জমির আগাছা উপড়ে ফেলার কাজে বিদা অপরিহার্য। কোনো কোনো অঞ্চলে এটিকে আঁচড়া বলে। চার বা সাড়ে চার ফুট লম্বা একটি কাঠের ফ্রেমের নিচের দিকে ৪/৫ ইঞ্চি পরিমিত ১৮-২০টি লোহার খিল লাগিয়ে বিদা তৈরি করা হয়। খিলগুলো সামনের দিকে ঈষৎ বাঁকানো থাকে। লাঙলের হাতলের মতো একটি হাতল ও মুঠো থাকে যা ধরে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মইয়ের মতো বলদ দিয়ে টানানো হয়।

মই

শস্য জন্মানোর জন্য মাটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচর্যার জন্য মই দেওয়া হয়। ভূমিকর্ষণ, বীজতলা প্রস্তুতকরণে মাটিকে গুঁড়া, মসৃণ ও দৃঢ় করে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে বা জমির পৃষ্ঠে ছড়ানো বস্তুকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। বাংলাদেশের কৃষকরা শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে জমি প্রস্তুত করতে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন যন্ত্রপাতি, যেমন কোদাল, গরু বা মহিষে টানা বাঁশের মই ইত্যাদি ব্যবহার করে। সাধারণত তিন গজ লম্বা একটি বাঁশের দন্ড সমান দুই ফালি করে চেঁছে মসৃণ করে সমান্তরালভাবে খিল লাগানো হয়। খিলের মাঝখানে চতুর্ভূজ আকৃতির তৈরি হয়। মইয়ের দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে জোয়ালের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এরপর কৃষক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গরু তাড়াতে থাকেন। ফলে ঢেলাগুলো গুড়ো হয়ে যায়। কৃষিকাজ ছাড়াও গাছে বা উঁচু স্থানে উঠার কাজে মই ব্যবহার করা হয়। কৃষক নিজেই মই তৈরি করে থাকেন।

মুগুর

মুগুর কৃষি জমিতে ঢেলা ভাঙার কাজে ব্যবহার করে থাকে। একখণ্ড চৌকোণা কাঠের মাঝখানে ছিদ্র করে একটি বাঁশের দণ্ড শক্তভাবে লাগিয়ে মুগুর তৈরি করা হয়। এই মুগুর দিয়ে সজোরে মাটিতে আঘাত করে ঢেলা চূর্ণ করা হয়। মুগুর নিয়ে বহুল প্রচলিত আছে, 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর।'

www.pathagar.com

মাথাল

বাংলাদেশের সর্বত্রই মাথালের ব্যবহার দেখা যায়। বাঁশের সরু বেতি তুলে বুনন প্রক্রিয়ায় মাথাল তৈরি করা হয়। উপরের কেন্দ্র থেকে নিচের দিকে সম্প্রসারিত করে তা বুনা হয়। প্রান্তভাগ বাঁশের মোটা বেড় দিয়ে মোড়ানো হয়। যাতে মাথাল শক্ত ও মজবুত হয়। কোথাও পাটির মতো আবার কোথাও ক্রস পদ্ধতিতে বুনা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থ নিজেই মাথাল তৈরি করে। আবার হাটে-

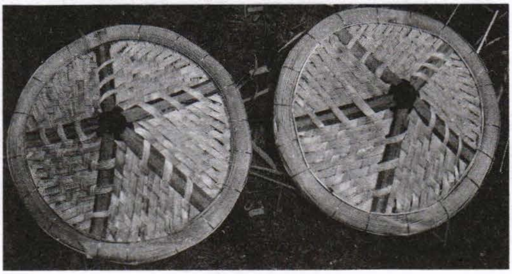

বাজারেও মাথাল কিনতে পাওয়া যায়। তালপাতা, নারকেল পাতা আবার সম্প্রতি পলিথিন দিয়ে মাথালের ছাওনি তৈরি করা হয়। এ অঞ্চলে তালপাতার 'বাদাই মাথাল' নামের একধরণের মাথাল পাওয়া যায়। বাঁশের কাবারি দিয়ে কাঠামো তৈরি করে তালপাতার ছাওনি দিয়ে 'বাদাই মাথাল' তৈরি করা হয়।

নিড়ানি

কৃষি উপকরণ হিসেবে নিড়ানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জমির আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি আলগা করার কাজে নিড়ানি ব্যবহৃত হয়। এক দেড় ফুট লোহার চিকন দন্ডের অগ্রভাগ কাস্তের মতো বাঁকিয়ে নিড়ানি তৈরি করা হয়। এর বাট হিসেবে এক খন্ড কাঠ ব্যবহার করা হয়। অঞ্চল ভেদে এবং কাজের ধরণ অনুযায়ী নিড়ানি ছোট বড় উভয়ই দেখা যায়।

কাস্তে

সাধারণত ধান, গম বা অন্যান্য ফসলাদি কাটার কাজে কাস্তের বিকল্প নেই। কোনো অঞ্চলে এটিকে হেসো বলে। কাস্তে দেখতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির। নিড়ানির মতো এরও একটি হাতল বা বাট থাকে। কাস্তেতে করাতের মতো ছোট ছোট খাঁজকাটা ধার করা থাকে। ফলে ফসলের ডাটা শক্ত হলেও সহজেই কাটা যায়।

শস্য মাড়াই প্রযুক্তি

চাষিরা ক্ষেত থেকে পাকা ধান, মসুরি, ছোলা, সরিষা, গম ইত্যাদি গাছ থেকে ফসল আলাদা করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও কৌশল ব্যবহার করে। শস্য ঝাড়াইয়ের জন্য গরুর সাহায্যে মলন দেওয়া, কাঠের তক্তা বা বাঁশ দিয়ে তৈরি মাচা ব্যবহার করা হয়। মলনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৭টি গরুর দল একসাথে বেঁধে একটি খুঁটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। ফলে গরুগুলো একটি বৃত্তে ফসলের উপর দিয়ে ঘুরতে থাকলে গরুর

www.pathagar.com

পায়ে খুরে পিষ্ট হয়ে গাছ থেকে শস্য দানা ঝরে পড়ে। এটাকে মলন দেওয়া বলে। এছাড়া বাঁশের চ্যাগারি তৈরি করে বিচালি থেকে ঝাড়া দিয়েও ধান বা গম জাতীয় শস্য আলাদা করা হয়। এসব মাড়াই প্রযুক্তির সাথে আরও যেসব লৌকিক উপাদান ব্যবহার করা তা নিম্নরূপঃ

কান্দালি

ধান মাড়াই, গোছানো ধানের খড় বা পোয়াল রোদে শুকানোর পর তা গোছানোর কাজে কান্দালি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত চার ফুট দৈর্ঘ্য বাঁশের আগা বা চিকন বাঁশের অগ্রভাগে ৯ ইঞ্চি মতো বাঁকানো লোহার শলাকা গেঁথে কান্দালি তৈরি করা হয়। দুই হাতে কান্দালি ধরে এর আগার বাঁকা অংশ দিয়ে ধান বা খড়গুচ্ছ টোকা বা ঝাড়া দিয়ে এপিট ওপিট করে উল্টে দেওয়া হয়। কর্মকারের বানানো লোহার ফলির সাহায্যে গৃহস্থ নিজেই কান্দালি তৈরি করে থাকে।

কুলা

দৈনন্দিন জীবনে সাংসারিক নানা কাজে কুলার ব্যবহারের অন্ত নেই। চাল,ডালসহ বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করে ঝেড়ে নেওয়ার কাজে কুলার বিকল্প নেই। অল্প পরিমাণ দ্রব্যাদি রোদে শুকানোর কাজে, ঢেঁকিতে ভানা-কোটার শেষে অবাঞ্ছিত খোসা, ভুসি, তুষ ঝাড়ার কাজে কুলা অপরিহার্য। ধান, ছোল, গম, সরিষাসহ সকল ধরনের শষ্য ঝাড়াই-মাড়াইয়ের শেষে পরিষ্কার করার কাজে কুলা ছাড়া সম্ভব নয়। লৌকিক সংস্কৃতিতে মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে কুলার ব্যবহারও যথেষ্ট। চিত্রিত ডালায় ও কুলায় করে বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো হয়। কুলায় প্রদীপ ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজিয়ে বর-বধূকে বরণ করা হয়। গৃহসজ্জার শৌখিন দ্রব্য হিসেবেও কুলা ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়। ছোট মেয়েরা কুলা খেলনা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কুলা তৈরি করা হয় বাঁশের সরু বেতি ও শলা দিয়ে।

হারপাট

হারপাট ব্যবহার করে উঠানে ধান বা শস্য ছড়ানো এবং গোছানোর কাজ করা সহজ হয়ে থাকে। হারপাট কাঠের এক খণ্ড তক্তা ও বাঁশদন্ড দিয়ে তৈরি অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি হাতিয়ার। দেড় ফুট লম্বা, এক ফুট উঁচু ও দুই ইঞ্চি পুরু এরূপ একটি তক্তা বা কাঠের

www.pathagar.com

উপর একটি গোলাকার ছিদ্র করে পাঁচ ছয় ফুট লম্বা একটি বাঁশের দন্ড হাতল হিসেবে লাগিয়ে হারপাট তৈরি করা হয়। শস্য রোদে শুকানো, নাড়াচাড়া করা ও ছড়িয়ে দেওয়া এবং গোছানোর কাজে এটি মূলত ব্যবহার করা হয়।

ঠুসি

গরু-বাছুর মাঠে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যাতে ক্ষেতের ফসলাদি খেয়ে নষ্ট না করতে পারে সে জন্য মুখোশ বা ঠুসি ব্যবহার করা হয়। বাঁশ, বেত বা পাটের দড়ি দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়। অঞ্চল ভেদে এর আকার আকৃতি এবং নাম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

গোলা

গ্রামাঞ্চলে ফসল সংরক্ষণের জন্য ঘর হিসাবে গোলা ব্যবহৃত হয়। ধনী গৃহস্থ বাড়িতে এক বা একাধিক গোলা দেখা যায়। গোলা নির্মাণের প্রধান উপকরণ হলো বাঁশ, খড়, টিন বা খড়, কাতা (নারিকেলের ছোবড়ার তৈরি দড়ি) বা তার। বাঁশের চটা ও বাতা দিয়ে

গোলা

একটি বৃত্তাকার বেড় তৈরি করা হয়। এর দুই মুখ সংযুক্ত করে উপরে ছাউনি দিয়ে গোলা তৈরি করা হয়। একটি গোলায় ৪০-৫০ মন ধান বা ফসল রাখা যায়। আবার গোলার বিকল্প হিসেবে ডোল, জালা, মাটির কোলা, মটকাও ব্যবহৃত হয়। এতে সাধারণত ২/৩ মণ থেকে আকৃতি অনুসারে ৮-১২ মণ ধান সংরক্ষণ করা যায়।

বিচুলির গাদা/পোয়ালের পালা

ধান পাকার পরে সারি সারি আটি করে ধান কেটে জমিতে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পরে শুকনো ধান গাছ ছোট ছোট আটি করে বিচুলি বাঁধা হয়। বাঁশের তৈরি ঝাড়ন বা তক্তা অথবা আটি বাঁধা ধান সহজে আছাড় মেরে ঝেড়ে নেওয়া যায় এমন জিনিস ব্যবহার করে ধান ঝাড়া হয়। ধান ঝেড়ে নেওয়ার পরে আটি-বাঁধা ধান গাছগুলোকে বিচুলি বলে। বিচুলি উত্তম পশুখাদ্যের প্রধান উপাদান। এই বিচুলি সারা বছর গরু-বাছুরকে খাওয়ানোর জন্য বাড়ির উঠোনের একপাশে উঁচু জায়গায় গোলাকার বা চৌরি ঘরের মতো করে গাদা দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ফলে বিচুলি গাদায় বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ঢুকে বিচুলি নষ্ট করতে পারেনা। বিচুলি গাদা দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা ও নান্দনিকতার ছাপ থাকে।

www.pathagar.com

বিচুলির গাদা

ধান মাড়াইয়ের পর ধানের খড় বা পোয়াল রোদে শুকিয়ে পালা দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। পোয়ালও গরুর উত্তম খাবার। বাড়ির উঠোনের একপাশে সুবিধা মতো উঁচু জায়গায় গোলাকৃতি বৃত্তাকারে থরে থরে পোয়াল সাজিয়ে রাখা হয়। এর উপরের দিকটা গম্বুজাকৃতির হয় যাতে সহজে বৃষ্টির পানি ভেতরে না ঢুকতে না পারে। পালার মাঝখানে একটি বাঁশের খুটি পুঁতে রাখা হয়। ফলে ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকে।

ছোলা, মসুরি, অড়হর, মটর, খেসারি প্রভৃতি রবিশস্যের ভূষিও গরুর উত্তম খাদ্য। বাঁশ-খড়ের ভূষিঘর তৈরি করে এসব সংরক্ষণ করা হয়।

২. গৃহকাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে বহু ধরনের লোক অস্ত্রপাতি, যেমন দা, বটি, ছুরি-কাঁচি, কুরুনি, কুড়াল, কাস্তে, নিড়ানি, খন্তা, শাবল, হেঁসো, হাতুড়ি, বাটালি, ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার হয়, তেমনি আত্মরক্ষা, পশু-পাখি ও মাছ শিকার, ইত্যাদির জন্যও প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে নানা ধরনের লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। নাগরিক জীবনের সুবিধা সম্বলিত বিচিত্র জিনিসের ব্যবহারে আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়লেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকপ্রযুক্তির এ সব বহু ধরণের জিনিসের ব্যবহার এখনও চালু রয়েছে।

কুড়াল

হিন্দু পুরাণ মতে পরশুরামের অস্ত্র ছিল কুঠার। তিনি এই অস্ত্রের সাহায্যে কয়েকবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরশু শব্দের অর্থ কুঠার। প্রায় সব শ্রেণির গৃহস্থ সংসারের টুকিটাকি কাজে কুঠার ব্যবহৃত হয়। গাছ, ডালপালা কাটা ও ফাড়ার কাজে এটি খুবই জরুরি অস্ত্র। একটি লোহার ফলা ও বাঁশ বা কাঠের দন্ড কুড়াল তৈরির উপকরণ। স্থানীয় কামার লোহা পিটিয়ে সামনের ভাগ পাতলা ও ধারালো এবং পেছনের ভাগ বেশ পুরু করে কুড়ালের ফলা তৈরি করে। পেছনের গোলাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ২-৩ ফুট লম্বা একটি কাঠ বা বাঁশের দন্ড এর আছারি বা হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেশাদার কাঠুরিয়ার অস্ত্র হল কুড়াল।

মেঠে

গৃহস্থালি জিনিসপত্রের মধ্যে মেঠে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। সাধারণত ধান, চাল ও অন্যান্য শস্যদানা সংরক্ষণের আধার এটি। এটেল মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি মেঠে

www.pathagar.com

গোলাকার ও চৌকোনা হয়ে থাকে। সমতল ভূমির উপর প্রথমে মেঠের তলা তৈরি করে ধাপে ধাপে কলসের মতো গলা, মুখ ও ঢাকনা তৈরি করা হয়। মাঝারি সাইজের একটি মেঠে তৈরিতে সময় লাগে ১৫-২০ দিন। কলসের মতো তৈরি হয়ে গেলে উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে নিয়ে মেঠের পুরো দেহে গোবর-মাটি দিয়ে লেপে দেয়া হয়। বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ঘরের ভেতর বা বারান্দায় রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহিণী নিজেই মেঠে তৈরি করে থাকেন। মা-নানীর কাছ থেকে তাদের এটি তৈরির হাতে খড়ি। মেঠের মুখ মাটি দিয়ে লেপে বন্ধ করে রাখলে ধান-চাল-বীজে পোকা ধরে না।

আলপনা

ব্রত ও পূজা-অর্চণায় ঘরের মেঝে, দেয়াল বারান্দা, উঠান, খুঁটি, চৌকাঠ, পিঁড়ি ইত্যাদিতে আলপনা আঁকা হয়। বিয়েতে কুলা, ডালা, আসন-পিঁড়ি, মেঝে ইত্যাদিতে আলপনা দেয়া হয়। বর-কনের আসন-পিঁড়িতে পদ্ম, জোড় ফুল, ভ্রমর ও লতাপাতা দিয়ে আলপনা চিত্রিত হয়। পদ্ম সৌন্দর্যের ও পবিত্রতার এবং ফুল-লতাপাতা প্রজননের প্রতীক হিসেবে চিত্রণ হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের আচার-রীতিতে আলপনার ব্যবহার এ অঞ্চলে দেখা যায়।

খোলা

মৃৎ নির্মিত কড়াই জাতীয় এ পাত্রটি এটেল মাটি দিয়ে কুমোররা তৈরি করে। দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর, গড়াইটুপি ও চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর গ্রামের কুমোরের তৈরি খোলা চুয়াডাঙ্গার বাইরেও খুব চাহিদা। সাধারণত সমতলযুক্ত ও খোপযুক্ত এ দুধরণের খোলা কুমোরেরা তৈরি করে। রুটি বা ধাপড়া জাতীয় পিঠা তৈরিতে সাধারণ খোলা এবং চিতই পিঠা তৈরিতে খোপযুক্ত খোলা ব্যবহার করা হয়।

ঢেঁকি

ধান ভেনে চাল প্রস্তুত করা বাংলার বহুল ও ব্যাপক প্রচলিত একটি লোক-প্রযুক্তি। আর এ কাজটি চুয়াডাঙ্গার গ্রামাঞ্চলে সাধারণত ঢেঁকির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। ঢেঁকির গুরুত্ব বোঝাতে বাংলায় প্রবাদে আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে আলাদা ঢেঁকিঘর বা ঢেঁকিশালা আছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় একমাত্র বাবলা গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঢেঁকি নির্মিত হয় – অন্যকাঠের

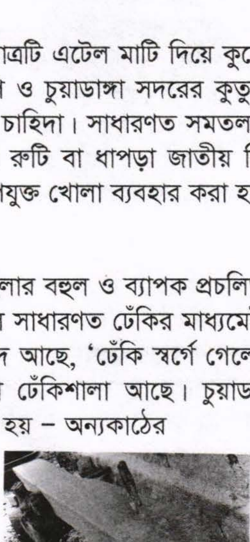

ঢেঁকি

www.pathagar.com

নয়। প্রায় ৭/৮ ফুট লম্বা ঢেঁকিতে অনেক অংশ থাকে। যেমন ঢেঁকির মাথার দিকে লম্বা কাঠের দন্ডের মুখে লোহার 'গুলো' লাগানো থাকে এটিকে ছেওয়া বলে। ঢেঁকির গোড়ার ১/৩ অংশে মাঝামাঝি ছিদ্র করে ঢেঁকিকে খাড়া রাখা হয় তরশুলের সাহায্যে। ঢেঁকির দুই পাশে তরশুল খাড়া থাকে মাটিতে পোঁতা পোয়ার উপরে। ঢেঁকি ভানার সময়ে যে গর্তের মতো জায়গায় পড়ে সেটি মাটির হলে 'গড়' আর কাঠের গুঁড়ির তৈরি হলে বলা হয় 'নোট'। ঢেঁকিতে ধান ভানা, চালের গুঁড়া কোটা, হলুদ কোটা, চিড়া কোটা, গমের খোসা ছড়ানো বা 'কাঁড়ানো' প্রভৃতি কাজ করা হয়ে থাকে।

ধানভানা

ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য হওয়ায় গেরস্থ বাড়িতে ধান-চাল নিয়ে নিত্যই ব্যস্ত থাকতে হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানা বা ধান কোটা পল্লী বাংলার নিত্যদিনের সাধারণ দৃশ্য। এটি শ্রমসাধ্য কাজ যা লাঘবের জন্য মেয়েরা নানা ধরণের গীত পরিবেশন করে থাকে। ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান থেকে চাল নিষ্কাষণ একটি অত্যন্ত দরকারি লোকজ প্রযুক্তি।

চুলা

আবহমান কাল থেকে রান্নার প্রযুক্তি হিসেবে চুলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চুলা গোলাকৃতি এবং উপরের দিকে সমান দূরত্বে তিনটি সামান্য উঁচু 'ঝিঁক' থাকে– যার উপরে রান্নার পাত্র বসান যায়। গঠন, আকৃতি ও ব্যবহার উপযোগিতার দিক থেকে চুলার প্রকার ভেদ আছে, যেমন একের বেশি মুখ হলে 'দোমুখো' চুলা বলে। তিনটি মুখ হলে 'তেচোখো', চারটি মুখ থাকলে 'চারচোখো' বা আরও বেশি হলে এভাবেই বলা হয়। চুলা সাধারণত মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। সম্প্রতি সিমেন্ট বালি নির্মিত পরিবেশ বান্ধব বা বন্ধু চুলা বাসা-বাড়িতে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

চালুনি

বাঁশ বেতের তৈরি চালুনি গৃহস্থালি কাজের নিত্য ব্যবহার্য একটি তৈজসপত্র। রবিশস্য চালার জন্য মোট ছিদ্রের চালুনি এবং আটা চালার জন্য ক্ষুদ্র ছিদ্রের চালুনি ব্যবহৃত হয়। আবার গৃহসজ্জায়ও চালুনির ব্যবহার দেখা যায়, তাতে নানা কারুকাজ থাকে। নানা রঙের সুতা দিয়ে তৈরি লতাপাতা, ফুল-ফল, ময়ূর, টিয়া, মধুর মিলন সম্বলিত নানা মটিফের এসব চালুনি কারুশিল্প ঘর বা বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা হয়।

আগরদানি

আগরবাতি বা ধূপকাঠি রাখার জন্য মাটি ও ধাতুর তৈরি বিভিন্ন আকৃতির আগরদানি এ অঞ্চলে এখনও দৃশ্যমান হয়। সাধারণ ও সৌখিন উভয় প্রকার আগরদানির ব্যবহার আছে। মাটির তৈরি আগরদানি নানা জীবজন্তুর আকৃতি দিয়ে তার মাথার উপর আগরদানির শলাকা রাখার জন্য ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি করা হয়। আবার ধাতব আগরদানিও নানা ডিজাইনের পরিদৃশ্য হয়।

জাঁতা

সাধারণত ডাল, আটা, ছাতু ইত্যাদি তৈরিতে জাঁতা ব্যবহৃত হয়। জাঁতার দুটি অংশ থাকে। দুটি অংশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র বরাবর একটি চিকন খিল

www.pathagar.com

লাগানো থাকে। যাতে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। নিচের অংশটি সমতল এবং উপরের অংশে এক প্রান্তে শস্যদানা ঢোকানোর মতো একটি ছোট ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্র পথে মুঠো করে শস্যদানা দেয়া হয়। উপরের অংশের অন্য প্রান্তে একটি হাতল থাকে যা ঘুরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ঘরের বারান্দা বা ঢেঁকি ঘরে জাঁতা বসিয়ে পাড়ার মহিলারা ডাল, গম ইত্যাদি ভাঙানোর কাজ করে থাকে।

জালা

ধান সিদ্ধ কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। একসময় গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে জালা থাকত। ১৫-২০ কেজি ধান এতে একসাথে সিদ্ধ করা যায়। তাল রস, খেজুর রস ও আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানোর কাজেও জালা ব্যবহার করা হয়। চুয়াডাঙ্গার অনেক এলাকায় শস্য বীজও এতে রাখা হয়। আবার গরম পানি সোডা মিশ্রিত কাপড় পরিষ্কার করার কাজেও জালা ব্যবহৃত হয়। তবে জালার পরিবর্তে টিনের তৈরি তাফাল ও এ্যালোমোনিয়মের পাত্র বর্তমানে ব্যবহৃত হওয়ায় জালার কদর কমে গেছে।

ঝাঁঝরি

মাটির তৈরি ঝাঁঝরির গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। ঝাঁঝরি তৈরি করে মাটির কারিগর কুমোরেরা। চাল, ছোলা, ভুট্টা তপ্ত বালিতে ভেজে ঝাঁঝরিতে ফেলে ভাল করে ঝাঁকিয়ে বালি বের করে নিতে হয়। মুড়ি ভাজার কাজে ঝাঁঝরি অপরিহার্য অস্ত্র।

নান্দা

গরু, মহিষের খাবার দেয়ার জন্য নান্দা ব্যবহার করা হয়। গোয়াল ঘরের একপাশে মাটির ঢিবি তৈরি করে তার উপর নান্দা বসিয়ে দেয়া হয়। এতে পানি, খৈল, ঘাস-বিচালি-ভুষি মিশ্রিত করে গরুর খাবার দেয়া হয়। নান্দার কারিগর মৃৎশিল্পী কুমোরেরা। এঁটেল মাটি দিয়ে নান্দা তৈরি করে তা উত্তমরূপে আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার করা হয়।

খাঁচা

বাঁশ-বেত দিয়ে বিভিন্ন কাজের জন্য নানা ধরণের খাঁচা তৈরি করা হয়। পাখি পোষার জন্য নানা ডিজাইনের ছোট-বড় খাঁচা দেখা যায়। হাঁস-মুরগী পোষার কাজে ও একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। খাঁচা ছোট বা বড় ধরনের এবং বৃত্তাকার বা আয়তাকার হতে পারে। আবার গরু ছাগলের হাত থেকে চারাগাছ রক্ষার জন্য খাঁচার বাঁশের তৈরি খাঁচার বহুল প্রচলন দেখা যায়।

দেলকো

চেরাগ বা কেরোসিনের কুপিবাতি দরকার মতো উঁচু জায়গায় রাখার জন্য দেলকোর ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে রান্নাবান্না করতে গেলে রান্নাঘরে চুলার পাশে দেলকো ছিল নিত্য দরকারি জিনিস এবং এককালে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেলকো দেখা যেত। প্রাচীনকালে কুমোরদের হাতে দেলকো মাটি দিয়ে তৈরি হতো।

www.pathagar.com

দেলকো ভেতরের অংশ ফাঁপা লম্বা আকৃতির মাটির পাত্র। পরবর্তীকালে কাঠের তৈরি দেলকোর প্রচলন হয়। বিজলি বাতির ব্যাপক ব্যবহার বেড়ে গেলে দেলকোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এটি 'গাছা' নামে পরিচিত।

পাটি

চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিটি গ্রামেই খেজুরপাতা, পাতি, কেউতি (একধরণের পানিতে জন্মানো ঘাস), হোগলাপাতার পাটির প্রচলন রয়েছে। তবে খেজুর পাতা ও পাতি দিয়ে বোনা পাটি স্থানীয়ভাবেই তৈরি হয়। সাধারণত এতে চিত্রকর্ম থাকেনা। তবে কৌশলে এক প্রকার আঁকাবাঁকা নকশা তৈরি হয়; এর নাম 'জাদুবন্দ'। মেঝের উপর বসা ও রোদে শস্যাদি শুকানোর কাজে এ পাটি ব্যবহার করা হয়।

শিকা

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই শিকার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে ফ্রিজ, মিটসেফ, সোকেস শিকার সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। ইদুঁর, বিড়াল বা পোকা-মাকড়ের হাত থেকে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় রক্ষা করার জন্য শিকায় ঝুলিয়ে রাখা হতো। পাট, সুতা, শন প্রভৃতি তন্তু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রকার শিকা গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ঘরে দেখা যেত। মাথার চুলের বেণীর মতো সুতা বা পাটের বেণী করে শিকা তৈরি করা হয়। আবার একগুচ্ছ পাটের উপর রঙিন সুতা পেঁচিয়ে শিকার লহর তৈরি করে লহরগুলোকে নানা কায়দায় পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েও শিকা বানানো হয়।

শিকার নিচে থাকে চাক বা বেড়ি। বেড়ির সাথে ফাঁস তুলে শিকার মূল অঙ্গ তৈরি করা হয়। কয়েকটি বেণী একত্র করে মাথায় গিঁট বেঁধে দেয়া হয়। নিচ থেকে শুরু করে ক্রমেই উপরের দিকে বুনে একত্রে ঝুঁটির মতো করে বেঁধে দেয়া হয়। আকার প্রকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামের শিকা আছে। যেমন, তলায় গিরা শিকা, কাপড় রাখার শিকা, জালি শিকা, কাঁথা-বালিশ রাখার গাইঞ্জা, আয়না-চিরুণী রাখার শিকা, হাত ধরাধরি শিকা, ডালিম শিকা, ঝালর শিকা, ফিতা ঝুলানোর শিকা, লহরী শিকা ইত্যাদি।

পাট, সুতা, কাপড়, পুঁতি, কড়ি, টাকা ইত্যাদি উপাদান শিকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তারাফুল, পুঁতিফুল, মোরগফুল ইত্যাদি নকশার শিকা তৈরি হতো। গ্রামীণ জীবনের সাথে শিকা এক সময়ে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গৃহবধূরা অবসর সময়ে শিকা তৈরি করত। বাঁশ ঝুলিয়ে অথবা ঘরের আড়ার সাথে শিকা ঝুলিয়ে রাখা হতো।

নারকেল কুরানি

নারকেলের জনপ্রিয়তা কমবেশি চুয়াডাঙ্গার মানুষের কাছে রয়েছে। ঝুনা বা শুকনা নারকেলের মালা থেকে শাঁস বের করে নেয়ার কাজে কুরানির বিকল্প নেই। একখন্ড কাঠের সাথে খাঁজকাটা লেহার পাতযুক্ত করে নারকেল কুরানির কাঠামো তৈরি করা হয়। গোটা নারকেল সমান দুভাগে ভাগ করে এক ভাগ দুই হাতে ধরে লোহার দাঁতযুক্ত ধারালো পাতে ঘসে দিলে পেঁজা তুলোর মতো শাঁস বেরিয়ে আসে। এভাবে বারবার ঘসে ঘসে কুরে পুরো শাঁস বের করে আনা হয়।

www.pathagar.com

পানের বাটা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে পান অন্যতম অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এ জেলায় ব্যাপকহারে পান চাষ করা হয়। তাই চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে আহার শেষে পান খাওয়ার রেওয়াজ বহু পুরোনো। পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পান-সুপারি দিয়ে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হয়। এর জন্য গৃহস্থকে পান রাখার জন্য পানদানি বা পানের বাটা, চুন রাখার জন্য চুনের কৌটা, সুপারি কাটার জাঁতি, পানের পিক ফেলার জন্য পিকদানি ইত্যাদি প্রস্তুত রাখতে হয়।

পান খাওয়া অনেকের নেশা। চুন, খয়ের, সুপারি, জরদা ছাড়াও পানের নানা রকম মুখরোচক মসলা রয়েছে। পান হাট-বাজার থেকে কিনে এনে সংরক্ষণ করার জন্য পানের বাটা ব্যবহার করা হয়। পানপাতা, চুন, খয়ের, সুপারি, তামাক থরে থরে সাজিয়ে রাখার জন্য বিশেষ ধরণের পানের বাটা বা পানদানি আছে, আবার শুধু পানের খিলি রাখার জন্যও পানদানি আছে। বড় বা ছোট উভয় ধরণের পানদানি দেখতে পাওয়া যায়। পানদানি পিতল বা রূপোর তৈরি দেখা যায়। এর গায়ে নানা ধরণের নকশা আঁকা থাকে।

শিলনোড়া

শিলনোলা একটি প্রাচীন লোকজ প্রযুক্তি। দৈনন্দিন রান্নার কাজে হলুদ, মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, আদা, জিরা, দারুচিনি ইত্যাদি বাটার জন্য প্রতিটি ঘরে ঘরে শিলনোড়া ব্যবহৃত হয়। এক-দেড় হাত লম্বা ও অর্ধ বা পৌনে এক হাত প্রস্থ একটি পুরু পাথরের খণ্ড হল শিল আর এক বৃহৎ লম্বা গোলাকার পাথরের একটি টুকরো হল নোড়া। শিলনোড়া উভয়ই মাঝে মাঝে কোটানো হয়, যাতে মসলা দ্রুত বাটা যায়। যারা শিলনোড়া কোটায় তাদের পাটা কুটুনি বলে।

হামানদিস্তা

শস্যদানা বা গাছ-গাছালি গুঁড়া বা পেশার কাজে কানা উঁচু লোহার পাত্র হামান এবং একটি লোহার দন্ড হল দিস্তা। হামানদিস্তা আকারে ছোট। ফলে ঘরে বসে বিভিন্ন ধরণের মশলাপাতি গুঁড়া বা পেষণের কাজটি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। কবিরাজি ঔষধপত্র বাটা ও পানবাটার কাজেও হামানদিস্তা ব্যবহার করা হয়। রান্নার কাজে যে সব দরকারি তৈজসপত্র লাগে এমন জিনিসপত্র – হাড়ি, কড়াই, ডেকচি, হাতা, বেড়ি, খন্তি, চাটু ইত্যাদি।

ঘুঁটে

গ্রামীণ জ্বালানির অন্যতম উৎস হলো ঘুঁটে বা ঘসি। কাঁচা গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে ও রোদে শুকিয়ে জ্বালানির অভাব পূরণ করা হয়। বর্ষা-বাদলের দিনে শুকনো কাঠ বা জ্বালানির অভাব দেখা দিলে সংরক্ষিত ঘুঁটে খুব উপকারে লাগে। গ্রাম অঞ্চলে মাটির দেয়াল বা চালার উপর গোবরের গোলাকার মন্ড তৈরি করে ঘুঁটে বানিয়ে শুকাতে দেয়া হয়। আবার পাটকাঠি বা কঞ্চির গায়ে কাঁচা গোবর লাগিয়ে বড়ে তৈরি করে জ্বালানির উপযোগী করা হয়। খোলা মাঠেও গোবর ছড়িয়ে দিয়েও ঘুঁটে বা ঘসি তৈরি করে রাখা হয়। ঘুঁটে বিক্রি করে অনেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আঁতুড় ঘরে প্রসূতি সারারাত ঘুঁটে জ্বালিয়ে রাখে তার নবজাতকের মশা-মাছি ও অমঙ্গল থেকে দূরে রাখার জন্য।

www.pathagar.com

৩. মাছধরার কাজে ব্যবহার সংক্রান্ত

মাছে-ভাতে বাঙালির পরিচয়। আদিকাল থেকে মাছধরার জন্য চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে নানা রকম লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব প্রযুক্তির মধ্যে জাল অন্যতম। নদী-নালা, খাল-বিল, সমৃদ্ধ চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের জাল দেখা যায়। এসব জালের মধ্যে মাছের আকার অনুসারে বুননেও তারতম্য দেখা যায়। জালগুলো হলো: খেপলা জাল, টানা জাল বা বেড় জাল, পাইত জাল, ধর্ম জাল, ভাসাল, ফাঁস জাল, ঠেলা জাল, পোনা জাল বা ছাকনি জাল, ভেসাল, হোঁচা জাল, ইত্যাদি। কোনো কোনো ছোট মাছ ধরার জন্য একরকম জাল আবার অপেক্ষাকৃত বড় মাছ ধরার জন্য আরেক রকম জাল ব্যবহার করা হয়। কৈ, মাগুর, শিং, টেংরা, মায়া, ঝায়া কোনোটাই এসব জাল থেকে বেরুতে পারেনা। জাল ছাড়াও রাবানি, বিত্তি, চারু, টেপ্রি, কোঁচ ও ঝুপি, জুঁতি, ছিপ, দাঁওন বড়শি, পলো যন্ত্রপাতি এবং কৌশল ব্যবহার করে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এখনও মাছ ধরা হয়ে থাকে।

খেপলা জাল বা তড়ো জাল

মাছ ধরার সবচেয়ে পরিচিত যন্ত্র হলো খেপলা জাল। নদী, নালা, জলাশয়, বিল,পুকুর ইত্যাদি সর্বত্রই এ জালের মাধ্যমে মাছ ধরতে দেখা যায়। পুরুষ-মহিলা উভয়েই অবসর সময় পেলে বাড়িতে বসে এ জাল বুনে থাকে। সাধারণত ফাঁস গিরার মাধ্যমে এ জাল বোনা হয়। উপর থেকে নিচের দিকে ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে এর বুনন কাজ শেষ হয়। নিচের প্রশস্ত দিকে লোহার ছোট কাঠি বা বল জুড়ে দিয়ে খেপলা জাল তৈরি করা হয়। উপরের প্রান্তে ফাঁসের সাথে লম্বা দড়ি বা বাঁধা থাকে একে ডুরি বলা হয়, যাতে মাছ শিকারি ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌশলে জাল পানিতে নিক্ষেপ করতে পারে। এরপর ডুরি ধরে আস্তে আস্তে টেনে উপরে তোলা হয়। এ জালে ছোট থেকে বড় সব ধরণের মাছ শিকার করা যায়।

টানা জাল

মাছ ধরার সময়ে টানা জাল দুই ভাঁজ করে নিচের প্রান্ত পানির নিচের দিকে মাটি ঘেঁসে এবং উপরের দিক পানির উপরে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ছোট-বড় পুকুরে বা দিঘিতে মাছ ধরার কাজে টানা জালের বিকল্প নেই। জলাশয় বড় হলে আনুপাতিক হারে বড় জাল এবং লোকসংখ্যা বেশি লাগে। খাল বিল পুকুর দিঘির মাছ টানা জাল ছাড়া ধরা সম্ভব নয়। সমস্ত জলাশয় ঘিরে ফেলে টানা জালে ধরা যায় বলে একে 'বেড় জাল'ও বলা হয়।

পাইত জাল

খালে-বিলে অল্প পানিতে মাছ চলাচলের পথে বিভিন্ন ধরণের এবং আকারের মাছ ধরার জন্য সেই আকৃতির ফাঁকঅলা ২/৩ হাত চওড়া এবং দরকার মতো লম্বা পাইত জাল পেতে রেখে ৪/৫ ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করতে হয় মাছ পড়ার জন্য। পাইত জালে মাছ

www.pathagar.com

পড়লে জাল উঁচু করে টেনে পড়া মাছ ছাড়িয়ে নিতে হয়। খালে-বিলে মাছ বেশি থাকলে পাইত জালের সাহায্যে কম পরিশ্রমে মাছ ধরা যায়।

চাক জাল / ধর্ম জাল

বাঁশের ফালি বা চটা দিয়ে ৮/১০ ফুট বৃত্তাকারে চাক তৈরি করে চাকের সাথে চাকের মাপের দেড় গুণ বড় জাল ভালভাবে বাঁধা হয়। এবার জালটির সাথে ৫/৬টা চটা চাকের সাথে বেঁধে চুড়ো করে উপরের দিকে শক্তভাবে একসাথে আটকে বেঁধে দিলেই চাক জাল তৈরি করা হয়। হাল্কা লম্বা কিন্তু মজবুত সরু বাঁশের আগায় চুড়োর দিকটা বেঁধে পানির কিনার থেকে চাক জালটি ৪/৫ ফুট গভীর পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে বাঁশটি যেন পানির উপরে থাকে সে ব্যবস্থা করতে হয়। কিছু সময় পর পর জালটি উঁচু করে মাছ পড়লে তুলে নেওয়া হয়। বর্ষাকালে যখন মাছ চলাচল বেশি কওে তখন এ জালে মাছ বেশি পড়ে।

টেপি

বাঁশের তৈরি টেপা মাছের মতো দেখতে এক প্রকার মাছধরার যন্ত্র হচ্ছে টেপি। বাঁশের চিকন শলাকা সারিবদ্ধভাবে ঘন করে তালের আঁশ, দড়ি বা সুতো দিয়ে বোনা হয়। এক বান দেয়া বলে। ১০/১২টি শলাকার দুটি বানের মাঝে বাঁশের ঈষৎ মোটা বাতা দেয়া হয়। এতে বান শক্ত ও মজবুত হয়। এরপর বানের উপরের ও নিচের মাথা চাপ দিয়ে বাঁকা করে এক থেকে সোয়া ফুট ফাঁপা রেখে বাঁশের অপর অপর বাতা দিয়ে বাঁধা হয়। টেপির যেকোন এক পাশে দুই সারিতে মাঝামাঝি ৮/১০টি দরজা থাকে মাছ ঢোকার জন্য। এগুলোকে পাড় বলে। বর্ষাকালে অল্প পানিতে স্রোতের অনুকূলে টেপি পেতে মাছ ধরা হয়। পুঁটি, টেংরা, কৈ, শিং ডানকানা প্রভৃতি মাছ টেপিতে ধরা পড়ে।

রাবানি, বিত্তি, চারু, দোয়াড়ি, তিলপিটি, খিলটানা, টেপি ইত্যাদি আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের সোহরাব আলি [জন্ম: ১৯৬৯], কেদারনগরের কেতাব আলি [জন্ম : ১৯৪৮], বেলগাছি গ্রামের আবদুস সাত্তার [জন্ম :১৯৭৪], কাসেদ আলি [জন্ম: ১৯৭৯], জগন্নাথপুরের ইউসুফ [জন্ম: ১৯৬৪], ভাঙবাড়িয়ার মোসলেম আলি [জন্ম: ১৯৭১] ইত্যাদি দক্ষ কারিগরেরা তৈরি করে থাকেন।

রাবানি, বিত্তি, চারু

বর্ষাকালে খালে, জমির আইলে রাবানি, বিত্তি, চারু বা আটন, বেনে পানিতে পেতে ছোট ছোট মাছ ধরা হয়ে থাকে। চিকন বাঁশের শলা, বেতি দিয়ে তৈরি **রাবানি, বিত্তি, চারু ইত্যাদি** তৈরির মূল উপাদান। এ সব যন্ত্রের দু'পাশে একাধিক পথ থাকে, যা দিয়ে মাছ ঢুকতে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না। রাবানি, বিত্তি, চারুর উপরের খোলা মুখ উপুড় করে মাছ ঢালা হয়। এতে চিংড়ি, পুঁটি, চান্দা, বেলে, মলা ইত্যাদি মাছ ধরা যায়। আকার ভেদে বা ব্যবহারের উপযোগিতার দিক থেকে এই একই ধরনের আরও অন্যান্য মাছধরার যন্ত্র হচ্ছে – দোয়াড়ি, তিলপিটি, খিলটানা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

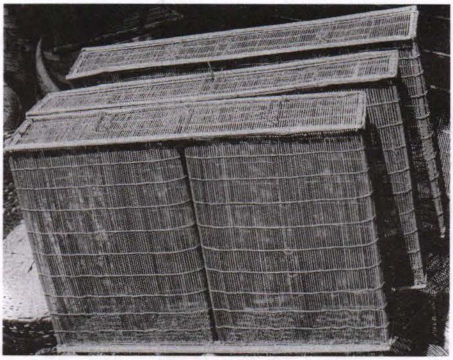

বিত্তি

ভাসাল

আকারে বড় নদী বা বিলের ধারে মৃদু স্রোতের মুখে ভাসাল পাতা হয়। ভাসালের দুই প্রান্ত বরাবর বাঁশের দুটি দন্ড সংযুক্ত করা হয়। দন্ড দুটির অপর প্রান্তে মিলিত হয়। এ প্রান্ত ধরে চাপ দিয়ে জাল পানিতে ওঠা-নামা করানো হয়। মাঝে মাঝে জাল উঠিয়ে দেখা হয়, মাছ জালে আটকা পড়লে তা সংগ্রহ করা হয়।

কোঁচ ও ঝুপি

কোঁচ বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ। তল্লা বাঁশ কেটে চিরে শলাকা বা দন্ড তৈরি করা হয়। এর অগ্রভাগে সূচালো লোহার টোপর লাগানো হয় যা কোঁচের কালি নামে পরিচিত। ধান ক্ষেতে বা স্বচ্ছ পানিতে চলন্ত মাছ ধরার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। ক্ষিপ্র গতিতে কোঁচ নিক্ষেপের কারণে মাছের দেহ এফোঁড় ওফোঁড় শলাকাবিদ্ধ হয়ে যায়। লোহার শিক দিয়ে তৈরি এই যন্ত্রকে বলা হয় ঝুপি ।

জুঁতি

মাছ ধরার একটি প্রাচীন প্রযুক্তি হলো জুঁতি। কোঁচের মতো দেখতে হলেও এতে বাঁশের শলাকার অগ্রভাগে লোহার যে টোপর পরানো হয় তার মাথা সামান্য বক্র এবং ঊর্ধ্বমুখী হয়। ঝাঁটার মতো গুচ্ছবদ্ধ করে দন্ডের প্রান্তদেশে এটি শক্ত করে বাঁধা হয়। এটি নিক্ষেপ করে মাছ শিকার করতে হয়।

ছিপ

মাছ শিকারের সবচেয়ে সহজলভ্য এবং জনপ্রিয় প্রযুক্তি ছিপ। ডাঙায় বসে আয়েস করে ছিপে মাছ ধরা যায়। বাঁশের সরু দন্ড অথবা কঞ্চির মাথায় নাইলনের সুতায় এক বা একাধিক বড়শি বেঁধে ছিপ তৈরি করা হয়। ছিপের মাথা ও বড়শির ঈষৎ বাঁকা থাকে। বড়শিতে টোপ গেঁথে পানিতে ফেললে মাছ গিলে টান দেয়। শিকারি এ সময় হ্যাঁচকা টান দিলে মাছের গলায় বড়শি আটকে যায়। ছিপ টেনে মাছ উপরে তোলা হয়। মাছের টোপ হিসেবে কেঁচো, লাল পিঁপড়ের ডিম, শামুক, ময়দার মন্ড এমনকি ছোট ছোট

www.pathagar.com

মাছও ব্যবহার করা হয়। ছিপের আর একটা অংশ হলো ফাৎনা বা পাতাড়ি। সাধারণত ময়ুরের পাখনা থেকে ফাৎনা বানানো হয়। এটা পানির নিচে পর্যন্ত বড়শি পৌঁছালেও মাটিতে ঠেকেনা। পাটকাঠি, শোলা জাতীয় হালকা জিনিস দিয়ে ফাৎনা বা পাতাড়ি বানানো হয় যা পানির উপর ভাসমান থাকে। মাছে ঠোকর দেয়ার সাথে সাথে ফাৎনাও নড়তে থাকে। তখন শিকারি সতর্ক হয় এবং মাছে টোপ গিলে টান দেয়ার সাথে শিকারিও টান দেয়। তখন মাছ বড়শিতে আটকে যায়। ছোট বড় উভয় মাছ বড়শিতে ধরা যায়। এক্ষেত্রে বড়শিও ছোট বড় হয়ে থাকে।

দাঁওন বড়শি

দুপাশে দুটি খুটি পুঁতে লম্বা দড়ি বা শক্ত সুতা টানা বাঁধা হয়। দড়ি বা সুতায় একাধিক বড়শি সারিবদ্ধভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। একে দাওন বড়শি বা জিয়ানা দেয়া বলে। সন্ধ্যাবেলা সাধারণত ছোট ছোট ব্যাঙ বা মাছ বড়শিতে টোপ হিসেবে গেঁথে দেয়া হয়। মাছ বা ব্যাঙ নড়াচড়া করতে থাকলে শোল, বোয়াল বা গজাড় জাতীয় মাছ এতে আটকা পড়ে। এতে শিকারিদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়েনা। ভোরবেলা মাছগুলো ছাড়িয়ে নিলেই হয়।

পলো

পলো খাঁচা জাতীয় এক রকম ধরার যন্ত্র। পলোর উপরের দিকটা গোলাকার সরু মুখ এবং নিচের দিকটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গোল চাকতির আকার ধারণ করে। মুখ ও তলা উভয়ই খোলা থাকে। পলো তৈরির উপকরণ হলো বাঁশের সরু কাঠি বা শলাকা, পাতলা, চটা, বেত ও দড়ি বা তার। প্রথমে পলোর উচ্চতা অনুযায়ী বাঁশ কেটে ফালি করে শলাকা তৈরি করা হয়। এরপর বেড় বা চাক তৈরি করে তার সাথে শলাকাগুলো তার বা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। চাকগুলো একই আকারের নয়। কারণ এর মুখ ক্রমশ ছোট ও নিচের দিক বড় হয়। মুখ বেত দিয়ে মজবুত করে বাঁধা হয়। পলোতে মাছ আটকা পড়লে শিকারি টের পায় এবং পলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাছ পলোর মুখ দিয়ে বের করে আনে। চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় কারিগরদের তৈরি পলো হাটে-বাজারে পাওয়া যায়।

৪. নৌকা সংক্রান্ত

নৌকা

নদী-নালা, খাল-বিল, সমৃদ্ধ চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে এক সময়ে নৌকাই ছিল প্রধান এবং সহজলভ্য বাহন। মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা ইত্যাদি নদ-নদী এবং শত শত খাল-বিল পেরিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল বহন ও যাতায়াতের জন্য নৌকা ভিন্ন গতি ছিল না। গত পঞ্চাশ বছর আগেও নৌকার প্রাধান্য বজায় ছিল। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ নদীই নব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে খুব কম ক্ষেত্রেই নৌকার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ডিঙ্গি

ছোট খাটো খাল বিলে চলাচল ও মাছ ধরার কাজে ডিঙ্গির ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। সাধারণত তক্তা জোড়া দিয়ে অত্যন্ত মজবুত করে ডিঙি তৈরি করা হতো। প্রয়োজনে দাঁড় টেনে ও লগি বৈঠা ঠেলে ডিঙি চালানো হয়।

ডোঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ডোঙ্গার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। বড় আকারের তাল গাছের গুড়িসহ ৬ থেকে ৮ ফুট লম্বা অংশ সমান দুই ভাগে চিরে ফেলে ভেতর থেকে শাঁস তুলে ফেলে গর্ত করে ডোঙ্গা তৈরি হয়। এরপর উত্তমরূপে চাঁচাছোলা করে মসৃণ করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। ডোঙ্গায় চড়ে পানিতে সহজেই চলাচল করা যায়। মাছ ধরার কাজে, হাটে-বাজারে অথবা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া আসার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ডোঙ্গা খুবই নির্ভরযোগ্য যান। সম্ভবত প্রাচীন যান-বাহনগুলোর মধ্যে ডোঙ্গা অন্যতম।

ভেলা

কয়েকটি কলাগাছের কান্ড বা শুকনা গাছের গুড়ি একত্রে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে শক্ত করে লাগসই মতো বেঁধে ভেলা তৈরি করা হয়। ভেলা পানিতে ভাসিয়ে বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে স্থানান্তরে পৌছানো যায়। নৌকার অভাবে জলপথে ছোটখাট দূরত্বে পৌঁছানোর কাজে ভেলা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেলার ব্যবহার এখনও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সাপে কাটা লাশ এক সময় নদীতে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয়া হতো পুনর্জীবন লাভের আশায়।

৫. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

লোক প্রযুক্তির এক বিশাল দিগন্ত মৃৎশিল্প এবং এই প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বৃত্তিজীবীরা। তাদের ব্যবহৃত প্রতিটি যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র লোকশিল্পের অন্যতম উপাদান।

কুমোরের চাক

মৃৎশিল্পী কুমোর নিজ পেশার কাজে চাক ব্যবহার করে। এই চাক ঘুরিয়ে তার উপর রক্ষিত কাদামাটিকে হাতের কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে ঈপ্সিত পাত্রের রূপ দিয়ে থাকে। চাক তৈরির উপকরণ হিসেবে বাঁশ, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, চুন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

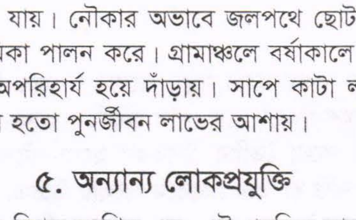

কুমোরের চাক

www.pathagar.com

কুমোরা বংশগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চাক নির্মাণ করে থাকে। কোমর পর্যন্ত মাটি গর্ত করে উক্ত চাক একটি দন্ডের উপর বসানো হয়; দন্ডটি হুইলের কাজ করে। এভাবে মেঝের সামান্য উপরে স্থাপিত চাকটি বাঁশ বা কাঠের একটি গুরু দন্ড দিয়ে ঘুরাতে হয়। গরুগাড়ির চাকার মতো কুমোরের চাকও লোক-প্রযুক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভাঁটি

কুমোরের তৈরি মৃৎপাত্র যে চুলায় পোড়ানো হয় তা সাধারণত ভাঁটি নামে পরিচিত। সমতল ভূমির উপর মাটি ফেলে ঢিবির মতো উচুঁ করা হয়। ঢিবির মাঝখানে গর্ত থাকে। কাঁচা পাত্রগুলো ভাঁটি বা পণির গর্তে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয় এবং পাত্রের ফাঁকে ফাঁকে খড়কুটা, গাছের ডাল ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে রাখা হয়। পাত্রগুলোর চারদিকে নিম্নমানের হাড়ি পাতিল দিয়ে ঢেকে আবরণ দেয়া হয়, যাতে আগুনের তাপে মূল পাত্রগুলো ফেটে না যায়। এরপর স্থান বিশেষে খড়, কচুরিপানা, গাছের পাতা পাটকাঠি বা শোলা দিয়ে ঢেকে পুরোটা মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এই প্রলেপের চারদিকে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যাতে ধোঁয়া বের হতে পারে। পাত্রের রঙ কালো করতে হলে প্রলেপে ছিদ্র রাখা যায় না; উপরন্ত জ্বালানি হিসেবে শুধু তুষ ব্যবহার করতে হয়। ভাটিতে ছিদ্র রেখে কাঠ খড়ি দিয়ে পোড়ালে পাত্রের রঙ লাল হয়। প্রথম দিকের জ্বালে স্বল্প উত্তাপ থাকলেও পরে তা বাড়ানো হয়। সাধারণত রাতে আগুন দেয়া হয় এবং সকাল হতে হতে তা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কুমোর উপরের প্রলেপ সরিয়ে মূল পাত্র বের করে আনে। ভাঁটিতে আগুন দেয়ার আগে কুমোর সম্প্রদায় কিছু মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করে থাকে। কেউ ধুপ দেয়, কেউ সোনা-রূপা ভেজানো পানি ভাটির উপর ছিটিয়ে দেয়। অশুভ দৃষ্টি থেকে ভাটি রক্ষার জন্য কেউ কেউ চুলার এক কোণে ঝাড়ু, কুলের ডাল, বেতের কাঁটা ইত্যাদি রেখে দেয়। কুমোরদের মাটি ছেনা, চাকে তুলে বিভিন্ন পাত্রের রূপ দেয়া, ভাটিতে পাত্র পুড়িয়ে মজবুত করা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে দক্ষ প্রযুক্তির স্বাক্ষর মেলে।

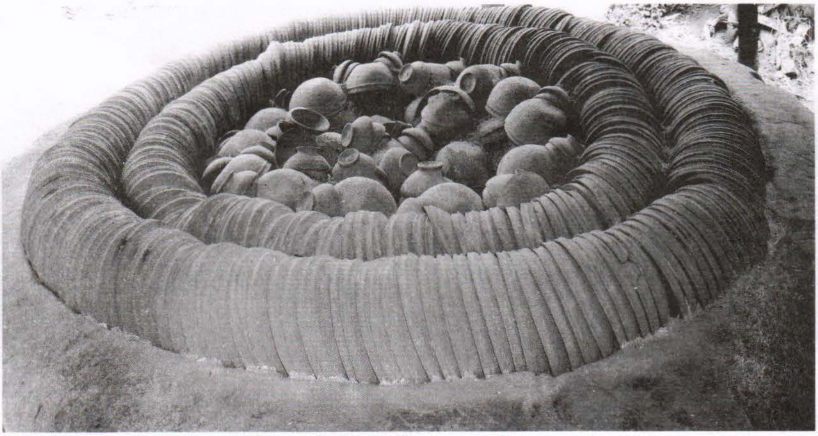

ভাঁটি

www.pathagar.com

গুড় প্রস্তুত প্রণালী

চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রচুর খেজুর গাছ জন্মায়। চাষি-গৃহস্থরাও নিজেদের জমিতে বা জমির আইলে খেজুর গাছ লাগায়। প্রাচীনকাল থেকে দেশে-বিদেশে এমন কি ইউরোপের বাজারে এ অঞ্চলের খেজুর গুড়ের খ্যাতি ছিল। স্থানীয়ভাবে খেজুর গুড় থেকে উৎপাদিত ড'লো চিনি বা খান্দেশ্বরী চিনির ব্যাপক চাহিদা ছিল ইউরোপে। চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন গ্রামে এ বিষয়ে অনেক জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তী এখনও শোনা যায়। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে নীলচাষের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হলে চাষিরা নীলকরদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের আত্মরক্ষামূলক উপায় হিসেবে চাষের জমিতে ব্যাপকহারে খেজুর লাগিয়ে দেয়। এতে তাদের চাষের জমি কমে গেলেও খেজুর গুড় এবং দেশি চিনি উৎপাদন করে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার তারা উপায় বের করে। শীত মৌসুমে খেজুর গাছ কেটে কাটা জায়গায় নলি পুঁতে ভাঁড় বেঁধে রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস বড় বড় জ্বালায় করে ভালভাবে জ্বালিয়ে ঘন লালচে রং ধরলে গুড় তৈরি হয়। রস ফুটানোর সময় হাতা দিয়ে বারবার নেড়ে দিতে হয়, যেন আগুনে গুড় পুড়ে না যায়। গুড় তৈরি হয়ে গেলে জালার গায়ে হাতা দিয়ে বারবার ভাল করে ঘসে ঘসে 'বীজ' তোলা হয়। পরিষ্কার শক্ত মাটিতে মোটা পাটকাটি চৌকো করে পেতে তার উপরে পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে পরিমাণ মতো দানাদার 'বীজ'অলা গুড় ঢেলে দিলে তৈরি হয় পাটালি। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের পাটালি গুড়ের খ্যাতি এখনও আছে । রসযুক্ত দানাদার গুড় মাটির নতুন ভাঁড়ে সংরক্ষণ করা হয়। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বহু চাষি-গৃহস্থের কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্যন্ত আয়-উপার্জনের অন্যতম উপায়। দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরের রস-গুড়ের সুনাম সবচেয়ে বেশি। সরোজগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, হাটবোয়ালিয়া, দামুহদা, জয়রামপুর, জীবননগর, হাসাদহ গুড়ের হাটের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও আখের গুড়, তালের গুড়, ইত্যাদি এ জেলায় উৎপাদিত হয়ে থাকে।

খেজুর গাছ

চুয়াডাঙ্গা জেলা আখচাষের বিখ্যাত। তাছাড়া রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খেজুর ও তালগাছ। দর্শনার বিখ্যাত চিনিকল কেরু এন্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে

www.pathagar.com

স্থানীয়ভাবে চিনি বা গুড় তৈরি করা হতো। তবে এখনও একেবারে এ প্রযুক্তি বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও স্থানীয়ভাবে গুড় তৈরি হতে দেখা যায়। আখ থেকে রস নিষ্কাষণ করে তা পাত্রে জ্বাল দিয়ে গুড় ও গুড় থেকে দানাদার চিনি তৈরি হতো।

খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হচ্ছে

আগুনে রস ফুটানোর সময় কাঠের শক্ত হাতা দিয়ে বারবার নাড়া হয় এ প্রক্রিয়াতে রস ঘন হয়ে লালচে রঙ ধারণ করলে তা একটি শুকনো পাত্রে ঢেলে রাখা হয়। রসযুক্ত দানাদার গুড় মাটির পাত্র চাড়ি বা কোলায় ঢেলে সংরক্ষণ করা হয়। এই গুড় ঝোলা গুড় বা দানাদার গুড় বলে। খেজুর রস থেকেও ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পাটালি গুড় বানানো হয়। শীত মৌসুমে খেজুর গাছ কেটে ঠিলে বেঁধে তা থেকে রস সংগ্রহ করে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। এ অঞ্চলের পাটালি গুড় বিখ্যাত। আবার খেজুরর রস দিয়ে পিঠা, পায়েস ইত্যাদি তৈরির প্রচলন আছে। আবার তালের রস থেকেও গুড় তৈরি করা হয়। গ্রীষ্মকালে তালের রস সংগ্রহ করা হয়। তালের মোচা কেটে তাতে ছোট ছোট ভাঁড় বা ঠিলে বেঁধে এই রস সংগ্রহ করা হয়। এরপর পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় গুড় তৈরি করা হয়। অনেক তালের রস কয়েক দিন পচন দিয়ে তাড়ি তৈরি করা হয় যা বাগদিসহ নিম্ন শ্রেণির মানুষের নেশার খোরাক যোগায়।

সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ

সরিষা, তিল, তিসি, গুজি ইত্যাদি তৈলবীজ থেকে তেল তৈরি করার জন্য এক সময় ঘানি গাছই ছিল একমাত্র অবলম্বন। চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ঘানিগাছের ব্যবহার ছিল। হিন্দু সমাজের কলু সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় তেল প্রস্তুতের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে যান্ত্রিকভাবে তেল উৎপাদিত হওয়ায় ঘানিগাছের ব্যবহার একেবারে কমে গেছে। কলু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে, আর যারা রয়ে গেছে তারা পেশা বদল করে নানাভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে।

মেশিনে তেল প্রস্তুতের পূর্বে ঘানি গাছই ছিল একমাত্র লোক প্রযুক্তি। সরিষা, তিল, তিসি, গুজি ইত্যাদি শস্যবীজ থেকে তেল তৈরি করার জন্য ঘানি গাছ ব্যবহার করা হয়। এক সময় চুয়াডাঙ্গার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এই লোক-প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল। এখন

www.pathagar.com

কদাচিৎ ঘানি গাছ চোখে পড়ে। তেল প্রস্তুতের সাথে জড়িত সম্প্রদায় কলু নামে পরিচিত এবং এঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজটি করে থাকেন।

ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি ও গরুর গাড়ি

এক সময় সমাজের উচ্চবিত্তদের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে বাঁশ, দুটি কাঠের চাকা, এটি লোহার দন্ড যার সাথে চাকা দুটি সংযুক্ত থাকে, বাঁশের চরাট এবং উপরে বসার আসন। এক সময় ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। এখন এটি বিলুপ্তির পথে। এ অঞ্চলে মহিষের গাড়ির প্রচলন আছে। এগুলো সাধারণত মালামাল আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। যিনি মহিষের

ঘোড়ার গাড়ি

মহিষের গাড়ি

গাড়ি চালান তিনি মৈষাল নামে পরিচিত। গরুর গাড়িও এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। এক সময় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাতায়াত মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি আর জলপথে নৌকা। গ্রামের বধূরা গরুর গাড়িতে ছৈয়ের ভেতরে উঁকি দিয়ে বাপের বাড়ির দিকে তাকানো ছিল চিরচেনা দৃশ্য। গরুর গাড়ির চালক গাড়োয়ান হিসেবে পরিচিত।

তীর-ধনুক

প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র, পাখি শিকার ইত্যাদি কাজের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হলো তীর-ধনুক। বাঁশের একখন্ড বাতা অর্ধ চাপের মতো বাঁকা করে দুই প্রান্তে সূতা বা দড়ি বেঁধে ধনুক তৈরি করা হয় এবং বাঁশের সরু শলাকার অগ্রভাগে লোহার ফলা লাগিয়ে তীর বানানো হয়। ধনুকের মাঝ বরাবর তীরের খাঁজ কাটা প্রান্ত রেখে টেনে ধরে নিশানা ঠিক করে ছেড়ে দিলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। এক সময় তীর-ধনুক মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

পাতকুয়া /ইঁদারা

পাতকুয়া বা ইঁদারাই ছিল শহর বা গ্রাম নির্বিশেষে এক সময় নিরাপদ পানির আধার। ফলে স্বচ্ছল প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অন্তত একটি করে স্থানীয় কারিগরদের মাধ্যমে পাতকুয়া বা ইঁদারা তৈরি করে পানির অভাব মেটাত। পানি ব্যবহারের জন্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-জলাশয় এক্ষেত্রে সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা সর্বক্ষেত্রে আয়ত্বের মধ্যে ছিল না।

www.pathagar.com

ইঁদারা

পাতকুয়োর চাক

জনসাধারণের পানির কষ্ট দূর করার জন্য ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারি উদ্যোগে প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামে এক বা একাধিক পাকা ইঁদারা তৈরি হয়। চুয়াডাঙ্গার অনেক পুরোনো এবং বড় বড় গ্রামে এখনও এরকম পাকা ইঁদারা দেখা যায়। ইঁদারার চেয়ে অনেক কম খরচে পাতকুয়া তৈরি করা যায় বলে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ঘরে ঘরে পাতকুয়া ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

পালকি

বর্তমানে পালকি যাদুঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তবে এই পালকিই একসময় ছিল ঐতিহ্যবাহী যানবাহন। অবস্থাপন্ন পরিবারের নারী-পুরুষ পালকিতে চলে স্থানান্তরে গমন করত। বর পালকিতে চড়ে বিয়ে করতে যেত আবার বিয়ের পরে নববধূকে নিয়ে পালকিতেই আবার ফিরত। পালকির ব্যবহার ছিল মর্যাদাসূচক ঐতিহ্যের প্রতীক। মূলত কাহার, বাগদি, মালো প্রমূখরা ছিল পালকি বাহক। জীবননগর উপজেলার কাশীপুর জমিদার বাড়িতে এখনও দুটি পালকি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে।

পুকুর/দিঘি

চুয়াডাঙ্গা জেলায় এখনও বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী পুকুর-দিঘি-জলাশয় রয়েছে। এসব দিঘি-জলাশয় একদিকে যেমন স্থানীয় মানুষের পানীয় জলের অভাব মেটাত অন্যদিকে মাছের অভাব মেটাত সারা বছর। কিছু ঐতিহাসিক দিঘি-জলাশয় রয়েছে এ অঞ্চলে। যেমন গড়াইটুপির হযরত মালেকুল গাউসের কারামাতি দিঘি, দামুড়হুদার চারুলিয়া গ্রামের মেহমান শাহের দিঘি, চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশন সংলগ্ন দিঘি, আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ী গ্রামের হযরত খায়রুল বাশার ওমজের দিঘি ইত্যাদি। এসব দিঘি নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক কিংবদন্তিও চালু আছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিহি-কেষ্টপুরের পুকুর

www.pathagar.com

আলমডাঙ্গা উপজেলার রংপুর গ্রামের দিঘি

ইঁদুর ধরা কল

এখনও গ্রামাঞ্চলে ইঁদুর ধরার ফাটক বা কল পাওয়া যায়। নানা আকৃতি ও ডিজাইনের এসব ফাটকে ইঁদুর ঢুকতে পারে কিন্তু বেরতে পারেনা। এসব ইঁদুর ধরা কলে শুটকি, নারকেলের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু ইত্যাদি কলের লকে গেঁথে দেয়া হয়। আর ইঁদুর ঐসব খাবার খেতে গেলে আটকে যায়।

মোড়া

বাঁশ-বেতের মুড়া বা আসন এখনও অভিজাত পরিবারে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাঁশ-বেতের শলাকা ওসরু বেতি দিয়ে বিশেষ বুনন প্রক্রিয়ায় মুড়া তৈরি করা হয়। মুড়া ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। এর দুই মাথা প্রশস্ত এবং মাঝখান অপেক্ষাকৃত ঈষৎ। অনেকে মুড়ার উপর বসার জন্য তুলার আসন তৈরি করে যা বেশ আরামদায়ক।

খড়ম

অবাধ জুতা স্যান্ডেলের পূর্বযুগের মানুষ পাদুকা হিসেবে কাঠের তৈরি খড়ম ব্যবহার করত। অভিজাতরা কাঠের খড়মের উপর খাঁজ কেটে হরিণের শিং, হাতির দাঁত বসিয়ে নিতেন। তবে সাধারণ মানের খড়মের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। খড়মের অগ্রভাগে পায়ের আঙ্গুল যাতে আটকে থাকে সে জন্য মজবুত শলা বা খুটা থাকত। বর্তমানের খড়মের প্রচলন নেই।

ঘন্টা

এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। তবে স্কুল-কলেজ, কারখানা বসার ও ছুটির জন্য ঘণ্টা বাজানো হয়। মন্দিরে, পূজামন্ডপে ও গির্জায় ঘণ্টা বাজানো হয়। সাধারণত ঘণ্টা কাঁসা বা পিতলের হয়ে থাকে। কাঠি বা কোনো শক্ত দন্ড দিয়ে আঘাত করে ঘণ্টা বাজানো হয়।

রিক্সা ভ্যান

মফস্বল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে মানুষের বাহন হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রিক্সার মতো তবে ছাদবিহীন। চাকার উপর তক্তা বসানো থাকে। যাতে যাত্রীরা বসতে

www.pathagar.com

পারে। অনেক সময় মালপত্র আনা নেওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হয়। তবে সেক্ষেত্রে তক্তা বসানো থাকেনা।

হুঁকো

ধুমপানের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি হলো হুঁকো। একটি মাঝারি ধরণের নারকেলের গোটা খোল ব্যবহার হয় হুঁকো তৈরিতে। খোলের উপর প্রান্তে ছিদ্র করে কৌশলে ভেতরের নারকেল বের করে হুঁকো তৈরি হয়। একটি বাঁশের অথবা কাঠের ছিদ্র দন্ড নারকেলের খোলের ছিদ্রের উপর বসিয়ে দিয়ে তার উপর কলকে দিয়ে এবং কলকের ভেতরে তামুক ও আগুন দিয়ে হুঁকো খাওয়া হয়।

গরুর গাড়ি

ধান বা শস্যাদি মাঠ থেকে আনা নেয়ার কাজে গরুর গাড়ির বিকল্প নেই। এক সময় যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতো। ছইয়ের ভেতরে গরুর গাড়িতে নববধূর সেই লাজুক মুখ সবার কাছে চিরচেনা।

চাকা

বাংলাদেশে লোকযান হিসেবে নৌকার পরই গরুর গাড়ির স্থান। গরু গাড়ির একটি অপরিহার্য অংশ হলো চাকা। ছূতার চাকা তৈরি করে। চাকা তৈরিতে এ অঞ্চলে বাবলা কাঠ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর তিনটি অংশ থাকে–লাহা, আড়া, পুঠে। চাকার মাঝখানের গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডের নাম লাহা। এর মাঝখান বরাবর আড়াআড়ি ছিদ্র থাকে যার ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ির ঝুরো প্রবেশ

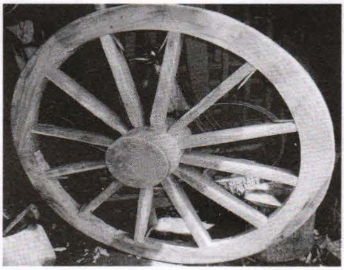

করানো হয়। লাহার উপরিভাগে ছিদ্র করে সমান দূরত্বে ছয় জোড়া আরা মজবুত করে সংযুক্ত করা হয়। আরাগুলোর মাথায় পুঠে দিয়ে চাকার আকৃতি দেয়া হয়। পুঠেগুলো বক্রাকার হয়। বাঁশের খিল দুটি পুঠে একত্রে জোড়া দেয়া হয়। ভেতরের দিক থেকে ছিদ্র করে আরার সাথে সংযুক্ত করা হয়। একে শক্ত করার জন্য লোহার খিল এঁটে দেয়া হয়, একে পাতরা বলে।

www.pathagar.com

লোকভাষা

চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশিরভাগ মানুষ প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তবে কথ্য ভাষায় উচ্চারণগত কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

চুয়াডাঙ্গার শব্দ উচ্চারণের ভেতর উ-কারের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। যেমন 'ঘোড়া'র উচ্চারণ হয় 'ঘুড়া', 'জোলা'র উচ্চারণ হয় 'জুলা', বোবা-বুবা, খোকা-খুকা, ধোকা-ধুকা ইত্যাদি। আবার প্রায় সব শব্দের মাঝখানে একটা ছোট্ট করে ই-কার জুড়ে দিয়ে উচ্চারণের প্রবণতাও আছে চুয়াডাঙ্গার ভাষায়। বলা যায় এটাই চুয়াডাঙ্গার ভাষা উচ্চারণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন 'মুলা'র উচ্চারণ হয় 'মু-ই-লু', 'নৌকা'র উচ্চারণ হয় 'নোইকু'। 'ডুবে গেছে' উচ্চারণ করা হয় 'ডুইবি গিচেএ'। 'ছ' 'চ' ধরনের তালব্য বর্ণগুলো উচ্চারণে জিহ্বা তালুতে কখনো ঠেকে না। আলতো করে জিহ্বাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে আলসে সহজভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। একইভাবে ওষ্ঠ্যবর্ণ উচ্চারণে কখনো দুই ঠোঁটের মিলন ঘটে না। তাই 'দাফন', 'কাফন' কিংবা 'পুতুল' শব্দগুলো ঠিকমতো উচ্চারিত হয়না।

চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক শব্দ উচ্চারণে ক্রিয়াপদে 'উ' প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেমন করছিস- কচ্চিস, মারছে- মাচ্চে। 'ছ' প্রায় উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। 'ছ'-এর উচ্চারণ 'চ'-এ সীমাবদ্ধ। যেমন মাছ-মাচ, গাছ-গাচ ইত্যাদি। এ ছাড়াও 'ট' অনেকক্ষেত্রে 'ড' হয়ে যায়। যেমন ছেলেটা-ছেলেডা, ডালটা-ডালডা ইত্যাদি। চুয়াডাঙ্গার ভাষায় 'দ' কে 'গ' উচ্চারণের প্রবণতা আছে। যেমন আমাদের- আমাগের, তাদের- তাগের ইত্যাদি। 'ন' উচ্চারিত হয় 'ল' রূপে। যেমন নিয়ে- লিয়ে, নড়াচড়া- লড়াচড়া ইত্যাদি। 'র' ফলার উচ্চারণ চুয়াডাঙ্গার ভাষায় খুব স্পষ্টভাবে করা কখনোই সম্ভব হয় না। যেমন ট্রেন- টেরেন, ড্রেন- ডেরেন, ট্রাক- টিরাক, ড্রাইভার- ডিরাইভার ইত্যাদি। দ্রুত উচ্চারণে 'ত' লোপ পাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যেমন ভাত- ভা (মা ভা দে)। হারিয়ে- হারি, গিয়েছে- গিচে, নিয়েচে- নিচে, দেওয়া- দিয়া, হয়েছিল- হোয়েলো ইত্যাদি। চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন প্রান্তে একই শব্দ দুইভাবে উচ্চারিত হয়। বিশেষ করে শব্দের শেষাংশ। যেমন অশোইলি- অশোইলে, আচামিতি- আচামিতে, গাবিন- গোবিন ইত্যাদি। চুয়াডাঙ্গার একই গ্রামে একই কথা দুভাবে উচ্চারিত হতেও লক্ষ করা যায়। যেমন 'কোথায় যাবে?' এই প্রশ্নটি কেউ করেন, 'কন যাবি?' আবার কেউ বলেন, 'কুন-ঠি-যাবা?' কোথাও আবার 'র' কে 'অ' বলার প্রবণতা আছে। যেমন রক্ত - অক্ত, রাত - আত ইত্যাদি। 'রাজা' শব্দটি চুয়াডাঙ্গার একদিকের মানুষ উচ্চারণ করেন 'আজা', আরেকদিকের মানুষ বলেন, 'নাজা'।

অকথা অনুচিত কথা, কু-কথা।

অগা অজ্ঞ, বেকুব, বোকা। 'তুমার মোতোন অগা মার্কা লোক তো দেকিনি'। একটা

অগ্রান/অঘ্রান অগ্রহায়ন।

অচিন অচেনা। 'অচিন গাচ'।

www.pathagar.com

অছিরাদ্দি বাজে, অশ্রদ্ধাপূর্ণ, অমূলক। 'যতসব অছিরাদ্দি কতাবাতরা'।

অতো এত। 'অতো কইরি বুললাম, কতা শুনলিনি'।

অড়ং নারকেলের মালাই ও বাঁশের কাঠির হাতল দিয়ে তৈরি চামচ জাতীয় জিনিস।

অদদেক অর্ধেক।

অপচো অপচয়।

অব্বায় বৃথা।

অবুলা বাকশক্তিহীন (পশু), বলহীন, অসমর্থ, অক্ষম। ≤ অবলা।

অভক্তি অরুচি, অনিচ্ছা (কিন্তু অশ্রদ্ধা অর্থে নয়)। 'তোর তো শাগে (শাক) আবার অভক্তি'। 'সার্কাস দেখতি অভক্তি'।

আইকু বাঁশের আইকু। কঞ্চিসহ গিট।

আইকু দিয়া উপরে উঠতে সহায়তা করা।

আঁকু$_1$ লম্বা লাঠির মাথায় বাঁধা ছোট চিকন কাঠি, যা ওই লম্বা লাঠির মাথায় একটি কোণ তৈরি করে। 'আঁকশি'র (আঁকশি দ্র.) ভিন্নরূপ।

আঁকু$_2$ আইকু দ্র.

আইল জমির সীমা নির্দেশক বাঁধ।

আইলি/আঁল দিয়া ঢেঁকিতে ধান ভানার সময় হাত দিয়ে নাড়া দেওয়া। 'ঢেকির ধানগুন ইট্টু আইলি দেও দিন'।

আইল্লু লবণবিহীন।

আইরি অড়হড় ডাল।

আঁইড়ি এঁড়ে বাছুর। 'আঁইড়ি গরুর বল বেশি।

আইডু দূর হতে ছুঁড়ে গাছ থেকে ফল জাতীয় কিছু পাড়ার জন্য ব্যবহৃত ছোট লাঠি বিশেষ।

আইডু মারা ছুঁড়ে মারা। 'বই আইডু মারা খুব খারাপ কাজ'।

আইডু তর্ক অযৌক্তিক তর্ক করা।

আউল-বাউল বিশৃংখল, এলোমেলো, আজেবাজে।

আউলা-ঝাউলা এলোমেলো, বিশৃংখলা। 'মিয়ের (মেয়ের) মাথা আউলা-ঝাউলা', 'ঘরের জিনিসপত্তর সব আউলা-ঝাউলা হোয়ি আচে'।

আওলি যাওয়া হতবুদ্ধি হওয়া। 'জিনিসপত্তরের দাম শুইনি লোকটার মাতা আওলি গিচে'।

ইজের পায়জামা।

ইজেদদার ইজারাদার।

ইট্টু একটু।

ইটটুখানিক কম বয়স, অল্প। 'ইটটুখানিক ছেইলি তেজ কত'। 'ইটটুখানি পানি'।

ইডা এটা। 'ইডা কী হইলু'?

www.pathagar.com

ইতি এতে। 'ইতি তো কুনু দোষ নি'- উমু।

ইপপার এপার।

ইবার এবার। 'ইবার কী করবা'?

ইন্দুর ইঁদুর।

ইন্দারা ইঁদারা, কুয়া।

ইর এর। 'ইর মোদ্দি দি পানি আসে'।

ইল্লোত নোংরা, মলিন, অপরিষ্কার। 'এ্যাতো ইল্লোত মানুষ আগে দেকিনি'। ≤ আরবি ইল্লত।

ঈশারি মুসলমান হযরত ইশা (আঃ)-এর উম্মত, খ্রিষ্টান।

ঈষ লাঙ্গলের ফলা। ≤ সংস্কৃত ঈষা।

উইচ্চিংড়ি ফড়িংয়ের একটি প্রজাতি।

উইদমো নির্বোধ, অপরিণতবয়স্ক, বোকা প্রকৃতির। 'উইদমো লোকের তালে পলাম দেকচি'।

উক ওকে, তাকে। 'আসলি ভালো কতা, উক সাতে কইরি আনলি ক্যান'।

উকনু তৃণবিশেষ। চোরাকাটা।

উগরানি বমি করা। 'যা খায়োলো সব উগরি দিলু'।

উগের ওদের। 'উগের সাতে আমাগের সম্পক্ক কী'?

উচুঙ্গু ঘাস ফড়িং বা ওই জাতীয় পতঙ্গ।

উচোট-খাওয়া খালি পায়ে হাঁটার সময় কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা পাওয়া বা পায়ের আঙ্গুল জখম হওয়া।

উছলানি নাড়া দিয়ে বা পাত্র ঝাঁকিয়ে ভালোগুলো ওপরে আনা (মুড়ি জাতীয় জিনিস)।

উতুজ্বালা বিরক্ত করা। 'উতুজ্বালা কইরি মাইরলু দেকচি'।

ঊনি-যাওয়া গলে যাওয়া। 'আকায় দিলিই দেকপা ঘির মোতোন ঊনি যাবিনি'। 'আল্লাদে (বা ঠ্যাকারে) এক্কেরে যিন ঊনি যাইচে'।

এইটুক এতটুকু, অল্প পরিমাণ।

এইড়ি দিয়া ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত করা। 'গরুডাক এইড়ি দে'। 'আর মারিসনি, উক ইবার এইড়ি দে'।

এইবির এবার। 'এ্যাতক্ষুণ তো খুব লাপাচ্ছিলি, এইবিরডা'?

এঁটুল গরুর গায়ে লেগে থাকা এক প্রকার পোকা। নাছোড়বান্দা হয়ে আঠার মতো লেগে থাকা।

এবড়ু-থেবড়ু অমসৃণ।

এমনি বিনামূল্যে। 'এমনি কি আর কিচু দেয়, ট্যাকা লাগে'।

এড়ি-যাওয়া এড়িয়ে চলা। 'লোকটা খারাপ, উক এড়ি চলিস'। 'ট্যাকা পাবো, বুলতি গেলিই এড়ি যায়, অন্য কতা বোলে'।

এড়িতেড়ি করা নির্দেশের বিপরীতে কাজ করা বা দ্বিমত পোষণ করা।

এম্নি-এম্নি কার্যকারণ ছাড়া ঘটা। 'এম্নি এম্নি হোয়ি গিচে'।

www.pathagar.com

এ্যকজোগগোর অনেক, প্রচুর। 'এ্যকজোগগোর টাকা/ধান'।

ঐ কোল ওপাশ। 'তুই ঐ কোল দি আয়'।

ঐকিন ওই স্থান। 'ঐকিন দি শিয়াল আসে'।

ঐতা ওটা, ওগুলো। 'ঐতা দি কেউ ভাত খায়'?

ঐদ্দেক ঐ দেখ। 'ঐদ্দেক আবার শুরু কইরলু ঝগড়া'।

ঐরাম ওই রকম। 'ঐরাম একটা নাল জামা গড়ি দিবা আমাক'?

ঐবির গতবার। 'ঐবির পার পায়ি গিয়েলি, ইবার আর ছাড়চিনি'।

ওক্ত ওয়াক্ত। 'পাঁচ ওক্ত নামাজ'।

ওকিনে ওখানে। 'ওকিনে যাসনি'।

ওকোল মাছ টাকি জাতীয় মাছ (বিলুপ্ত প্রায়)।

ওড় একপাশ। 'আমি ওড়ে বোশতি চাই'।

ওত আড়াল। 'ওতে চ', গোপন কতা আচে'।

ঔকিনে ওখানে। 'ঔকিনে যাসনি, মারামারি হোয়চে'।

ঔজ্জা ভুল হয়েছে বোঝানোর শব্দ বিশেষ। 'ঔজ্জা! দুওর দিলাম না (দরজা বন্ধ করলাম না) যে'।

কইরি করে। 'ঝড় উ'টিচে, ক্যারাম কইরি যাবি'।

ককানি কাতরানো। 'লোকটা ব্যতায় ককাচ্চে দেইকি আলাম'।

কচলানি করা কাজ করতে না চেয়ে নানান অজুহাত দেখানো। 'এ্যতো কচলানি করা তো ভালো না'।

কচড়া অপোক্ত ফল পাকে না, কচড়া হয়ে যায় বা শক্ত হয়ে যায়।

কচা$_1$ নলা জাতীয় গাছের ডাল।

কচা$_2$ লাঠির মতো করে আক্রমণাত্মক কাজে ব্যবহৃত যে-কোনো গাছের ডাল। 'হাতে কচা দেকিচিস, যা কাচে যা, সাইটি দিবিনি।

খয়রা খয়েরি রঙের।

খর পান দিয়ে খাওয়ার খয়ের।

খরখরে কর্কশ, অমসৃণ।

খরা জাল মাছ ধরার বড় আকারের জাল বিশেষ।

খরানি$_1$ রোদ্দুর।

খরানি$_2$ কামার্ত, কাম বিহ্বল। 'খরানি ছাগলডাক পাল খাওয়ি আনো গো'।

গইবলু ফড়িং।

গড়ান ঢালু।

গড়ানি তৈরি করা, বানানো, গড়া। 'এট্টা ফুতুল গড়ি দ্যাও'।

গন্নাকাটা জন্ম ঠোঁটকাটা।

গবগব তাড়াতাড়ি। 'ক্যারাম গবগব কইরি খাইচে দেকো'।

www.pathagar.com

গবোর গোবর।

গলা ভাঙ্গা গলা বসে যাওয়া।

ঘট পান খাওয়ার চুন রাখার মাটির ছোট পাত্র।

ঘট কচু একটু বড় আকারের কচু।

ঘড়া ধাতুর তৈরি বড় কলস।

ঘষি/ঘুঁটু গোবরে তৈরি জ্বালানি বিশেষ।

চিরোন (চিরুণী)– চিরোন্ডা সেই যে হারাইলো, আইজও কিনার মুরোদ হলো আ। চাই্লে পানি (চাল ধোয়া পানি)– চাই্লে পানিডা গরুর নাইন্দে দি'দিস (চাল ধোয়া পানিটা গরুর নাদায় দিয়ে দেসি)। চশোমখোর (নির্লজ্জ)– চশোমখোরের মোতো কাজডা কি না কোলিই হৈতো না?

ছ্যান্ (গোসল)– ছ্যান্ডা কোইরে নিয়াই জানো ভালো ছিল (গোসলটা করে নেওয়াই যেন ভাল ছিল)। ছেউই্ (সেমাই)– ছেউই্ রান্দাডা আইজ্ এট্টু ভালো লাগিনি। ছাপড়ো (নিচু)– ঘরডা খুবই ছাপ্ড়ো হৈলো।

জিয়েল/জিয়োল মাছ (শিংমাছ)– জিয়েল মাছে কাটা মাইরেচ্ গো! জোল্ (জলাশয়)– ওই জোলডায় বড় মাছ পাওয়া যায়। জাড় (শীত)–জাড় কালে খেজুর রস খাতি কী মজা, বলো দিনি? জাই্রো (জারক)– শালার, জাইরোর কপালে এছাড়া আর কী হবে? জেটি (টিকটিকি)– জেটিডায় পুকা ধোইরে ধোইরে খাচ্চে।

ঝাইটনে (আবর্জনা)– ঝাইটনেডা ককুনতি তোর ফেল্তি বুল্চি। ঝেকুড় (গাছ-গাছালি নাড়া দেওয়া)– কুল গাছ থাক্লিই লোকে ঝেকুড় দ্যায়। ট্যাকা (টাকা)– আমাত্তো অতো ট্যাকা খরজ করার উপায় নেই। টপ্কোই্রে (শীঘ্র)– টপ্কোই্রে যা দিনি, ফিরে আই্সে ইস্কুলি যাতি হবে।

ঠাওর (অনুমান করা)– চোড্ডা (চোরটা) ঠাওর করা গ্যালো না। ঠাট (ভান)– ঘুমা শীগ্গীর ঠাট কোরিসনে। ঠ্যাটা (ভানকারী)– ঠ্যাটা মিন্শে জবোর লোক তো! ডাকাই্ত্ (ডাকাত)– ডাকাই্ত্রা সব গোম্ লুট্ কোইরে নিয়ে গিয়েচে্। ডাক্সাইড়ে (প্রভাবশালী)– মন্ডল গুষ্টির লোকরা একানে ডাক্সাইড়ে। ড্যানা (ডানা)– ছেইলে ড্যানা ধোরিস নে, ড্যানায় লাগবে। ঢ্যালা (ঢিল্)– গুয়ালা গরোজে ঢ্যালা বয়। ঢুলা (ঢিলা)– পাইজামাডা পর্নে ঢুলা হোয়েচে।

তাত (উত্তাপ)– রোদি কি তাত্, বাব্বা! তিষ্টা (তৃষ্ণা)– তিষ্টায় প্রাণ যায় রে! তপোন্ (লুঙ্গী)– পয়সার অভাবে তপোনডাও কিনা হৈলো না। তামুক (তামাক)– ওরে, হুকো-তামুকটা সাইজে আন্। তাক্ করা (অনুমান করা)– গোশে নুনডা আইজ্ তাক্ করা যায়নি। থৈলে (থলি)– বাজারের থৈলেডা কন্ ফেলি শিগ্গির খোঁজ। থাল্ (থালা)– থাল্ডা ধুইয়ে থো। থুয়া (রাখা)– বই-খাতাগুই্ন্ থুয়ার ছেরখ্যালায় পানিতি ভিইজে একেবারে শেষ (বই-খাতাগুলি রাখার দোষে পানিতে ভিজে একেবারে শেষ)।

দুব্লো (দুর্বা ঘষা)- দুব্আো ঘাস খালি গাই'র বেশি দুদ (দুধ) হয়। দোনোমোনো/দুনুমুনু- দোনোমোনো কোলি কি কাজ হয়? দকিন্ (দক্ষিণ)- দকিন দিকি খুব মেগ (মেঘ) কোইরেচে্। দুষী (দোষী)– লোকটা যদিও দুষী না তবু ব্যচারা শাস্তি ভোগ কৈল। দুল্তি/দুল্চি (বালতি)– এ্যক্ দুল্চি পানি আন্। দুদ (দুধ)–খাঁটি দুদ্

পাওয়াই মুস্কিল। দুকান (দোকান)– দুকান্তি সুটা আনো (দোকান থেকে সোডা আনো)। দুলা (দোলনা)– মেয়ের দুলায় ঝুল দে (মেয়ের দোলনা দোল দে)। দরোগা (দারোগা)–দরোগা সায়েব বাসায় যাতি বুই্লেচে।

ধকোল্ (চাপ)–এ্যাতো ধকোল্ কি শারিলি সয়? ধাড়োশ (ঢ্যাড়শ)– ধাড়োশে খুব ভিটামিন। ধুমো (ধোঁয়া)–ধুমোয় চোক্ জ্বইলে গ্যালো। ধাম্কি (ধমক)-এক ধম্কিতেই তুই চুপ হোয়ে গেলি? নাদি/নাদ (ছাগল-গরুর মল)– ছাগোলে নাইদে পাকি' ফেই্লেচে। নৈচে (যৌবনা)– নৈচে মুরগিডা পাল্ খাওয়ার জন্নি ডাই্কে মৈলো। নম্পো (ল্যাম্প)– নম্পোডা বাতাসি বার বার নিই্বে যাচ্চে। নিইন্দে (নিন্দা)– কারো নিইন্দে কোত্তি নেই। ন্যাক্ড়া (ছেড়া কাপড়ের টুকরা)– টেবিল পুচার ন্যাক্ড়াডা কই?

ন্যাতা (চুলায় হাড়ি কড়া ধরার কাপড় বিশেষ)– ন্যাতাডা কন্ রাক্লি? নাইন্দে (নান্দা)– নাই্ন্দেডা ভাই্ঙে যাওয়ায় তো গরুটার কষ্ট। নুন্ (লবণ)– ডালি আই্জ্ নুন্ হোইনি। ন্যাকার (বমি)– ছেলেডা ন্যকার কোই্রে মৈলো। নাঙ (প্রেমিক)-নাঙ ভাতারেও যদি মাগীর না হয়! (অল্প বুদ্ধি)– ছেই্ন্ডা এ্যাতো ন্যাকা ক্যানে। নোক (নখ)– নোক্ কাটার ম্যাশিনডা কই?

প্যাচোট্ (কুটবুদ্ধি সম্পন্ন লোক)– লোকটা সত্যিই প্যাচোট। পাক্ড়া (শিমুল)– পাক্ড়া গাছে এখন ফুল নেই। পুঙা (পাছা)– পুঙায় এট্টা ফুড়া হোয়েচে। পিরেন (জামা)– ময়লা পিরেনডা আর পরা যায় না। পুইচ্কে (ছোট)– পুইচ্কে ছুড়ার সাহস কত? পোলুয়া (পোলাও)– পোলুয়া বড় লোকে খায়। পালান (গো-মহিষ- ভেড়ার স্তন)– গরুডার পালানে দুদ্ নেই। পুয়াতি (গর্ভবতী)– নৈমদ্দির বৌমা সাত মাসের পুয়াতি।

ফাইল্টো (ফাল্তু)– ফাইল্টো ইয়ার্কি মারিসনে। ফতুর (সর্বশান্ত)– জুয়ো খেইলিই লোকটা ফতুর। ফোক্ (ছিদ্র)– ফোক দি' দ্যাক, কী দ্যাকা যায়! ফিই্ড়ে (পিঁড়ি)– পিইড়েডা আগি দে' উনি বোসুক। ফ্যাদা-খাইকে (গালি বিশেষ)– ফ্যাদা-খাইকোর বিটা চোকেও দ্যাকে না।

বৈশেক (বৈশাখ)– বৈশেক মাসেও ঝড় হয়। বান্দোর (বাঁদর)– বান্দোর নাচ মজা লাগে। বাশাইত (বাতাস)– পাকা দি' বাশাইত্ কর। বন্দা (বদনা)– পাস্টিকির বন্দা টেকে না। বাচ্ড়া (গরু ছাগল চরার মাঠ)– গরুগুই্ন বাচ্ড়ায় না যা, ঘাস খাবেনে। বিয়াইন ব্যালা (সকাল বেলা)– বিয়াইন ব্যালায় আমি পৌচি যাব।

বাঈজো (বাঁঝ)– বাঈজো মাগীর দাপোট কত! বাগুড় (ঘিরে ফেলা)– চোরটাকে বাগুড় দিয়ে ধইরে ফ্যালা হৈলো। বৈল (মুকুল)– আমের বৈলও ইবার যেমন আয়েলো, আমও হয়েচে ভালো। ব্যালান্ত (বারবার)– ব্যালান্ত পয়সা কনে পাবো? বয়ার (স্নেহের গালি)– বয়ার পড়ায় মন-ই দ্যায় না। বৈ-পাখি (বাবুই পাখি)–বৈ-পাখি তল গাছে বাসা করে। বেচোন্ (বীজ)- একানে আলুর বেচোন হচ্ছে।

ভাদোর (ভাদ্র)– ভাদোর মাসে মেয়ের বিয়ে দেব। ভন্না (প্রচুর বৃষ্টি)– ইবার ভন্না হওয়ার আশা কোম। ভূইকম্পো (ভূমিকম্প)– শুনিচি, জাপানে খুব ভূইকম্পো হয়। ভেনো (আলাদা)- উরা ভেনো হয়েচে। ভোগ (মাঝখান)– নদীর ভোগে যাই্স্নে ডুইবে মোরবি। মুত্ (প্রস্রাব)– জিকান্-শিকান মুত্লি গোন্দো করে। মোনোচারা/ময়ারশালা (গোরস্থান)– তুই মোনোচারায় যাইতে্ পারিসনে? মেগ্ (মেঘ)– মেগ্ কিন্তু কের্হৈ

www.pathagar.com

বাড়চে। মেকুর (বিড়াল)– মেকুরডার আইজ্ খাতিও দিস্নি? মালাক (কুস্তি)-আয় মালাম ধর। মিই্তে (বন্ধু)– সে আমার ছোট ব্যালার মিই্তে। মেঁঈ (স্তন)– মেঁঈতে দুদ্ নেই তো বাচ্চায় খাবে কী?

যকুন (যখন)– যকুন তুই ছোট ছিলি, তুকন তোকে দেকিচি। রৈদ (রোদ)– রৈদে রৈদে কি ব্যারানো যায়? রুয়ানো (রোপন করা)–ধান রুয়ানো শেষ। রুয়া (লোম)- ভ্যাড়াডার রুয়া ওট্চে। রাকাল (রাখাল)–রাকাল ছেলেরা মাটে যাচ্চে। লাপ্ (লাফ্)–এ্যাক্ লাপেই শিয়েলডা পাগার পার্। লগা/ লোগি (গাছ থেকে ফল পাড়ার বড় লাঠি)– লোগিডা নি' আয় আম পাড়ি।

ন্যাপা (লেপন)– ঘর ন্যাপা তোর হৈলো না? শানুক (শান্কি)– মাটির শানুক জীবানুমুক্ত। শোগুন (শকুন)- শোগুন আর চোকেই পড়ে না। শানি (গো-খাদ্য) মৈষগুলুর শানি দিতি হবে। শুদ্ করা (জিজ্ঞেস করা)- আমি, হালিমকে বারবার কতাডা শুদ কলাম, তাও সে বুইলো না। শুবরাইত (শবেবরাত)– শুবরাইতি রুটি-হালুয়া বিলায়।

স্যাকাই্ল/স্যাকালি (পাটের তৈরি মাঝারি বস্তা)– স্যাকলিতি ধান ভর্। সুপুরি (সুপারি)– দেশি সুপুরি খাওয়া উচিত। সুমুন্দি (সম্বন্দি শ্যালক)– তিনি আমার বড় সুমুন্দি। সৈন্দ্যে (সন্ধ্যা)– সৈন্দ্যে ব্যালা আলাহর গুনোগান্ করো। সান্দানো (ঢোকা)–বাচুরডা গুয়ালি সান্দাচ্চেই না। হাইসেল্ ঘর (রান্নাঘর)– হাইসেল্ ঘরতি ভাতের হাড়ি নি' আয়। হাই্কো (আগুনের তেজ)– আগুনের হইকোয় মুখ পইড়ে যাচে। হেরিকল্ (হারিকেন)– হেরিকলে্ তেল নেই। হাটকুইড়ে (আটকুঁড়ে)- হাটকুই্ড়ের জ্বালায় জ্বই্লে মলাম।

আরও কিছু আঞ্চলিক শব্দ ও অর্থ দেওয়া হলো: অব্বায় (বৃথা), অম্ধ্যারা (অমন ধারা), আকা (চুলা), আচুমকা (হঠাৎ), আলাম (এলাম), ইডা (এটা), ইবার (এবার), শরীল (শরীর), তাহেলি (তাহলে), ইন্দারা (ইদাঁরা), এনট্রু (একটু), সোন্দর (সুন্দর), উদমো (নির্বোধ), উর (ওর), উজা (ওঝা), আইসে (এসে), এ্যারাম (এ রকম), এমিন্দি (এদকি দিয়ে), এ্যকুন (এখন), এ্যকুনু (এখনও), ঐরাম (ওই রকম), ওই বার (গতবার), ওষুধ (ঔষধ), ওকোল (ঐদিক), ওক্তো (ওয়াক্ত), এ্যাক (এক), কুত্লা (মোটাতাজা), কুকুরির (কুকুরের), কোমিন্দি (কোন দিক দিয়ে), কন্তি (কোথা থেকে), কন্কোর (কোথাকার), কিচুই (কিছুই), কইতোর (কবুতর), কুশুর (আখ), খুশান্দি (তোষামোদ), কচ্চি (করছি), খান্কি (বেশ্যা), ঘিন্না (ঘৃণা), চই (হাঁস), ছামা (ছায়া), (পেটিকোট), ছুইৎনো (অজুহাত), জালা (জানালা), ঝুলা (থলে), ঝেকি (ঝাঁকি), টনকো (শক্ত) ঠাট করা (ভান করা), ঠুঙ্গা (ঠোঙ্গা), ডাভা (লাঠি), ডাইল (ডাউল), ঢং করা (ভান করা), ঢুলা (ঢিলা), তাগ্ড়া (মোটা তাজা), তিষ্টা (পিপসা), থাল (থালা), ধাগা দেওয়া (সেলাই করা), ধান্দা (সুযোগ খোঁজা), সুমায় (সময়), নাইচ্ছেলে (নাতি ছেলে), রাকিচি (রেখেছি), নেতুড় (আবর্জনা), নাঙ (গোপন প্রেমিক), নড়ি (সাধারণ লাঠি), নুন (লবণ), প্যাট (পেট), দালি (পারলে), পোলুয়া (পোলাও), পলাপলি (লুকোচুরি), ফিরাল (সর্বশান্ত), ফৈছকে (বেয়াদব), ফুবু (ফুফু), মদ্দি (মাঝে, তকুন (তখন), যুবান (যবান/কথা), রসুগুলা (রসগোলা), রান্দা (রান্না), লাইটেল (লাঠিয়াল), লাবানো (নামানো), শালা (শ্যালক), ঘুগু (ঘুঘু), সঙ্গ (সামর্থ), সাট/সুমান (সমান), হেন্দু (হিন্দু)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি